CUL-H05199-S-P16911

চতুর্থ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত ঃ ১৩৬৭



756.3
·019/86
YH ·10·2

সাহিত্য পত্রিকা

সম্পাদক
মুহম্মদ আবিদুল

P 36,211

সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দুবার প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা এতে ছাপা হয়। যাঁরা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের রচনা এ পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হয়।

সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা। এর গ্রাহক হতে হলে বার্ষিক চাঁদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হয়।

এজেন্টদের শতকরা ৩৩·৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হয়। দশ কপির কম নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টদের অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হয় না।

অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলা বি[illegible]জ কিতাবিস্থান
[illegible]ার, ঢাকা

নলেজ হোম
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র



মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা ধ্বনি প্রবাহ ॥ ১

মুনীর চৌধুরী

মীর-মানস ॥ ৫১

আনিসুজ্জামান

মেহেরুল্লাহ্ ও জমরুদ্দীন ॥ ৭৭

সতীশচন্দ্র রায়

বিদ্যাপতি-বিচার ॥ ১০৭

মুহম্মদ আবদুল হাই

বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ ॥ ২৫৫

মুহম্মদ এনামুল হক

গ্রন্থ-পরিচয় ॥ ৩০১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল

তত্ত্বাবধায়ক-সমিতি

সভাপতি :

ডক্টর মাহমুদ হুসেন, পি-এইচ, ডি. (হাইডেলবার্গ)
ভাইস্-চ্যান্সেলার।

সদস্যবৃন্দ :

ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্
এম. এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন),
ডীন, কলা বিভাগ।

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন,
এম. এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি. (ঢাকা),
ডীন, বিজ্ঞান বিভাগ।

জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন),
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ।

জনাব মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

জনাব আহমদ শরীফ, এম. এ. (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

সাহিত্য পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত, ১৩৬৭

বাংলা ধ্বনি প্রবাহ
(Connected Speech in Bengali)

মুহম্মদ আবদুল হাই

[পূর্বানুবৃত্তি]

শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের ভিন্নস্থান-জাত (Heterorganic) ব্যঞ্জনধ্বনির বহির্বর্তী-সন্ধি

Prosody of Junction : অভিনিধান

শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি 'ক' 'ট' 'ত' এবং 'প' র পরে বিভিন্ন বর্গের স্বল্প ও মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনিগুলো নতুন শব্দগঠন করলে পূর্ববর্তী ধ্বনিটি এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্পর্শধ্বনির প্রথমটির মতো অভিনিধানপ্রাপ্ত (স্বরবিহীন হলন্ত তথা অসম্পূর্ণ) উচ্চারণ লাভ করে। এদের পরে 'র', 'ল', 'ন', 'ম' এবং 'শ' নতুন শব্দ গঠন করলেও পূর্ববর্তী শব্দশেষের 'ক' 'ট' 'ত' এবং 'প' এর উচ্চারণ একইভাবে অভিনিধান-প্রাপ্ত হয়। কেবল শব্দশেষের প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি 'চ' এর পরে 'ট' 'ঠ' এবং 'ত' 'থ' ধ্বনিগুলো এলে দ্রুত উচ্চারণে 'চ'>'স' তে পরিবর্তিত হ'য়ে স-কারীভবন তথা উষ্মীভবনের সৃষ্টি করতে পারে। শব্দশেষের 'ত' এর পরে শব্দারম্ভের 'শ' কখনও কখনও পূর্ববর্তী 'ত' কে 'শ'তে পরিবর্তিত ক'রে উষ্মী এবং দ্বিত্বীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আবার 'ত'-র পরে চ-বর্গীয় ধ্বনির ফলেও পরাগত দ্বিত্বীভবনের সৃষ্টি হয়। বহির্বর্তী সন্ধির নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো থেকে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে :—

(ক) F+I (বহির্বর্তী সন্ধি)

১। ক+চ : শাক্ চাই = শাক্‌চাই

ক+ট : তামাক্ টানা = তামাক্‌টানা

ক+ত : এক্ তোলা = এক্‌তোলা

ক+প : শোক্ পাওয়া = শোক্‌পাওয়া।

২। ক+ছ : শাক্ ছিটানো = শাক্‌ছিটানো

ক+ঠ : এক্ ঠাঁই = এক্‌ঠাঁই

ক+থ : এক্ থাল = এক্‌থাল

ক+ফ : নাক্ ফুল = নাক্‌ফুল

৩। ক+র : এক্ রশি = এক্‌রশি

৪। ক+ল : এক্ লাখ = এক্‌লাখ

৫। ক+ন : পাক্ নাপাক = পাক্‌নাপাক

৬। ক+ম : নাক্ মুচড়ানো = নাক্‌মুচড়ানো

৭। ক+শ : যাক্ সে এসেছে = যাক্‌সে এসেছে

নাক্ শাফ করা = নাক্‌শাফ করা

(খ)

১। চ+ক : পাঁচ্ কন্যা = পাঁচ্‌কন্যা

চ+প : পাঁচ্ পোওয়া = পাঁচ্‌পোওয়া

২। চ+খ : কাঁচ্ খেতে নেই = কাঁচ্‌খেতে নেই

চ+ফ : পাঁচ্ ফুচকে = পাঁচ্‌ফুচকে

৩। চ+র : কাঁচ্ রেখে দাও = কাঁচ্‌রেখে দাও

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। চ+ল ঃ পাঁচ লাখ = পাঁচ্‌লাখ

৫। চ+ন ঃ পাঁচ নবী = পাঁচ্‌নবী

৬। চ+ম ঃ পাঁচ মেয়ে = পাঁচ্‌মেয়ে

(গ)

ট+ক ঃ পেট কামড়ানো, গাঁট কাটা = পেট্‌কামড়ানো, গাঁট্‌কাটা

ট+চ ঃ পেট চোঁ চোঁ করে = পেট্‌চোঁ চোঁ করে

ট+ত ঃ পাট তোলা = পাট্‌তোলা

ট+প ঃ জট পাকানো = জট্‌পাকানো

ট+খ ঃ আট খানা = আট্‌খানা

ট+ছ ঃ ও জমিতে পাট ছিল = ও জমিতে পাট্‌ছিল

ট+থ ঃ ওখানে সাট থোও = ওখানে সাট্‌থোও

ট+ফ ঃ পেট ফাঁপা = পেট্‌ফাঁপা

৩। ট+র ঃ একটু ছিট রেখো = একটুছিট্‌রেখো

৪। ট+ল ঃ ও ঘাট লিখে নিয়েছে = ও ঘাটলিখে নিয়েছে

৫। ট+ন : পেট নাই = পেট্‌নাই

৬। ট+ম ঃ পেট মলা = পেট্‌মলা

৭। ট+শ ঃ লাট সাহেব = লাটসাহেব

(ঘ)

১। ত+ক ঃ হাত করা = হাত্‌করা

ত+ট ঃ সাত টাকা = সাত্‌টাকা

ত+প ঃ পাত পাড়া = পাত্‌পাড়া

২। ত+খ ঃ ভাত খাওয়া, জাত খোয়ানো = ভাত্‌খাওয়া, জাত্‌খোয়ানো

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+ঠ : সাত ঠিলি = সাত্‌ঠিলি

ত+ফ : রাত ফুরানো = রাত্‌ফুরানো

৩। ত+র : হাত রাখা = হাত্‌রাখা

৪। ত+ল : সাত লাখ = সাত্‌লাখ

৫। ত+ন : হাত নাই = হাত্‌নাই

৬। ত+ম : বেত মারা = বেত্‌মারা

৭। ত+শ : সাত শ' = সাত্‌শো

(৬)

১। প+ক : পাপ করা, চুপ করো = পাপ্‌করা, চুপ্‌করো

প+চ : বাপ চাইলেন = বাপ্‌চাইলেন

প+ট : বাপ টাকা চান = বাপ্‌টাকা চান

প+ত : পাপ তরিয়ে নেওয়া = পাপ্‌তরিয়ে নেওয়া

২। প+খ : খাপ খোলা = খাপ্‌খোলা

প+ছ : সাপ ছিল = সাপ্‌ছিল

প+ঠ : রূপ ঠিকরে পড়া = রূপ্‌ঠিকরে পড়া

প+থ : চুপ থাকো = চুপ্‌থাকো

৩। প+র : মাপ রাখা = মাপ্‌রাখা

৪। প+ল : তাপ লাগা = তাপ্‌লাগা

৫। প+ন : মাপ নেওয়া, মাপ নাই = মাপ্‌নেওয়া, মাপ্‌নাই

৬। প+ম : বাপ মারা গেছেন = বাপ্‌মারা গেছেন

৭। প+শ : আলাপ সালাপ করা = আলাপ্‌সালাপ করা

শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি গ, দ, ব শব্দারম্ভের স্বল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ঘোষ স্পর্শধ্বনি এবং র, ল, ন, ম ও শ ধ্বনি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়না। এরকম ক্ষেত্রে তারাও এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্পর্শধ্বনির প্রথমটির মতো হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে, অন্য কথায় অভিনিধান প্রাপ্ত হয়। শব্দশেষের দ, ব এবং তাড়নজাত ধ্বনি ড় পরবর্তী শব্দের অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্বারা অনুসৃত হলেও তাদের অভিনিধান প্রাপ্ত অবস্থা থাকে। শব্দশেষের জ সম্পর্কে অবশ্য এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ভ এবং র ল পরে এলে 'জ' এর আশ্চর্যভাবে উষ্মীভবন ঘটায়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

(২) শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি

উদাহরণ ঃ

(ক) F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

১। গ+জ ঃ রাগ জয় করো = রাগ্‌জয় করো

গ+ড ঃ কোন দাগ ডেকেছো, = কোন দাগডেকেছো

গ+দ ঃ দাগ দেওয়া = দাগ দেওয়া

গ+ব ঃ ভাগ বসানো = ভাগ্‌বসানো

২। গ+ঝ ঃ রাগ ঝেড়ে ফেলো = রাগ্‌ঝেড়ে ফেলো

গ+ঢ ঃ জাগ ঢেকে দাও = জাগ্‌ঢেকে দাও

গ+ধ ঃ দাগ ধরে গেছে = দাগ্‌ধরে গেছে

গ+ভ ঃ তার রোগ ভয় নেই = তার্‌রোগ্‌ ভয় নেই

৩। গ+র ঃ তার রাগ রাগ ভাব = তার রাগ্‌রাগ ভাব

৪। গ+ল ঃ ও দাগ লেখা হয়েছে = ও দাগ্‌লেখা হয়েছে

৫। গ+ন ঃ রাগ নাই = রাগ্‌নাই

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৬। গ+ম ঃ কয়ভাগ্ মেরেছো = কয়ভাগ্‌মেরেছো

৭। গ+স ঃ ভাগ্ শালা ভাগ = ভাগ্‌শালা ভাগ

(খ)

১। জ+ক ঃ এক্ কাজ করো = এক্‌কাজ করো

২। জ+খ ঃ রাজ্ খাটানো = রাজ্‌খাটানো

৩। জ+গ ঃ কাজ্ গুছানো = কাজ্‌গুছানো

৪। জ+ঘ ঃ আজ্ ঘরে ফিরে যাও = আজ্‌ঘরে ফিরে যাও

৫। জ+ট ঃ রাজ্ টাকা চায় = রাজ্‌টাকা চায়

৬। জ+ঠ ঃ কাজ্ ঠিক করেছো = কাজ্‌ঠিক করেছো

৭ জ+প ঃ লাজ্ পাওয়া = লাজ্‌পাওয়া

৮। জ+ফ ঃ রাজ্ ফিরিয়ে দেওয়া = রাজ্‌ফিরিয়ে দেওয়া

৯। জ+ব ঃ আজ্ বড়োদিন = আজ্‌বড়োদিন

১০। জ+ন ঃ কাজ্ নাই = কাজ্‌নাই

১১। জ+ম ঃ আজ্ মজলিস বসবে = আজ্‌মজলিস বসবে

(গ)

১। দ+ক ঃ আবাদ্ করা, খাদ্ কাটা = আবাদ্ করা, খাদ্‌কাটা

২। দ+ট ঃ খাদ্ টাকা দিয়ে পুরিয়ে নাও = খাদ্‌টাকা দিয়ে পুরিয়ে নাও

দ+প ঃ স্বাদ্ পেয়েছে = স্বাদ্‌পেয়েছে

২। দ+খ ঃ পদ্ খালি হয়েছে = পদ্‌খালি হয়েছে

দ+ঠ ঃ ছাদ্ ঠিক করা = ছাদঠিক করা

দ+ফ ঃ ছাদ্ ফেটে পানি পড়া = ছাদ্‌ফেটে পানি পড়া

৩। দ+গ ঃ ছাদ্ গোনা = ছাদ্‌গোনা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

দ+ড : ছাদ ডালে ঢেকে গেছে = ছাদ্ডালে ঢেকে গেছে

দ+ব : প্রবাদ বাক্য = প্রবাদ্বাক্য

৪। দ+ঘ : প্রমোদ ঘর = প্রমোদ্ঘর

দ+ড : খাদ ঢেকে দাও = খাদ্ঢেকে দাও

দ+ভ : এবার আবাদ ভাল হয়নি = এবার আবাদ্ ভাল হয়নি

৫। দ+র : ছাদ রেখে অন্য কাজ করো = ছাদ্রেখে অন্য কাজ করো

দ+ল : স্বাদ লাগে = স্বাদ্লাগে

দ+ন : দাদ নেওয়া = দাদ্নেওয়া

দ+ম : স্বাদ মরে গেছে = স্বাদ্মরে গেছে

দ+শ : বাদ সাধা = বাদ্সাধা

(ঘ)

১। ব+ক : ভাব করা, বব কাটা = ভাব্করা, বব্কাটা

ব+চ : সব চাই = সব্চাই

ব+ট : সব টাকা দিয়েছো = সব্টাকা দিয়েছো

ব+ত : খুব তাপ ছিল = খুব্তাপ ছিল

২। ব+খ : খুব খারাপ = খুব্খারাপ

ব+ছ : সব ছেলে = সব্ছেলে

ব+ঠ : খুব ঠুকেছে = খুব্ঠুকেছে

ব+থ : ভাব থাকা = ভাব্থাকা

৩। ব+গ : খুব গাল দাও = খুব্গাল দাও

ব+জ : সব জল = সব্জল

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

ব+ড ঃ খুব ডাক = খুব্‌ডাক

ব+দ ঃ খাব দেখা = খাব্‌দেখা

৪। ব+ঘ ঃ খুব ঘোরা = খুব্‌ঘোরা

ব+ঝ ঃ খুব ঝোঁক = খুব্‌ঝোঁক

ব+ঢ ঃ খুব ঢাক পেটানো = খুব্‌ঢাক পেটানো

ব+ধ ঃ ভাব ধার করা = ভাব্‌ধার করা

৫। ব+র ঃ সব রাগ আমার ওপর = সব্‌রাগ আমার ওপর

ব+ল ঃ সব লোক = সব্‌লোক

ব+ন ঃ ভাব না থাকা = ভাব্‌না থাকা

ব+ম ঃ সব মেয়ে = সব্‌মেয়ে

ব+শ ঃ ভাব সঙ্কোচ করা = ভাব্‌শঙ্কোচ করা (উচ্চারণে)

(ঙ)

১। ড়+ক ঃ হাড় কুড়ানো = হাড়্‌কুড়ানো

ড়+চ ঃ হাড় চোষা = হাড়্‌চোষা

ড়+ত ঃ কাপড় তোলা = কাপড়্‌তোলা

ড়+প ঃ কাপড় পরা = কাপড়্‌পরা

২। ড়+খ ঃ গড় খালি ছিল = গড়্‌খালি ছিল

ড়+ছ ঃ কাপড় ছিল = কাপড়্‌ছিল

ড+থ ঃ ও কাপড় থাক = ও কাপড়্‌থাক

ড়+ফ ঃ মাড় ফেলা = মাড়্‌ফেলা

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৩। ড়+গ ঃ হাড় গিলছে = হাড়্গিলছে

ড়+জ ঃ কাপড় জামা = কাপড়্জামা

ড়+দ ঃ মাড় দেওয়া = মাড়্দেওয়া

ড়+ব ঃ ওর বড়ো বাড় বেড়েছে = ওর বড়ো বাড়্বেড়েছে

৪। ড়+ঘ ঃ ঘাড় ঘোরানো = ঘাড়্ঘোরানো

ড়+ঝ ঃ বাদুড় ঝোলা = বাদুড়্ঝোলা

ড়+ধ ঃ কাপড় ধোওয়া = কাপড়্ধোওয়া

ড়+ভ ঃ ভাঁড় ভেঙেছে = ভাঁড়্ভেঙেছে

৫। ড়+র ঃ কাপড় রেখে দাও = কাপড়্রেখে দাও

ড়+ল ঃ জাড় লাগা = জাড়্লাগা

ড়+ন ঃ মাড় নাই = মাড়্নাই

ড়+ম ঃ মাড় মারা = মাড়্মারা

ড়+শ ঃ মড় মড় শব্দ = মড়্মড়শব্দ

শব্দশেষের ন, ম, ল এবং স তাদের পরবর্তী শব্দে ঙ এবং ড় ঢ় ছাড়া সম্ভাব্য সকল ধ্বনির দ্বারাই অনুসৃত হয়। তাদের সমস্থানজাত ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনির দ্বারা অনুসৃত হ'লে শব্দশেষে তারা হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে কিন্তু 'অভিনিধান' প্রাপ্ত ধ্বনির মতো তেমন 'পীড়িত' কি 'নিপিষ্ট' হয় না।

(ক)

১। ন+ক ঃ গান করা = গান্করা

ন+খ ঃ জান খেয়ে ফেলা = জানখেয়ে ফেলা

ন+গ ঃ প্রাণ গেল = প্রাণ্গেল

ন+ঘ ঃ বাগান ঘেরা = বাগান্ঘেরা

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

২। ন+প ঃ মন পাওয়া = মন্‌পাওয়া

ন+ফ ঃ প্রাণ ফিরে পাওয়া = প্রাণ্‌ফিরে পাওয়া

ন+ব ঃ পান বানানো = পান্‌বানানো

ন+ভ ঃ কান্ ভারী করা = কান্‌ভারী করা

ন+ম ঃ আপন মা = আপন্‌মা

৩। ন+র ঃ মান রেখো = মান্‌রেখো

৪। ন+ল ঃ কেমন লোক = কেমন্‌লোক

৫। ন+স (শ) ঃ মান সম্মান = মান্‌শম্মান (উচ্চারণে)

(খ)

১। ম+ক ঃ দাম কৃত = দাম্‌কৃত

ম+খ ঃ কাম খালি, হারাম খোর = কাম্‌খালি, হারাম্‌খোর

ম+গ ঃ কদম গাছ = কদম্‌গাছ

ম+ঘ ঃ কাম ঘটিত = কাম্‌ঘটিত

২। ম+চ ঃ আরাম চাওয়া = আরাম্‌চাওয়া

ম+ছ ঃ আরাম ছিল = আরাম্‌ছিল

ম+জ ঃ কাম জয় = কাম্‌জয়

ম+ঝ ঃ গরম ঝোল = গরম্‌ঝোল

৩। ম+ট ঃ নরম টমাটো = নরম্‌টমাটো

ম+ঠ ঃ কাম ঠিক হয়েছে = কাম্‌ঠিক হয়েছে

ম+ড ঃ নাম ডাক ছিল = নাম্‌ডাক ছিল

ম+ঢ ঃ রোম ঢোকা = রোম্‌ঢোকা

৪। ম+ত ঃ কাম তোলা = কাম্‌তোলা

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

ম+থ ঃ নাম থোওয়া = নাম্‌থোওয়া

ম+দ ঃ দাম দেওয়া = দাম্‌দেওয়া

ম+ধ ঃ নাম ধাম = নাম্‌ধাম

ম+ন ঃ দাম নেওয়া = দাম্‌নেওয়া

৫। ম+র ঃ নাম রাখা = নাম্‌রাখা

৬। ম+ল ঃ নাম লেখা, সরম লাগা = নাম্‌লেখা, শরম্‌লাগা

৭। ম+শ ঃ কাম শেষ = কাম্‌শেষ

(গ)

১। ল+ক ঃ জাল করা = জাল্‌করা

ল+খ ঃ টাল খাওয়া = টাল্‌খাওয়া

ল+গ ঃ নীল গাই, মাল গুদাম = নীল্‌গাই, মাল্‌গুদাম

ল+ঘ ঃ লাল ঘোড়া = লাল্‌ঘোড়া

২। ল+চ ঃ মাল চালানো = মাল্‌চালানো

ল+ছ ঃ জল ছড়ানো = জল্‌ছড়ানো

ল+জ ঃ লাল জাল = লাল্‌জাল

ল+ঝ ঃ লাল ঝুলি, জল ঝরা = লাল্‌ঝুলি, ঝল্‌ঝরা

৩। ল+ট ঃ লাল টিয়া = লাল্‌টিয়া, তুঃ উল্টো, পাল্টা

ল+ঠ ঃ খাল ঠিক করা = খালঠিক্‌ করা

ল+ড ঃ লাল ডোর = লাল্‌ডোর

ল+ঢ ঃ মাল ঢেকে দাও = মাল্‌ঢেকে দাও

ল এবং ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের স্থানের দিক দিয়ে সমস্থানজাত। কিন্তু উচ্চারণ প্রকৃতির দিক থেকে স্বতন্ত্র। সেজন্য শব্দমধ্যবর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বস্থিত 'ল'য়ে তাদের জিভের ডগা পাল্টানো-জনিত প্রতিবেষ্টন-জাত উচ্চারণ প্রকৃতি সংক্রামিত

হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে মূল দন্তমূলীয় 'ল'য়ের একটি স্বতন্ত্র সহধ্বনি (allophone)-র সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে ল এবং ট স্বতন্ত্রভাবে গঠিত এবং তাদের উচ্চারকেরা পৃথকভাবে মুক্ত হয় না দেখে এ-পরিবেশে 'ল্ট'এ শব্দের অন্তর্বর্তী সন্ধিজনিত একীভূত (Compact) উচ্চারণ হয়। শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের 'ল+ট' প্রভৃতির বহির্বর্তী সন্ধির 'ল' হলন্ত উচ্চারণ পেলেও উচ্চরকেরা পরবর্তী ধ্বনিটি গঠন করতে না করতেই তাদের পূর্ববর্তী সংস্পর্শ (Contact) পৃথক হয়ে যায় দেখে তাদের উচ্চারণ একাত্মতাপ্রাপ্ত নয়।

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। ল+ত ঃ পাল্ তোলা = পাল্‌তোলা, তুঃ আলতা, পল্‌তে

ল+থ ঃ লাল্ থাল = লাল্‌থাল

ল+দ ঃ গাল্ দেওয়া = গাল্‌দেওয়া তুঃ জল্‌দি

ল+ধ ঃ চাল্ ধোওয়া = চাল্‌ধোওয়া

ল+ন ঃ জাল্ নোট = জাল্‌নোট

দন্তমূলীয় ল্-এর দন্ত্য অন্তরধ্বনি (allophon)র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শব্দমধ্যবর্তী ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে। সেজন্যে শব্দের অন্তর্বর্তী সন্ধি (Close-sequence)তে 'ল্‌ত' এর উচ্চারণ একাত্মতা প্রাপ্ত কিন্তু বহির্বর্তী সন্ধিতে 'ল' হলন্ত উচ্চারণ লাভ করলেও 'ল' এবং পরবর্তী ত-বর্গীয় ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয় দেখে তাদের উচ্চারণ শিথিল এবং অপেক্ষাকৃত কোমলতর।

৫। ল+প ঃ কাল্ পাওয়া = কাল্‌পাওয়া

ল+ফ ঃ জাল্ ফেলা = জাল্‌ফেলা

ল+ব ঃ মাল্ বাবু = মাল্‌বাবু

ল+ভ ঃ চাল্ ভালো = চাল্‌ভালো

ল+ম ঃ লাল্ মরিচ = লাল্‌মরিচ

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৬। ল+র ঃ মাল্ রেখে টাকা দাও = মাল্‌রেখে টাকা দাও

ল+শ ঃ লাল শালু = লাল্‌শালু

(ঘ)

১। স+ক ঃ বাস্ করা = বাশ্‌করা (উচ্চারণে)

শ+খ ঃ ঘাস্ খাওয়া = ঘাশ্‌খাওয়া ,,

শ+গ ঃ ঘাস্ গেলা = ঘাশ্‌গেলা ,,

শ+ঘ ঃ ঘাস্ ঘনানো = ঘাশ্‌ঘনানো (,,)

২। শ+চ ঃ বাতাস্ চাই = বাতাশ্‌চাই (উচ্চারণে)

শ+ছ ঃ ঘাস্ ছেলা = ঘাশ্‌ছেলা ,,

শ+জ ঃ ঘাস্ যায় = ঘাশ্‌জায় ,,

শ+ঝ ঃ ঘাস্ ঝাড়া = ঘাশ্‌ঝাড়া ,,

৩। শ+ট ঃ ঘাস্ টাকা দিয়ে কেনা = ঘাশ্‌টাকা দিয়ে কেনা (উচ্চারণে)

শ+ঠ ঃ চাষ ঠিক হয়নি = চাশ্‌ঠিক হয়নি ,,

শ+ড ঃ খাস্ ডাকবাংলো = খাশ্‌ডাকবাংলো ,,

শ+ঢ ঃ খাস্ ঢালী = খাশ্‌ঢালী ,,

৪। শ+ত ঃ খাস্ তবলচী = খাশ্‌তবলচী ,,

শ+থ ঃ আকাশ্ থেকে পড়া = আকাশ্‌থেকে পড়া

শ+দ ঃ বাঁশ্ দেওয়া = বাঁশ্‌দেওয়া

শ+ধ ঃ হাঁস্ ধরা = হাঁশ্‌ধরা (উচ্চারণে)

শ+ন ঃ প্রবেশ্ নিষেধ = প্রবেশ্‌নিষেধ

৫। শ+প ঃ মাস্ পড়েছে = মাশ্‌পড়েছে (উচ্চারণে)

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

শ+ফ : শ্বাস ফেলা = শ্বাস্‌ফেলা ,,

শ+ব : বেতস বন = বেতশ্‌বন ,,

শ+ভ : আকাশ ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেছে = আকাশ্‌ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেছে

শ+ম : ঘাস মশলা = ঘাশ্‌মশলা (উচ্চারণে)

৬। শ+র : শ্বাস রোধ = শ্বাশ্‌রোধ (উচ্চারণে)

৭। শ+ল : খাশ লোক = খাশ্‌লোক ,,

খ, ছ, ঠ, থ, ফ অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো শব্দশেষে মহাপ্রাণতা হারায়।

(৩) ভিন্নস্থান জাত মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনি+অন্যধ্বনি

এ রকম ধ্বনি পরবর্তী শব্দারম্ভের ভিন্নস্থানজাত অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি এবং র, ল, ন, ম, এবং শ দ্বারা অনুসৃত হলে মহাপ্রাণতা হারিয়ে অভিনিধান প্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে। (কেবল 'ছ' পরবর্তী শব্দের ট, ঠ এবং ত, থ এর পূর্বে সকারীভবন লাভ করতে পারে।) যথা :—

(ক)

১। খ+চ = ক্‌চ : লাখ চাই = লাক্‌চাই

খ+ট = ক্‌ট : লাখ টাকা চাই = লাক্‌টাকা চাই

খ+ত = ক্‌ত : রাখ তোর কথা = রাক্‌তোর কথা

খ+প = ক্‌প : লাখ পাওয়ারের যন্ত্র = লাক্‌পাওয়ারের যন্ত্র

২। খ+ছ = ক্‌ছ : টাকা তার লাখ লাখ ছিল = টাকা তার লাক্‌ লাক্‌ছিল

খ+ঠ = ক্‌ঠ : মুখ ঠোকা = মুক্‌ঠোকা

খ+থ = ক্‌থ : সে তুমি লাখ থোও = সে তুমি লাখ্‌থোও

খ+ফ = ক্‌ফ : লাখ লাখ ফুল = লাক্‌ লাক্‌ফুল

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৩। খ+র = ক্‌র ঃ রাখ্‌তোর টাকা = রাক্‌তোর টাকা

৪। খ+ল = ক্‌ল ঃ লাখ লাখ্‌লোক = লাক্‌লাক্‌লোক

৫। খ+ন = ক্‌ন ঃ রাখ্‌নাচন = রাক্‌নাচন

৬। খ+ম = ক্‌ম ঃ টাকা লাখ লাখ্‌মারছে = টাকা লাক্‌লাক্‌ মারছে

(খ)

৭। খ+শ = ক্‌শ ঃ মাখ্‌শালা মাখ = মাক্‌শালা মাক

১। ছ+ক = চ্‌ক ঃ গাছ্‌কাটা = গাচ্‌কাটা

ছ+প = চ্‌প ঃ মাছ্‌পেয়েছ = মাচ্‌পেয়েছো

২। ছ+খ = চ্‌খ ঃ মাছ্‌খাই = মাচ্‌খাই

ছ+ফ = চ্‌ফ ঃ গাছ্‌ফাড়া = গাচ্‌ফাড়া

৩। ছ+র = চ্‌র ঃ মাছ্‌রেখো = মাচ্‌রেখো

৪। ছ+ল = চ্‌ল ঃ গাছ্‌লাগানো = গাচ্‌লাগানো

৫। ছ+ন = চ্‌ন ঃ মাছ্‌নাই = মাচ্‌নাই

৬। ছ+ম = চ্‌ম ঃ মাছ্‌মারা = মাচ্‌মারা

(গ)

১। ঠ+ক = ট্‌ক ঃ কাঠ্‌কাটা = কাট্‌কাটা

ঠ+চ = ট্‌চ ঃ কাট্‌চেলা করা = কাট্‌চেলা করা

ঠ+ত = ট্‌ত ঃ পিঠ্‌তেতে যাওয়া = পিট্‌তেতে যাওয়া

ঠ+প = ট্‌প ঃ কাঠ্‌পেয়েছো = কাট্‌পেয়েছো

২। ঠ+খ = ট্‌খ ঃ কাঠ্‌খড় = কাট্‌খড়

ঠ+ছ = ট্‌ছ ঃ কাঠ্‌ছিল = কাট্‌ছিল

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ঠ+থ = ট্‌থ : কাঠ্‌থোওয়া = কাট্‌থোওয়া

ঠ+ফ = ট্‌ফ : কাঠ্‌ফাটা = কাট্‌ফাটা

৩। ঠ+র = ট্‌র : কাঠ্‌রেখেছো = কাট্‌রেখেছো

৪। ঠ+ল = ট্‌ল : পাঠ্‌লেখা = পাট্‌লেখা

৫। ঠ+ন = ট্‌ন : ওর পিঠ্‌নেই = ওর পিট্‌নেই

৬। ঠ+ম = ট্‌ম : পিঠ্‌মোড়া = পিট্‌মোড়া

৭। ঠ=শ = ট্‌শ : কাঠ্‌শেষ = কাট্‌শেষ

(ঘ)

১। থ+ক = ত্‌ক : শপথ্‌করা = শপত্‌করা

থ+চ = ত্‌চ : পথ্‌চলা = পত্‌চলা>পচ্চলা

থ+ট = ত্‌ট : রথ্‌টানা = রত্‌টানা

থ+প = তপ্‌ : পথ্‌পাওয়া = পত্‌পাওয়া

২। থ+খ্‌ = ত্‌খ : রথ্‌খানা = রত্‌খানা

থ+ছ = ত্‌ছ : রথ্‌ছিল = রত্‌ছিল

থ+ঠ = ত্‌ঠ : পথ্‌ঠিক নেই = পত্‌ঠিক নেই

থ+ফ = ত্‌ফ : পথ্‌ফেলে আসা = পত্‌ফেলে আশা (উচ্চারণে

৩। থ+র = ত্‌র : রথ্‌রেখে আসা = রত্‌রেখে আসা (উচ্চারণে)

৪। থ+ল = ত্‌ল : শপথ্‌লাগা = শপত্‌লাগা

৫। থ+ন = ত্‌ন : সাথ্‌নেওয়া = শাত্‌নেওয়া (উচ্চারণে)

৬। থ+ম = ত্‌ম : পথ্‌মেরে আসা = পত্‌মেরে আশা (")

৭। থ+স = তশ : পথ্‌সেরে আসা = পত্‌শেরে আসা (")

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ঙ)

১। ফ+ক = প্‌ক : হাফ্‌ করে দাও = হাপ্‌ করে দাও

ফ+চ = প্‌চ : হাফ্‌ চাই = হাপ্‌ চাই

ফ+ট = প্‌ট : কফ্‌ টাটকা = কপ্‌ টাটকা

ফ+ত = প্‌ত : কফ্‌ তোলা = কপ্‌ তোলা

২। ফ+খ = প্‌খ : কফ্‌ খাওয়া = কপ্‌ খাওয়া

ফ+ছ = প্‌ছ : হাফ্‌ ছেড়ে বাঁচা = হাপ্‌ ছেড়ে বাঁচা

ফ+ঠ = প্‌ঠ : হাফ্‌ ঠিক হয়েছে = হাপ্‌ ঠিক হয়েছে

ফ+থ = প্‌থ : শাফ্‌ থাকা = শাপ্‌ থাকা

৩। ফ+র = প্‌র : বরফ্‌ রাখা = বরপ্‌ রাখা

৪। ফ+ল = প্‌ল : হাফ্‌ লেখা = হাপ্‌ লেখা

৫। ফ+ন = প্‌ন : বরফ্‌ নাই = বরপ্‌ নাই

৬। ফ+শ = প্‌শ : শাফ্‌ সুতরা = শাপ্‌ সুতরা

ঘ, ঝ, ধ, ভ ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনিগুলো শব্দশেষে মহাপ্রাণতা হারায়। শব্দশেষে ঢ এর পরিবর্তে ঢ় ব্যবহৃত হয়। তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ হ'লেও 'ঢ়'ও এ-পরিবেশে মহাপ্রাণতা হারায়। শব্দশেষে 'ঝ'র ব্যবহারও অনেকটা সীমাবদ্ধ, তার কারণ শব্দশেষে 'ঝ' দিয়ে প্রচুর শব্দ পাওয়া যায় না। যে কয়টি শব্দ পাওয়া যায় তারপরে শব্দারম্ভের কোনো কোনো ধ্বনি থাকলে ঝ তার স্ববর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি 'জ'তে পরিবর্তিত না হয়ে 'Z' জাতীয় উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ-সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এছাড়া অন্যত্র 'ঝ' সহ 'ঘ', 'ধ', 'ভ', তৎপরবর্তী শব্দের ভিন্নস্থানজাত সম্ভাব্য স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষ কি অঘোষ ধ্বনি এবং র, ল, ন, ম, এবং শ দ্বারা অনুসৃত হলে শুধু তাদের মহাপ্রাণতা হারিয়ে অভিনিধানপ্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে। যথা :—

(৪) ভিন্নস্থানজাত ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি + অন্যধ্বনি

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ক) :

১। ঘ+চ = গ্‌চ : বাগ্‌চাই = বাগ্‌চাই

ঘ+ট = গ্‌ট : বাঘ্‌টের পেয়েছে = বাগ্‌টের পেয়েছে

ঘ+ত = গ্‌ত : বাঘ্‌তাকাচ্ছে = বাগ্‌তাকাচ্ছে

ঘ+প = গ্‌প : বাঘ্‌পড়েছে = বাগ্‌পড়েছে

২। ঘ+ছ = গ্‌ছ : বাঘ্‌ছিল = বাগ্‌ছিল

ঘ+ঠ = গ্‌ঠ : বাঘ্‌ঠাই ঠিকানা চেনে = বাগ্‌ঠাই ঠিকানা চেনে

ঘ+থ = গ্‌থ : বাঘ্‌থাবা = বাগ্‌থাবা

ঘ+ফ = গ্‌ফ : বাঘ্‌ফাঁদে পড়েছে = বাগ্‌ফাঁদে পড়েছে

৩। ঘ+জ = গ্‌জ : বাঘ্‌যায় = বাগ্‌জায় (উচ্চারণে)

ঘ+ড = গ্‌ড : বাঘ্‌ডাকে = বাগ্‌ডাকে

ঘ+দ = গ্‌দ : বাঘ্‌দেখা = বাগ্‌দেখা

ঘ+ব = গ্‌ব : বাঘ্‌বেরিয়েছে = বাগ্‌বেরিয়েছে

৪। ঘ+ঝ = গ্‌ঝ : বাঘ্‌ঝোঁপে ঢুকেছে = বাগ্‌ঝোঁপে ঢুকেছে

ঘ+ঢ = গ্‌ঢ : বাঘ্‌ঢুকেছে = বাগ্‌ঢুকেছে

ঘ+দ = গ্‌দ : বাঘ্‌দেখা = বাগ্‌দেখা

ঘ+ভ = গ্‌ভ : বাঘ্‌ভয় = বাগ্‌ভয়

৫। ঘ+র = গ্‌র : বাঘ্‌রুখেছে = বাগ্‌রুখেছে

৬। ঘ+ল = গ্‌ল : বাঘ্‌লুকিয়ে গেছে = বাগ্‌লুকিয়ে গেছে

৭। ঘ+ন = গ্‌ন : বাঘ্‌নাই = বাগ্‌নাই

৮। ঘ+ম = গ্‌ম : খোকা বাগ্‌মারতে যায় = খোকা বাগ্‌মারতে যায়

৯। ঘ+শ = গ্‌শ : বাঘ্‌শিকার = বাগ্‌শীকার

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(খ) :—

১। ঝ্+ক = জ্ক : সাঝ্ঁ করে এসেছো = শাঁজ্করে এসেছো

২। ঝ্+ন = জ্ন : মাঝ্ নৌকায় গিয়ে বসো = মাজ্নৌকায় গিয়ে বশো

(গ) :—

১। ঢ়্+ম = ড়্ম : আষাঢ়্ মাস = আষাড়্মাস

(ঘ) :—

১। ধ্=ক = দ্ক : সাধ্ করে = সাদ্করে

ধ্+ট = দ্ট : দুধ্ টাকা দিয়ে কিনি = দুদ্টাকা দিয়ে কিনি

ধ্+প = দ্প : কাঁধ্ পাতা = কাঁদ্পাতা

২। ধ্+খ = দ্খ : দুধ্ খাওয়া = দুদ্খাওয়া

ধ্+ঠ = দ্ঠ : দুধ্ ঠিকা খাই = দুদ্ঠিকা খাই

ধ্+ফ = দ্ফ : দুধ্ ফুরিয়ে গেছে = দুদ্ফুরিয়ে গেছে

৩। ধ্+গ = দ্গ : দুধ্ গেলা = দুদ্গেলা

ধ্+ড = দ্ড : দুধ্ ডাব = দুদ্ডাব

ধ্+ব = দ্ব : সুবোধ্ বালক = সুবোদ্বালক

বুধ্ বার = বুদ্বার

৪। ধ্+ঘ = দ্ঘ : দুধ্ ঘোল = দুদ্ঘোল

ধ্+ঢ = দ্ঢ : দুধ্ ঢেকে দাও = দুদ্ঢেকে দাও

ধ্+ভ = দ্ভ : বাঁধ্ ভাঙা = বাঁদ্ভাঙা

৫। ধ্+র = দ্র : দুধ্ রেখো = দুদ্রেখো

৬। ধ্+ল = দ্ল : দুধ্ লেগেছে = দুদ্লেগেছে

৭। ধ্+ন = দ্ন : দুধ্ নাই = দুদ্নাই

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৮। ধ+ম = দ্‌ম : দুধ মরে গেছে = দুদ্‌মরেগেছে

৯। ধ+শ = দ্‌শ : বাধ সাধা = বাদ্‌শাধা

(ঙ)

১। ভ+ক = ব্‌ক : লোভ করা = লোব্‌করা

ভ+চ = ব্‌চ : লাভ চাওয়া = লাব্‌চাওয়া

ভ+ট = ব্‌ট : লাভ টেকানো = লাব্‌টেকানো

ভ+ত = ব্‌ত : লোভ তাড়ানো = লোব্‌তাড়ানো

২। ভ+খ = ব্‌খ : লোভ খারাপ = লোব্‌খারাপ

ভ+ছ = ব্‌ছ : লাভ ছেড়েছি = লাব্‌ছেড়েছি

ভ+ঠ = ব্‌ঠ : লাভ ঠিক হয়নি = লাব্‌ঠিক হয়নি

ভ+থ = ব্‌থ : ক্ষোভ থাকা = ক্ষোব্‌থাকা

৩। ভ+গ = ব্‌গ : লাভ গোনা = লাব্‌গোনা

ভ+জ = ব্‌জ : লোভ জয় = লোব্‌জয়

ভ+ড = ব্‌ড : লাভ ডাকা = লাব্‌ডাকা

ভ+দ = ব্‌দ : ক্ষোভ দেখানো = ক্ষোব্‌দেখানো

৪। ভ+ঘ = ব্‌ঘ : লাভ ঘুরে আসা = লাব্‌ঘুরে আশা

ভ+ঝ = ব্‌ঝ : ক্ষোভ ঝাড়া = ক্ষোব্‌ঝাড়া

ভ+ঢ = ব্‌ঢ : ক্ষোভ ঢাকা = ক্ষোব্‌ঢাকা

ভ+ধ = ব্‌ধ : লোভ ধরা পড়েছে = লোব্‌ধরা পড়েছে

৫। ভ+র = ব্‌র : ক্ষোভ রাখা = ক্ষোব্‌রাখা

৬। ভ+ল = ব্‌ল : লোভ লাগা = লোব্‌লাগা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৭। ভ+ন = ব্‌ন : লাভ্‌নেই = লাব্‌নেই

৮। ভ+স = ব্‌স : ক্ষোভ্‌সারা = ক্ষোব্‌শারা

(৫) ভিন্নস্থানজাত বর্গীয় স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি + স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি

শব্দশেষের ক, চ, ট, ত, প স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনিগুলোর পরবর্তী শব্দে স্বল্প ও মহাপ্রাণ বর্গীয় ঘোষধ্বনি এলে পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন Regressive voicing তথা পরাগত ঘোষীভবন পর্যায়ে পড়ে। এ ছাড়া শব্দশেষের ধ্বনিটি অভিনিধানপ্রাপ্তও হয়। এ পরিবেশের স্পর্শধ্বনি চ-এর দ্বি-ধ্বনি পরিবর্তন (double sound change) অনুসারে ঘোষ উষ্মীভবন ঘটে। উদাহরণ :—

(ক) :—ক>গ

১। ক+জ = গ্‌জ : বাগ্‌জাল = বাগ্‌জাল

ক+ড = গ্‌ড : এক্‌ডাকে আসা = এ্যাগ্‌ডাকে আসা ;

নাক্‌ডাকা = নাগ্‌ডাকা

ক+দ = গ্‌দ : পাক্‌দেওয়া = পাগ্‌দেওয়া

ক+ব = গ্‌ব : বাক্‌বিশারদ = বাগ্‌বিশারদ

৪। ক+ঝ = গ্‌ঝ : নাক্‌ঝাড়া = নাগ্‌ঝাড়া

ক+ঢ = গ্‌ঢ : নাক্‌ঢেকে শোওয়া = নাগ্‌ঢেকে শোওয়া

এক্‌ঢোক = এগ্‌ঢোক P 36,211

ক+ধ = গ্‌ধ : শাক্‌ধুয়ে ফেলা = শাগ্‌ধুয়ে ফেলা

ক+ভ = গ্‌ভ : এ শাক্‌ভালো না = এ শাগ্‌ভালোনা

(খ) :—চ>য (z)

১। চ+গ = য্‌গ : পাঁচ্‌গ্রাম = পাঁয্‌গ্রাম

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

চ+ড = য্‌ড : পাঁচ্‌ডাক = পাঁয্‌ডাক

চ+দ = য্‌দ : প্যাঁচ্‌দেওয়া = প্যাঁয্‌দেওয়া

চ+ব = য্‌ব : পাঁচ্‌বাক্স = পাঁয্‌বাক্স

২। চ+ঘ = য্‌ঘ : পাঁচ্‌ঘর, নাচঘর = পাঁয্‌ঘর, নায্‌ঘর

চ+ঢ = য্‌ঢ : পাঁচ্‌ঢোক = পাঁয্‌ঢোক

চ+ধ = য্‌ধ : পাঁচ্‌ধাড়া = পাঁয্‌ধাড়া

চ+ভ = য্‌ভ : পাঁচ্‌ভরি = পাঁয্‌ভরি

(গ) :—ট>ড

১। ট+গ = ড্‌গ : আট্‌গ্রাম = আড্‌গ্রাম

ট+জ = ড্‌জ : ও ঘাট্‌যাও = ও ঘাড্‌যাও

ট+দ = ড্‌দ : পেট্‌দেখানো = পেড্‌দেখানো

ট+ব = ড্‌ব : লাট্‌বাহাদুর = লাড্‌বাহাদুর

২। ট+ঘ = ড্‌ঘ : ঘাট্‌ঘেরা = ঘাড্‌ঘেরা

ট+ঝ = ড্‌ঝ : সাট্‌ঝেড়ে ফেলা = সাড্‌ঝেড়ে ফেলা

ট+ধ = ড্‌ধ : পেট্‌ধরা পড়া = পেড্‌ধরা পড়া

ট+ভ = ড্‌ভ : পেট্‌ভরে গেছে = পেড্‌ভরে গেছে

(ঘ) ত>দ

১। ত+গ = দ্‌গ : জাত্‌গেল = জাদ্‌গেল

ত+ড = দ্‌ড : সাত্‌ডাক = সাদ্‌ডাক

ত+ব = দ্‌ব : ভাত্‌ভেড়েছো = ভাদ্‌বেড়েছো

২। ত+ঘ = দ্‌ঘ : সাত্‌ঘর = সাদ্‌ঘর

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+ঝ	= দ্ঝ	:	পাত্ ঝাড়া	= পাদ্ঝাড়া
ত+চ	= দ্চ	:	পাত্ চাকা	= পাদ্চাকা
ত+ভ	= দ্ভ	:	জাত্ ভাই	= জাদ্ভাই

(৬) :—প> অংশত 'ব' এ পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ দ্রুত কথাবার্তায় এ পরিবেশে প আংশিক ঘোষীভূত হয় এবং অভিনিধানপ্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে।

১।	প+গ	= ব্গ	:	সাপ্ গেলা	= সাব্গেলা
	প+জ	= ব্জ	:	দীপ্ জ্বালানো	= দীব্জ্বালানো
	প+ড	= ব্ড	:	সাপ্ ডাকা	= সাব্ডাকা
	প+দ	= ব্দ	:	শাপ্ দেওয়া	= শাব্দেওয়া,
				রূপ্ দেখা	= রূব্দেখা
২।	প+ঘ	= ব্ঘ	:	পাপ্ ঘর	= পাব্ঘর
	প+ঝ	= ব্ঝ	:	ধূপ্ ঝাড়া	= ধূব্ঝাড়া
	প+চ	= ব্চ	:	পাপ্ চাকা	= পাব্চাকা
	প+ধ	= ব্ধ	:	বাপ্ ধন	= বাব্ধন,
				সাপ্ ধরা	= সাব্ধরা

শব্দশেষের খ, ছ, ঠ, থ, ফ মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনিগুলো তাদের মহাপ্রাণতা হারায়। তাছাড়া পরবর্তী শব্দ স্বল্প ও মাহপ্রাণ বর্গীয় ঘোষধ্বনিগুলোর দ্বারা আরম্ভ হলে পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে তারাও ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনও Regressive Voicing বা পরাগত ঘোষীভবনের পর্যায়ে পড়ে। শব্দ শেষের অন্যান্য ধ্বনির মতো এরাও অভিনিধান জাত উচ্চারণ লাভ করে। এ পরিবেশে 'ছ'এর আবার ঘোষ উষ্মীভবন তথা 'য' কারী ভবনের প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ :—

(৬) ভিন্নস্থানজাত বর্গীয় মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনি+স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ক) :—খ>গ (দ্রুত কথোপকথনে)

১। খ+জ = গ্‌জ : লাখ জ্বালার এক জ্বালা = লাগ্‌জ্বালার একজ্বালা

খ+ড = গ্‌ড : লাখ ডাক = লাগ্‌ডাক

খ+দ = গ্‌দ : লাখ দাওনা কেন = লাগ্‌দাওনা কেন

খ+ক = গ্‌ক : লাখ লাখ বাড়ি = লাক্‌ লাগ্‌বাড়ি

২। খ+ঝ = গ্‌ঝ : লাখ ঝাড়ার এক ঝাড়া = লাগ্‌ঝাড়ার এগ্‌ঝাড়া

খ+ঢ = গ্‌ঢ : সে তুমি লাখ ঢাকোনা কেন, তবু··· = সে তুমি লাগ্‌ঢাকোনা কেন, তবু···

খ+ধ = গ্‌ধ : মুখ ধোওয়া = মুগ্‌ধোওয়া

খ+ভ = গ্‌ভ : লাখ লাখ ভেড়া = লাক্‌লাগ্‌ভেড়া

(খ) :—ছ>য (Z) (দ্রুত কথোপকথনে)

১। ছ+গ = য্‌গ : গাছ গাড়া = গায্‌গাড়া

ছ+ড = য্‌ড : গাছ ডেকে নিয়েছি = গায্‌ডেকে নিয়েছি

ছ+দ = য্‌দ : মাছ দিয়ে ভাত খাও = মায্‌দিয়ে ভাত খাও

ছ+ব = য্‌ব : মাছ বড়ো = মায্‌বড়ো

২। ছ+ঘ = য্‌ঘ : গাছ ঘেরা = গায্‌ঘেরা

ছ+ঢ = য্‌ঢ : শাক দিয়ে মাছ ঢাকা = শাগ্‌দিয়ে মায্‌ঢাকা

ছ+ধ = য্‌ধ : মাছ ধরা = মায্‌ধরা

ছ+ভ = য্‌ভ : মাছ ভাজা = মায্‌ভাজা

(গ) ঠ>ড

ঠ+গ = ড্‌গ : কাঠ গড়া = কাড্‌গড়া

ঠ+জ = ড্‌জ : আমার ও মাঠ যায় যাক = আমারও মাড্‌জায় যাক

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ঠ+দ = ড্‌দ : পিঠ্‌ দেখানো = পিড্‌দেখানো

ঠ+ব = ড্‌ব : ও মাঠ্‌ বেশ ভালো = ও মাড্‌বেশ্‌ ভালো

২। ঠ+ঘ = ড্‌ঘ : কাঠ্‌ ঘর = কাড্‌ঘর

ঠ+ঝ = ড্‌ঝ : মাঠ্‌ ঝেড়ে নিয়ে এলাম = মাড্‌ঝেড়ে নিয়ে এলাম

ঠ+ধ = ড্‌ধ : পিঠ্‌ ধুয়ে দাও = পিড্‌ধুয়ে দাও

ঠ+ভ = ড্‌ভ : ও মাঠ্‌ ভালো = ও মাড্‌ভালো

(ঘ) থ>দ (দ্রুত কথোপকথনে)

১। থ+গ = দ্‌গ : শপথ্‌ গাওয়া = শপদ্‌গাওয়া

থ+ড = দ্‌ড : রথ্‌ ডালে ঢেকে গেছে = রদ্‌ডালে ঢেকে গেছে

থ+ব = দ্‌ব : পথ্‌ বেয়ে আসা = পদ্‌বেয়ে আশা

২। থ+ঘ = দ্‌ঘ : পথ্‌ ঘাট = পদ্‌ঘাট

থ+ঝ = দ্‌ঝ : লাথ্‌ ঝাড়া = লাদ্‌ঝাড়া

থ+চ = দ্‌চ : পথ্‌ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে = পদ্‌ঢেকেছে

ইত্যাদি

থ+ভ = দ্‌ভ : পথ্‌ ভোলা = পদ্‌ভোলা

(ঙ) ফ>ব (দ্রুত কথোপকথনে)

১। ফ+গ = ব্‌গ : বরফ্‌ গেলা = বরব্‌গেলা

ফ+জ = ব্‌জ : হাফ্‌ জয় করা = হাব্‌জয় করা

ফ+ড = ব্‌ড : শাফ্‌ ডাক = শাব্‌ডাক

ফ+দ = ব্‌দ : লাফ্‌ দেওয়া = লাব্‌দেওয়া

২। ফ+ঘ = ব্‌ঘ : কফ্‌ ঘড়্‌ ঘড় = কব্‌ঘড়ঘড়

ফ+ঝ = ব্‌ঝ : হাফ্‌ ঝুকি নেওয়া = হাব্‌ঝুকি নেওয়া

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ফ+চ = ব্‌চ : বরফ্‌চাকা = বরব্‌চাকা

ফ+ধ = ব্‌ধ : হাফ্‌ধার = হাব্‌ধার

শব্দশেষ ও শব্দারম্ভের এ পরিবেশের সমস্থানজাত পরবর্তী অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ঘোষ ধ্বনিটি যে প্রায়ই অঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় তা আমরা আগেই দেখেছি। এ পরিবেশে ভিন্ন স্থানজাত পরবর্তী অঘোষধ্বনির প্রভাবে দ্রুত কথাবার্তায় পূর্ববর্তী যে সব অভিনিধানপ্রাপ্ত স্বল্প-প্রাণ ঘোষধ্বনি পরাগত অঘোষীভবনের (Regressive devoicing) প্রভাবে বা পর্যায়ে পড়তে পারে নিম্নে তার উদাহরণ দেওয়া গেলো :—

(৭) ভিন্ন স্থানজাত বর্গীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি + স্বল্প ও মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি

গ>ক (দ্রুত কথোপকথনে)

(ক) গ+চ = ক্‌চ : ভাগ্‌চাই = ভাক্‌চাই

গ+ছ = ক্‌ছ : ফাগ্‌ছড়ানো = ফাক্‌ছড়ানো

গ+ট = ক্‌ট : রাগ্‌টাগ্‌করোনা = রাক্‌টাক্‌করোনা

গ+ঠ = ক্‌ঠ : তার রাগ্‌ঠাণ্ডাবাতে পারিনি = তার রাক্‌ঠাণ্ডাবাতে পারিনি

(ক) শব্দশেষের চ-বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনিগুলো পরবর্তী শব্দের কোনো কোনো ধ্বনির প্রভাবে উষ্ম তথা শিস্‌ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ পরিবর্তনকে Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের নিয়মানুসারে fricativization, spirantization তথা উষ্মীভবন বলা যায়। এ ধরনের উষ্মীভবনের রূপ দুটো—একটি অঘোষ, অন্যটি ঘোষ। অঘোষ উষ্মীভবনকে 'স'কারী ভবন ('স'কার উষ্মীভবন) এবং ঘোষ উষ্মীভবনকে 'য' (z) কারীভবন ('য'কার উষ্মীভবন) বলা যেতে থারে।

(৮) শব্দশেষের 'চ' বর্গীয় ধ্বনির উষ্মীভবন (Prosody of spiranti zation)

'স' কারীভবন : চ>স ; ছ>স

চ+ট = পাঁচ্‌টাকা = পাঁস্‌টাকা

চ+ঠ = পাঁচ্‌ঠাঁই = পাঁস্‌ঠাঁই

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

চ+ত = পাঁচ্‌তলা = পাঁস্‌তলা, নাচ্‌তে পারো = নাস্‌তে পারো ; কাঁচ্‌তে পারা = কাঁসতে পারা ইত্যাদি।

চ+থ = পাঁচ্‌থালা = পাঁস্‌থালা, পাঁচ্‌থলি = পাঁস্‌থলি ইত্যাদি।

ছ+ট = মাছ্‌টা = মাস্‌টা

ছ+ঠ = গাছ্‌ঠিকা = গাস্‌ঠিকা

ছ+ত = গাছ্‌তলা = গাস্‌তলা

ছ+থ = গাছ্‌থেকে পড়া = গাস্‌থেকে পড়া।

ওপরের উদাহরণগুলোতে 'স' উচ্চারিত হয় দাঁত এবং দাঁতের গোড়ার মধ্যবর্তী স্থান থেকে। সেজন্যে এই 'স'কে দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয় (Pre-alveolar) বলা যেতে পারে। এ পরিবেশের 'স' বাংলার দন্তমূলীয় মূল উষ্মধ্বনি 'শ'এরই একটি allophonic রূপ বা অন্তরধ্বনি : প্রাক্ দন্তমূলীয় ব'লে এ পরিবেশে যথার্থ 'স'কারীভবনের অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'য'কারীভবন : জ>য (z) ; ঝ>য (z)

১। চ+গ = য্‌গ : পাঁচ্‌গ্রাম = পাঁয্‌গ্রাম

চ+ঘ = য্‌ঘ : পাঁচ্‌ঘর = পাঁয্‌ঘর

চ+ড = য্‌ড : পাঁচ্‌ডাক = পাঁয্‌ডাক

চ=ঢ = য্‌ঢ : পঁচ্‌ঢোক = পাঁয্‌ঢোক

চ+দ = য্‌দ : প্যাঁচ্‌দেওয়া = প্যাঁয্‌দেওয়া

চ+ধ = য্‌ধ : পাঁচ্‌ধাড়া = পাঁয্‌ধাড়া

চ+ব = য্‌ব : পাঁচ্‌বাক্স = পাঁয্‌বাক্স

চ+ভ = য্‌ভ : পাঁচ্‌ভরী = পাঁয্‌ভরী

২। ছ+গ = য্‌গ : গাছ্‌গাড়া = গায্‌গাড়া

ছ+ঘ = য্‌ঘ : গাছ্‌ঘেরা = গায্‌ঘেরা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ছ+ড = য্‌ড : গাছ্‌ ডেকে নেওয়া = গায্‌ডেকে নেওয়া

ছ+ঢ = য্‌ঢ : শাক্‌ দিয়ে মাছ্‌ ঢাকা = শাগ্‌ দিয়ে মায্‌ঢাকা

ছ+দ = য্‌দ : মাছ্‌ দেওয়া = মায্‌দেওয়া

ছ+ধ = য্‌ধ : মাছ্‌ ধরা = মায্‌ধরা

ছ+ব = য্‌ব : মাছ্‌ বড়ো = মায্‌বড়ো

ছ+ভ = য্‌ভ : মাছ্‌ ভাগ = মায্‌ভাগ

৩। জ+ড = য্‌ড : রাজ্‌ ডাকো = রায্‌ডাকো
(ইংরেজী z এর মতো উচ্চারণ)

জ+ঢ = য্‌ঢ : লাজ্‌ ঢাকা = লায্‌ঢাকা

জ+ত = য্‌ত : কাজ্‌ তোলা = কায্‌তোলা

লুচি ভাজ্‌ তে পারো = লুচি ভায্‌তে পারো

সে আমার ভাজ্‌ তে হয় = সে আমার ভায্‌তে> (ভাস্‌তে) হয়

জ+থ = য্‌থ : কাজ্‌ থুয়ে দাও = কায্‌থুয়ে দাও

জ+দ = য্‌দ : রাজ্‌ দরবার = রায্‌দরবার

মেজ্‌ দা = মেয্‌দা

মেজ্‌ দি = মেয্‌দি

জ+ধ = য্‌ধ : রাজ্‌ ধর্ম = রায্‌ধর্ম

জ+ব = য্‌ব : রাজ্‌ বাড়ী = রায্‌বাড়ী

জ+ভ = য্‌ভ : ভাঁজ্‌ ভাঙা = ভাঁয্‌ভাঙা

জ+ল = য্‌ল : রাজ্‌ লক্ষ্মী = রায্‌লক্ষ্মী

জ+র = য্‌র : রাজ্‌ রূপ = রায্‌রূপ

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। ঝ+খ =য্‌খ : মাঝ্‌খানে = মায্‌খানে

ঝ+গ = য্‌গ : মাঝ্‌গ্রাম = মায্‌গ্রাম

ঝ+ঘ = য্‌ঘ : মাঝ্‌ঘর = মায্‌ঘর

ঝ+ল = য্‌ল : সাঁঝ্‌লাগা = সাঁয্‌লাগা

ঝ+ব = য্‌ব : সাঁঝ্‌বাতি = সাঁয্‌বাতি

ঝ+ভ = য্‌ভ : সাঁঝ্‌ভর = সাঁয্‌ভর

ওপরের উদাহরণগুলোতে প্রশস্ত দন্তমূলীয় চ, ছ, জ, ঝ ধ্বনিগুলোর ঘোষ উষ্মীভবন (ইংরেজী z এর মতো) বা প্রায়-উষ্মীভবন উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে মূলতঃ দন্তমূলীয়।

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ্' ধ্বনির লোপ আধুনিক বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগের বাংলাভাষা থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তুলেছে। যেমন মহাশয়>মশায়, যাহা>যা, তাহা>তা, কাহাদের>কাদের, তাহাদের>তাদের মহাকাল>মাকাল ইত্যাদি। শব্দমধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় 'হ্' লোপ এ ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির গতিশীলতার লক্ষণ। বাকপ্রবাহে শব্দশেষের যে-কোনো হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরে 'হ্' দিয়ে নতুন শব্দের সূচনা হলে সেখানে দ্রুত কথোপকথনে কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায় —

(৯) অন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি + হ = মহাপ্রাণিত (aspirated) ব্যঞ্জনধ্বনি

প্রথমত, এ পরিবেশেও 'হ্'র লোপ সাধিত হয়, তবে শব্দমধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় 'হ্'এর মতো তা একেবারে নিশ্চিহ্ন না হয়ে গিয়ে পূর্বধ্বনিতে তার মহাপ্রাণতার প্রভাব রেখে যায়। অন্যকথায়, মহাপ্রাণতা তার সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয় দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিটি মহাপ্রাণিত হয়। পূর্ববর্তী ধ্বনিতে এ মহাপ্রাণতা সংক্রমনকে Regressive assimilation অনুসারে পরাগত মহাপ্রাণীভবন বলা যেতে পারে। যেমন :—

এক্‌হারা> এখারা ; সাঁঝ্‌হয়> সাঁঝয় ; মাছ্‌হয়> মাছয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, অন্যভাবে বিচার করলে এ পরিবেশের 'হ' লোপ এবং শব্দ-শেষের ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা সংক্রমণকে শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লাভ এবং সংশ্লিষ্ট ধ্বনিটির আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তন (যেমন রাগ হয়> রাঘয়), কিংবা শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিটিতে মহাপ্রাণতার যথার্থ সংরক্ষণও (যেমন বাঘ হাড়> বাঘাড় ইত্যাদি) বলা যেতে পারে।

পরবর্তী 'হ'কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণীভবনের সমর্থনে শব্দগুলোর অক্ষর বিভাগের পরিবর্তনেরও উল্লেখ করা যায়। 'এক হারা' বাক্যাংশটিতে 'এক্' একটি অক্ষর, পরবর্তী 'হা' এবং 'রা' আর দুটি স্বতন্ত্র অক্ষর, তেমনি 'রাগ হয়' বাক্যাংশটিতে 'রাগ' একটি একাক্ষরিক শব্দ, 'হয়'ও একাক্ষরিক আর একটি শব্দ। কিন্তু বাকপ্রবাহে 'একহারা'>'এখারা'তে এবং 'রাগ হয়'> 'রাঘয়'এ পরিবর্তিত হ'লে এ/খা/রা এবং রা/ঘয়/রূপে অক্ষরভাগ বিচিত্র নয়; বরং দ্রুত কথোপকথনে শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা অনুযায়ী এ ধরনের অক্ষরভাগই অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়।

ওপরের অনুচ্ছেদ দুটির সমর্থন শব্দশেষের যাবতীয় হলন্ত ব্যঞ্জন এবং 'হ' দিয়ে পরবর্তী শব্দের মিলনজনিত নিম্নের উদাহরণগুলোতে মিলবে বলেই আমার ধারণা ঃ

শব্দশেষের বিভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনি ও শব্দারম্ভের 'হ' এর বহির্বর্তী সন্ধি ঃ

এক হারা>এ্যা/খারা
পাঁচ হারা>পাঁ/ছারা
সুখ হয়>সু/খয়
মাছ হয়>মা/ছয়
রাগ হয়>রা/ঘয়
লাজ হীন>লা/ঝীন
বাঘ হাড়>বা/ঘাড়
সাঁজ হয়>সাঁ/ঝয়
রঙ হারা>র/ঙহারা
হাট হদ্দ>হা/ঠদ্দ
ভাত হয়েছে>ভা/থয়েছে
কাঠ হয়ে গেছে>কা/ঠয়ে গেছে
কাত হও>কা/থও

ঝড় হয়ে গেছে>ঝ/ড়য়ে গেছে

বাপ্ হারা>বা/পহারা

শাফ্ হয়ে এলো>শা/ফয়ে এলো

সব্ হয়>শ/ভয় (উচ্চারণে)

ক্ষোভ্ হয়>ক্ষো/ভয়

ঘাম্ হয়>ঘা/ম্মায়

পথ্ হারা>প/থারা

বুঁদ্ হয়ে থাকা>বুঁ/ধয়ে থাকা

স্বাদ্ হয়>শা/ধয়

ধান্ হয়েছে>ধা/ন্নয়েছে

যার্ হবে তার্ হবে>যা/র্হবে তা/র্হবে

লাল্ হয়ে গেছে>লা/ল্হয়ে গেছে

ফাঁস্ হয়ে গেছে>ফাঁ/শ্হয়ে গেছে (উচ্চারণে)

বাক্‌প্রবাহে শব্দশেষের ব্যঞ্জনধ্বনি পরবর্তী শব্দের স্বরধ্বনি দ্বারা অনুসৃত হলে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন খাস্ ইংরেজ, রাত্ ইস্তক, আলাপ্ ইচ্ছা, ভাত্ আনো, জাড় এলো, কাজ্ আছে, আট্ আনা, ঘর্ ওঠানো, একমাস্ অন্তর ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ পরিবেশের শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনির রূপ পায় —কিন্তু সেগুলো যতনা বাকপ্রবাহের অন্তর্গত, তার তুলনায় বিচ্ছিন্ন শব্দের মধ্যেই গণ্য। যেমন এমন+ই=এমনি, যেমন+ই=যেমনি, তেমন+ই= তেমনি, তোমার+ই=তোমারি, আমার+ই=আমারি, এখন+ই= এখনি, তখন+ই=তখুনি, তখন+ও=তখনো, তার+ও=তারো ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন+স্বরধ্বনি

এ পরিবেশে ক্ষেত্রবিশেষে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো ব্যবহৃত হ'তে পারে। /মাথা/, /মুঠি/, /পাঁঠা/ প্রভৃতি শব্দে আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা অঞ্চল এবং লোকবিশেষের উচ্চারণে যেমন কিছু পরিমাণে হ্রাস পায় তেমনি কাঠ আনো, কাঠ এনো, শাঁখ এনো, পথ ইশারা প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা হ্রাস পেলেও এক্ষেত্রে একেবারে নিঃশেষ না হবার কথা। কাইমোগ্রাফ ট্রেসিংএ এ পরিবেশের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতার স্বরূপ মোটামুটি রক্ষিত হ'তে দেখা যায়।

স্বর+ব্যঞ্জনধ্বনি

বাক্‌প্রবাহে শব্দশেষের স্বরধ্বনি এবং শব্দারম্ভের ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যেমন—গুরু গুরু, সরু ধান, গরু নেরে জুতো দান ইত্যাদি।

খ. | গ.

শব্দশেষ ও শব্দারম্ভের বহির্বর্তী সন্ধি ছাড়া বাকপ্রবাহে বাংলা ধ্বনির আরও কতকগুলো পরিবর্তন দেখা যায়। ধ্বনিলোপ (elision) তার মধ্যে একটি। বড়োদিদি>বড়্‌দি, ছোটোদিদি>ছোড়্‌দি, ভাইশ্বশুর>ভাশুর, বড়োদাদা>বড়্‌দা প্রভৃতি Haplology (syllable syncope) বা সমাক্ষরলোপও এর মধ্যে গণ্য। যা ইচ্ছে তাই>যাচ্ছে তাই, তা না হলে>তানইলে>তান'লে,

ধ্বনিলোপ (elision) ও সমবর্গীয় পার্শ্ববর্তী ধ্বনির দ্বিত্ব

ফল আহার>ফলার প্রভৃতি উদাহরণও ধ্বনিলোপের সংজ্ঞাভুক্ত হতে পারে। ধ্বনিলোপের পর পার্শ্ববর্তী সমবর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্বও সাধিত হতে পারে, যেমন কতোদূর>কত্‌দূর>কদ্দুর; যতোদূর>যত্‌দূর>যদ্দুর, ভালোলাগা>ভাল্‌লাগা, বড়োঠাকুর>বড়্‌ঠাকুর>বট্‌ঠাকুর, কোথা যাবে>কোজ্জাবে, যতোদিন>যত্‌দিন>যদ্দিন ইত্যাদি।

বক্তা আবেগপ্রাবল্যে ক্রোধ ও ঘৃণা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে ধ্বনি বা অক্ষর বিশেষের ওপর চাপ দেয়। তাতে ক্ষেত্রবিশেষে আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটির দ্বিত্ব সাধিত হতে পারে। যেমন—তুমি 'কিছু' জানো না> তুমি 'কিস্‌সু' জানো না; 'যতো' পারো>'যত্তো' পারো ইত্যাদি।

ঘ. Prosody : সামগ্রিকতা গুণ

যে কোনো ভাষা মানুষের মুখে কথা হ'য়ে ফুটে উঠলে তা লিখিত হোক বা না হোক তা একটানা পংক্তিগত (linear) ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। লেখা হ'লে তো তার পংক্তিধৃত স্বরূপ আমরা দেখতেই পাই। লেখা না হ'লেও ভাষার ধ্বনির অনর্গল ধারাস্রোতের আত্মপ্রকাশের স্বরূপ একটিই। টেপ রেকর্ড বা অন্য কোন উপায়ে ভাষার বাক্‌ধ্বনিকে ধ'রে বারে বারে শুনলে ধ্বনিস্রোতের দীর্ঘতম একক বাক্য এবং নিম্নতম একক এক একটি ধ্বনিকে আলাদা ভাবে

চিহ্নিত করা যায়। এ ধরনের স্বতন্ত্র ধ্বনিই এক একটি স্বর কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি। আরও দেখা যাবে যে একটি বাক্য তা ছোটো হোক কিংবা বড়ো হোক নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত অসংখ্য তরঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বতন্ত্র ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছের সাহায্যে গড়ে উঠছে। এ তরঙ্গভঙ্গগুলোর প্রত্যেকটিই একটি সিলেবল বা অক্ষর। অক্ষরই সেদিক থেকে বাক্‌প্রবাহের নিম্নতম ইউনিট বা একক। বাক-প্রবাহে একটি অক্ষর নিঃশ্বাসের একপ্রয়াসে উচ্চারিত হয় দেখে উক্ত নিঃশ্বাস-নিষিক্ত যাবতীয় গুণই সমগ্র অক্ষরটিকে ঘিরে প্রসৃত হয়। অক্ষর 'আ' কিংবা 'ও' প্রভৃতি একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গড়ে উঠলেও যেমন, 'বাঘ', 'হাত' 'কি' 'ক্লেশ' প্রভৃতি ধ্বনিগুচ্ছের সাহায্যে গড়ে উঠলেও তেমনি তার অন্তর্নিহিত প্রথম ধ্বনি-নিঃসৃত গুণটি সমগ্র অক্ষরটিরই গুণগত বৈশিষ্ট্য। নিদেনপক্ষে একটি অক্ষর উচ্চারণের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই অধ্যাপক ফার্থের পরিভাষায় 'Prosody' নামে পরিচিত। *

* "In this analysis, abstractions adequate to a full analysis of the phonological working of the language are made from the phonic data, or the raw material of the actual utterances, and these abstractions fall into the two Categories of prosodies and phonematic units. Phonemic units refer to those features or aspects of the phonic material which are best regarded as referable to minimal segments, having serial order in relation to each other in structures. In the most general terms such units constitute the consonant and vowel elements or C and V units of a phonological structure. Structures are not, however, completely stated in these terms, a great part, sometimes the greater part, of the phonic material is referable to prosodies, which are, by definition of more than one segment in scope or domain of relevance, and may in fact belong to structures of any length, though in practice no prosodies have yet been stated as refering to structures longer than sentences. We may thus speak of syllable prosodies, prosodies of syllable groups, phrase or sentence-part prosodies, and sentenc-prosodies."

(Robins, R. H., Proceedings, University. Durham Philosophical Society, Volume I, series B (Arts), number I, 1957, PP 3-4).

এ Prosody অক্ষরকে অতিক্রম ক'রে শব্দে, এবং শব্দকে অতিক্রম ক'রে বাক্যেও প্রবাহিত হ'তে পারে। একটি অক্ষরের ঘোষতা, মহাপ্রাণতা, অনুনাসিকতা কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো গুণ একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে সমগ্র শব্দটিতে বিস্তৃত হ'তে পারে—এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র বাক্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এ রকম ভাবে একই বাক্যমধ্যবর্তী এক শব্দে কিংবা বিভিন্ন শব্দে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গুণ সমন্বয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। একটি বাক্যের এহেন গুণজাত ধ্বনিব্যঞ্জনা বাক্যটির সামগ্রিক ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য, অধ্যাপক ফার্থের ভাষায় Prosodic. তিনি বলেন—

"Lindlay Murrays English grammar (1795) is divided in accordance with good European tradition into four parts, viz, Orthography, Etymology, Syntax and Prosody. Part IV, prosody begins as follows: prosody consists of two parts: the former teaches the true PRONUNCIATION of words, comprising accent, quantity, Emphasis, Pause and Tone, and the latter laws of versification."*

অধ্যাপক ফার্থ শব্দ ও বাক্যের পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণের যাবতীয় তথ্য উদঘাটনের জন্যে মারের 'এ্যাকসেণ্ট,' 'এম্‌ফ্যাসিস,' 'পজ' এবং 'টোন' ইত্যাদিকে শুধু যে Prosody-র অন্তর্ভুক্ত করতে চান তা নয়, তিনি পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির অন্যান্য গুণগত পরিবর্তন এবং তার ফলে নতুন গুণের উদ্রেককেও অক্ষর ও শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণের ছন্দোগত (Prosodic) বৈশিষ্ট্য আখ্যায় আখ্যায়িত করতে চান। ভাষা বিশেষে অক্ষর ও শব্দ প্রভৃতির সামগ্রিক ছন্দোগত গুণগুলো কি কি রূপে ধরা পড়ে প্রত্যেকটি ভাষার বর্ণাত্মক বিশ্লেষণের সাহায্যেই তিনি তার উদঘাটনের প্রয়াসী।

এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাংলায় অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে সামগ্রিক উচ্চারণজনিত এ prosody গুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে:—

* Firth, J. R. Sounds and Prosodies, T. P. S. 1948, P137

(১) Labio-velarization বা W prosody ঃ সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন
(২) Palatalization বা Y prosody ঃ সামগ্রিক তালব্যীভবন
(৩) Prosody of Voicing (V Prosody) ঃ সামগ্রিক ঘোষীভবন
(৪) Prosody of Aspiration (H Prosody) সামগ্রিক মহাপ্রাণীভবন
(৫) Prosody of Nasalization (N Prosody) সামগ্রিক নাসিক্যীভবন
(৬) Prosody of Retroflexion (R Prosody) সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন

বাংলার প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হলে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি পাই 'অ'। এটি পশ্চাৎ অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। এর উচ্চারণে ঠোঁট গোলাকার ধারণ করে। 'ও' এবং 'উ' উচ্চারণেও ঠোঁট গোল হয়। 'উ' উচ্চারণে ঠোঁট শুধু গোলাকার লাভ করে না, প্রসৃতও হয়। এ তিনটি ধ্বনিই জিভের পশ্চাৎভাগ পশ্চাৎ তালুর দিকে উঁচু করে উচ্চারণ করা হয়। এ ধ্বনি কয়টি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করলেও যেমন, কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে উচ্চারণ করলেও তেমনি ঠোঁটের গোলাকৃতির পরিবর্তন হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির ওপরে এ স্বরধ্বনিগুলোর সংস্পর্শ (contact assimilation) গত প্রভাব সমগ্র অক্ষরটিকেই গোলাকার ক'রে দেয়। /কুকুর/, /পুকুর/, /ওর/ /অপর/ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে শব্দ কয়টির স্বতন্ত্র অক্ষরগুলোতেও যেমন, পূর্ণ শব্দগুলোতেও তেমনি ঠোঁটের বর্তুলাকৃতি রক্ষিত হয়েছে। তাদের বিভিন্ন অক্ষর ও সমগ্র শব্দে ঠোঁটের এ বর্তুল রূপই এক্ষেত্রে w prosody নামে অভিহিত হ'তে পারে। ধ্বনি-

w : Prosody
Labio-Velarization
সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন

বিজ্ঞানের এ পরিভাষায় 'অপর' শব্দটিকে $\overset{w}{\frown}$ অপর, পুকুর'কে $\overset{w}{\frown}$ পুকুর, 'ওর'কে $\overset{w}{\frown}$ ওর প্রভৃতি রূপে লেখা যেতে পারে।

Y Prosody ব্যঞ্জনধ্বনিতে সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলার সংস্পর্শ (Contact assimilation) গত প্রভাব। 'ই', 'এ', 'এ্যা', স্বরধ্বনিগুলো জিভের সামনের ভাগ সম্মুখ তালুর দিকে উঁচু ক'রে উচ্চারণ করা হয়। সম্মুখ এবং পশ্চাৎ জিহবার মিলন স্থানকে তালুর মূর্ধার দিকে উঁচু ক'রে 'আ' উচ্চারণ করা হয়। এ

কয়টি মোটামুটি সম্মুখ স্বরধ্বনি। এগুলোর উচ্চারণে জিহবা সামনের দিকে প্রসৃত এবং ঠোঁট — হয় নির্লিপ্ত না হয় প্রসৃত হবার কথা। এ ধ্বনিগুলো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হ'লে তাকেও স্বস্থানচ্যুত ক'রে দেয়। এসব স্বরধ্বনি-সংশ্লিষ্ট এক একটি ব্যঞ্জনধ্বনি — অন্য কথায় এক একটি অক্ষর সামগ্রিক ভাবেই এ কারণে সম্মুখ-প্রসৃত। /কি/, /শিশি/, /ঢেঁকি/, /তারি,/ /চিনি,/ /তারা./ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্যযোগ্য। এগুলোর স্বতন্ত্র অক্ষরগুলোতে যেমন সব কয়টি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণেও তেমনি ঠোঁট নির্লিপ্ত কিংবা প্রসৃত হয়েছে, আর জিভ সামনের তালুর দিকেই গড়ে পড়েছে। অক্ষর কিংবা শব্দ উচ্চারণের এ ধরনের, সামগ্রিক সম্মুখীভবন (fronting)কে Y prosody নামে চিহ্নিত করা যায়। মা আমার>মায়ামার, কে এলো>কেয়েলো, ইনিই তিনি>ইনিয়ি তিনি প্রভৃতি দুই শব্দের সন্ধিস্থলে পাশাপাশি অবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি-গুলোর মধ্যে 'য়' শ্রুতিও সম্পূর্ণ শব্দ কি বাক্যাংশটিকে 'সামগ্রিক সম্মুখীভবন' গুণসম্পন্ন ক'রে তোলে। 'ইনিই তিনি' বাক্যটিকে এ পরিভাষায়, সেদিক থেকে 'ইনিয়ি তিনি' ভাবে লেখা যেতে পারে।

Y Prosody : Palatalization
সামগ্রিক তালব্যীভবন

বাংলার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই ঘোষধ্বনি। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কয়েকটি ঘোষ এবং কয়েকটি অঘোষ। ঘোষধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীগুলোতে কাঁপন লাগে দেখে তাদের অনুরণন সংগীতময়। যে কোনো একটি ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত ও মুক্ত হলে তার পূর্ণ উচ্চারণে একটি স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট হ'য়ে তা একটি অক্ষর গঠন করে। ঘোষতা তখন সমগ্র অক্ষরটিকেই ঘিরে ধরে। অক্ষরের এহেন সামগ্রিক ঘোষীভবনকে Voicing prosody বলা যায়। /আগে/ শব্দটির 'আ' এবং 'গে' দুটি অক্ষরই ঘোষ, শব্দটির সামগ্রিক উচ্চারণও সে জন্যে সামগ্রিকভাবে ঘোষতা-গুণময়। /আবার/, /আমার তুমি মামা হলে/, /কিংবা/, এবার আমার বিয়ে হ'লে বউ আন্‌বো ঘরে/ প্রভৃতি বাক্যে কি বাক্যাংশে কোনো অঘোষধ্বনি না থাকায় এগুলোর উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রী একটানা প্রকম্পিত হয়ে গেছে। স্বরযন্ত্রের Kymograph tracing নিলে এধরনের বাক্যে স্বরতন্ত্রীর প্রকম্পনজাত একটানা তরঙ্গভঙ্গের (wave form) সাক্ষাৎ পাওয়া যবে। শব্দের, বাক্যাংশে

Prosody of Voicing
সামগ্রিক ঘোষীভবন

কি বাক্যের এই একটানা ঘোষীভবন সামগ্রিকভাবে Voicing prosody র অন্তর্ভুক্ত। এ পরিভাষায় এগুলোকে আগে, কিংবা, এবার আমার বিয়ে হ'লে বউ আনবো ঘরে ভাবে লেখা যায়।

স্বরধ্বনির ওপরে ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ (Contact assimilation) গত যে সব প্রভাব দেখা যায় সামগ্রিক মহাপ্রাণিতা তার মধ্যে একটি। মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনি (খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) কিংবা গলনালীয় স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি (হ), কিংবা হ্ল, হ্ন, হ্ম, হ্র প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণে তাদের বিপরীত অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলোর তুলনায় এক ঝলক বেশী বাতাস বের হ'য়ে যায়। 'হ' স্পর্শহীন মহাপ্রাণ উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি, না মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি এ নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও বাংলায় পৃথক কোনো মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি নেই। তা' না থাকলেও বাক্‌প্রবাহে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনি কিংবা 'হ' সংশ্লিষ্ট অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলো সামগ্রিক উচ্চারণের দিক থেকে মহাপ্রাণতা লাভ করে। খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি, কিংবা 'হ' উচ্চারণে সজোরে বাতাস নির্গমনজনিত মহাপ্রাণতা এদের নিছক মুক্তি (Release) অংশে, না তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতে 'তা' জোর ক'রে বলা শক্ত; সে জন্যে মহাপ্রাণতাকে উক্ত যে-কোনো ধ্বনি-সংশ্লিষ্ট অক্ষরেরই সামগ্রিক সম্পদ (syllabic property) হিসেবে গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত ব'লে মনে হয়।

Prosody of aspiration বা 'H' Prosody : সামগ্রিক মহাপ্রাণীভবন

স্বল্পপ্রাণ অক্ষরের সঙ্গে বৈপরীত্য যাচাই ক'রে বাংলা শব্দে নিম্নলিখিত পর্যায়ে মহাপ্রাণ অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়:—

(১) একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শুরুতে:— তুলনীয় — খাল, থাল, ঢাল, ঝাড়, হাত, হাল প্রভৃতি শব্দে।

(২) দ্ব্যক্ষরিক শব্দের শুরুতে:— তুলনীয়—খা/লি, ঢা/লী, থা/লা, হা/লি প্রভৃতি শব্দ।

(৩) ত্র্যাক্ষরিক শব্দের শুরুতে :— ঘ/টনা, খা/টিয়া, হা/টুরে প্রভৃতি শব্দ।

(৪) দ্ব্যক্ষর কিংবা ত্র্যাক্ষরিক শব্দের মাঝখানে—আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি হিসেবে, যেমন—মে/ঠো/, কেঠো/, পা/খা/, মা/থা/, কা/ঠু/রে,পা/ থু/রে, পা/ঠি/কা, পরি/খা/, বরা/খু/রে, এবং স্পর্শহীন মহাপ্রাণ ঊষ্মধ্বনি তথা মহাপ্রাণিত (aspirated) স্বরধ্বনি (হ) হিসেবে যেমন, :—আ/হা, আ/হা/রে, পা/হা/ড়ে ইত্যাদি শব্দ।

কাঠ্, খাট্, মাছ্ প্রভৃতি শব্দের বদ্ধাক্ষর জনিত শেষের মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো অসম্পূর্ণ (স্বরহীন হলন্ত) উচ্চারণ লাভ করে দেখে শব্দশেষের এ পর্যায়ে তারা চারভাগের তিনভাগ কিংবা সম্পূর্ণ মহাপ্রাণতাই হারিয়ে ফেলে। সেজন্যে অক্ষর গঠনের দিক থেকে তারা যখন তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এ ধরনের সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলো মহাপ্রাণিত হয় না, কিংবা হলেও সে মহাপ্রাণতার পরিমাণ এত ক্ষীণ যে তাদের মহাপ্রাণিত অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দ বলা যায় না। কিন্তু ঘাট, হাত প্রভৃতি একাক্ষরিক শব্দের প্রথমটি মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে সম্পূর্ণ অক্ষর এবং সেজন্যেই সম্পূর্ণ শব্দটিও যেমন মহাপ্রাণিত হয়, তেমনি মেঠো, মাথা, কাঠুরে প্রভৃতি দ্ব্যক্ষরিক কি ত্র্যাক্ষরিক শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরটি মহাপ্রাণ ধ্বনির সাহায্যে গঠিত হলে সম্পূর্ণ অক্ষরটি মহাপ্রাণতা গুণসম্পন্ন হয়। ঠিক তেমনি শব্দশেষের মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি একটি বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের শুরুতে স্বরধ্বনি দ্বারা অনুসৃত হলে আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণধ্বনির মতো তাদের মহাপ্রাণতা রক্ষা করে, ফলে এ পরিবেশের শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি দ্রুতকথোপকথনে সামগ্রিকভাবে মহাপ্রাণিত (aspirated) হতে পারে। (তুলনীয় কাঠ এনো>কাঠেনো, শাঁখ আনো> শাঁখানো ইত্যাদি)।

শেষ ও আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণিত অক্ষর

বাক্যে শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি কিংবা মহাপ্রাণ ধ্বনির পরে 'হ' দিয়ে নতুন শব্দ আরম্ভ হলে উক্ত 'হ' লুপ্ত হয়ে (কিংবা না হয়ে?) তার পূর্ববর্তী ধ্বনিটিকে মহাপ্রাণিত করে। এর ফলে এ পরিবেশের স্পর্শধ্বনিটি মহাপ্রাণিত হয়ে আন্তঃস্বরীয় ধ্বনির মতো সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ অক্ষরটিকেই সামগ্রিক

ভাবে মহাপ্রাণিত ক'রে দেয়। তুলনীয় রাগ্ হয়> রা/ঘয়, এক্ হারা> এ/খারা, ঝড় হয়েছে> ঝ/ঢ়য়েছে, মাছ্ হয়> মা/ছয়, বোধ্ হয়> বো/ধয় ইত্যাদি।

এখানকার উদাহরণগুলোর দ্বিতীয় অক্ষরটি সামগ্রিকভাবেই মহাপ্রাণতা গুণসম্পন্ন। অন্য কথায় এ মহাপ্রণতা গুণ সংশ্লিষ্ট সমগ্র অক্ষরটিরই (property of the whole syllable) বিশেষ সম্পদ।

বাংলায়/পাখ্না/, /মাখ্না/, বধ্না/, /বিঘ্ন/ এবং /ইচ্ছা/, /বুদ্ধি/, /দম্ভ/, /রিক্থ/, /দুগ্ধ/, /উদ্ভিদ/ প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে — cc — অর্থাৎ পাশাপাশি দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান আমরা দেখতে পাই। বাংলায় কিছু শব্দে (যেমন-পাখ্না, বধ্না, বিঘ্ন ইত্যাদি) এদের প্রথমটিকে মহাপ্রাণ স্পর্শ বর্ণ দিয়ে লেখা হয়। শব্দশেষের মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণগুলো পরবর্তী শব্দের শুরুতে স্বল্পপ্রাণ বর্ণের দ্বারা অনুসৃত হলে যেমন তারা অভিনিধানপ্রাপ্ত অসম্পূর্ণ উচ্চারণ লাভ করে, তেমনি এ পর্যায়ের মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণগুলোও অভিনিধানপ্রাপ্ত হয় ব'লে তাদের মহাপ্রাণতা হারায়। সুতরাং শব্দমধ্যবর্তী—cc-র প্রথমটিতে বাংলা ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা লুপ্ত হবার বা না থাকারই কথা। তুলনীয় /রুগ্ন/ (rugna) এবং /বিঘ্ন/ (bighna> bigna) প্রভৃতি শব্দ। 'বিঘ্ন' শব্দটির 'ঘ্' এর উচ্চারণ ব্যঞ্জনায় মহাপ্রাণ আমেজ পাওয়া গেলেও /রুগ্ন/ এবং /বিঘ্ন/ জাতীয় শব্দের একই রকম কাইমোগ্রাফ ট্রেসিং পাওয়া যায়। সুতরাং এ পরিবেশে মহাপ্রাণ-ধ্বনির অস্তিত্ব বাংলায় নেই বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু — ccর দ্বিতীয়টি ব্যাপকভাবে বাংলায় মহাপ্রাণধ্বনি হ'তে পারে। তাতেও এ পর্যায়ের সমস্থানজাত (homorganic) বর্গীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর দ্বিতীয়টি যে পরিমাণে মহাপ্রাণধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ভিন্নস্থানজাত (heterorganic) স্পর্শধ্বনিগুলোর দ্বিতীয়টিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে সেই পরিমাণে এখানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। তুলনীয় ঃ—

সমস্থানজাত বর্গীয় ধ্বনি	ঃ	ভিন্ন স্থানজাত ধ্বনি
দুঃখ> দুক্খো		রিক্থ, দুগ্ধ, উদ্ভিদ,
সখ্য> সক্খো		অর্ঘ, গুর্খা, গর্ভ, গুল্খি,
সংখ্যা, শংখ, সংখ,		উস্খুস্, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

ইচ্ছা, কুজ্ঝটিকা, বাঞ্ছা, ঝঞ্ঝা।
পথ্য>পত্থো, বুদ্ধি,
পন্থা, বন্ধন, লক্ষ, গম্ভীর ইত্যাদি।

এ পরিবেশে ভিন্ন স্থানজাত দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলেও যেমন, সমস্থান জাত দ্বিতীয় ব্যঞ্জণধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলেও তেমনি তাদের সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি সামগ্রিকভাবেই মহাপ্রাণতা গুণ লাভ করে। তাহ'লেও সমস্থানজাত ধ্বনি দুটির প্রথমটি দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয় এবং দ্বিতীয়টিতে তাদের উচ্চারকেরা সজোরে পৃথক হ'য়ে যায় দেখে, তাদের একাত্মতাপ্রাপ্ত শক্তিসঞ্জাত মুক্তিলাভ অক্ষরটিকে বিপুল পরিমাণে মহাপ্রাণিত ক'রে দিয়ে যায়।

কতকগুলো কৃতঋণ তৎসম শব্দে শালীন পাণ্ডিত্যপূর্ণ উচ্চারণে -cc-র দ্বিতীয়টি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি -ন-, -ম- এবং তরলধ্বনি -র-, -ল- হ'লে সমস্থানজাত অন্যান্য ধ্বনির মতোই মহাপ্রাণিত হয়। তুলনীয় /চিহ্ন/, চিহ্নিত/, /ব্রহ্ম/, এবং /বর্হ/, (বহ্ন) /, গর্হিত/, /গার্হস্থ্য/, /আহ্লাদ/, প্রহ্লাদ/ প্রভৃতি শব্দ। ইদানীং এসব শব্দে সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে গিয়ে অঞ্চল ও লোকবিশেষের উচ্চারণে চিন্ন, চিন্নিত, বর্র, গর্রিত কিংবা আল্লাদ রূপে তারা দ্বিত্বলাভ করে। কিন্তু আমি এ সব শব্দের দ্বিতীয় ধ্বনিটির সমস্থানজাত অন্যান্য ধ্বনির মতো মহাপ্রাণ উচ্চারণই যথার্থ উচ্চারণ ব'লে মনে করি। আমার উচ্চারণে এদের প্রথমাংশ দ্বিত্বলাভ করে এবং দ্বিতীয়াংশ সজোরে মহাপ্রাণিতভাবে মুক্তিলাভ করে দেখে তাদের সংশ্লিষ্ট সমগ্র অক্ষরই মহাপ্রাণীভূত হয়। সেজন্যে আমার উচ্চারণে মহাপ্রাণতা তাদের সংশ্লিষ্ট অক্ষরেরই সামগ্রিক সম্পদ।

'হ্ন', 'হ্ম' দিয়ে শব্দারম্ভে অবশ্য কোনো অক্ষর পাওয়া যায় না, কিন্তু 'হ্লাদিনী' বিংবা 'হ্রদ' প্রভৃতি কৃতঋণ তৎসম শব্দে 'ল্হ' এবং 'রহ্'র মহাপ্রাণিত রূপ দেখা যায়।

তরলধ্বনি 'র' পরে থেকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant cluster) -র সৃষ্টি করলে এবং বাংলার জাত্ শিস্ধ্বনি 'শ'এর অগ্রদন্তমূলীয় অন্তরধ্বনি 'স'—সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমে এলে শব্দের প্রথম অক্ষরটি মহাপ্রাণিত হ'তে পারে।

তুলনীয়— খ্রীষ্টাব্দ, ঘ্রাণ, ধ্রুব, ফ্রেম, ফ্রক, ভ্রাতা, এবং স্ফুরণ, স্ফুট, স্খলন, স্থাবর প্রভৃতি শব্দ। এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিসৃষ্ট শব্দাক্ষরের সবটুকুই মহাপ্রাণিত হয়। অন্য কথায় মহাপ্রাণতা সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর এবং তাদের সৃষ্ট অক্ষরগুলোর সামগ্রিক সম্পদ।

খাঁটি বাংলা শব্দে একটির বেশী মহাপ্রাণ অক্ষর নেই। সংস্কৃত /ঝঞ্ঝা/ /ভক্ষণ/ /বুভুক্ষা/ প্রভৃতি শব্দে পাশাপাশি দুইটি মহাপ্রাণ অক্ষর দেখি। এ ধরনের অল্পসংখ্যক কয়েকটি কৃতঋণ সংস্কৃত শব্দ ছাড়া বাংলায় একাধিক মহাপ্রাণ অক্ষর-বিশিষ্ট তদ্ভব কি দেশী বাংলা শব্দ আমার চোখে পড়েনি। অভি-ভাষণ, অভি-ধর্ম, ঝন্‌ঝন, ধমাধম প্রভৃতি যৌগিক কিংবা ধ্বন্যাত্মক শব্দে অবশ্য এ মন্তব্য টেকে না। মহাপ্রাণ অক্ষরের পুনরুক্তির অভাব বাংলা সরল তথা তদ্ভব ও দেশী শব্দকে তৎসম এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে পৃথক ক'রে দিয়েছে।

অক্ষরের সামগ্রিক মহাপ্রাণীভবনকে আমাদের বিশ্লেষণাত্মক ধ্বনিতাত্ত্বিক 'H' prosodyর পরিভাষায় এ ভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ—

ঝাল, ঘটনা, মাঝি, পরিখা, বুদ্ধি শাঁখ আনো > শাঁখানো ইত্যাদি।

ঙ, ন, ম — এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে তাদের উচ্চারকেরা স্বস্থান স্পর্শ করতে না করতেই নরম তালু ঝুলে পড়ে দেখে ফুস্‌ফুস উদগত বাতাস নাসাপথে বের হ'তে গিয়ে তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনির ওপরেও প্রভাব বিস্তার ক'রে যায়। শুধু তা নয়, তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতেও এ নাসিক্য অনুরণন সংক্রামিত হয়। এ প্রভাব সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির সংস্পর্শ (Contact assimilation) জাত। একাক্ষর বিশিষ্ট /নাক/, /কান/ প্রভৃতি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণে স্বতন্ত্রভাবে নাসিক্য অনুরণনের চিহ্ন (৺) ব্যবহার করি বা না করি (এ ধরনের শব্দে সাধারণ লেখায় অবশ্য আমরা তা করিনা), ওর ভেতরের নাসিক্যগুণকে আমরা পৃথক ক'রে নিতে পারি না। সে জন্যে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট অক্ষরটির সামগ্রিক উচ্চারণ নাসিক্য অনুরণনময় তথা prosodic। /নাক/ শব্দে 'ন' এর পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ'র সাহায্যে গঠিত সম্পূর্ণ অক্ষর তথা শব্দটি সম্বন্ধে একথা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি /কান/ শব্দে 'ন' এর পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি 'আ' র সাহায্যে গঠিত অক্ষর-সমন্বিত সম্পূর্ণ শব্দটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

Prosody of nasalization
N Prosody
সামগ্রিক নাসিক্যীভবন

এখানে নাসিক্যগুণ সম্পূর্ণ শব্দটিরই সম্পদ (property)। CVC অক্ষরবিশিষ্ট কাঠামোর /মান/, /মন/, /নাম/, /নাঙ/ প্রভৃতি শব্দে যেখানে অক্ষরগুলো নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শুরু হয় এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেই শেষ হয় সেখানে দুইটি নাসিক্যধ্বনির মধ্যবর্তী স্বরধ্বনিটিতে নাসিক্যগুণ গভীরতা লাভ করে। ফলে সমগ্র অক্ষরটিতে এবং সেজন্যেই এধরনের একাক্ষরিক শব্দগুলোতে অপরূপ নাসিক্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। /নানা/, /মানা/, /নানান/ /মানানো/, /মাননীয়া/ প্রভৃতি দ্ব্যক্ষরিক, ত্র্যক্ষরিক, কি চতুরক্ষরিক শব্দেও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অনুরণন তাদের পূর্বে ও পরে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অক্ষর এবং সমগ্র শব্দেরই সম্পদরূপে গণ্য হয়। এ জাতীয় শব্দের Nasal (kymograph) tracing নিয়ে এ কথার যাথার্থ্য বিচার ক'রে দেখা গেছে। অক্ষর ও শব্দে এ ধরনের সামগ্রিক নাসিক্যীভবন সংশ্লিষ্ট মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (Phoneme) জাত ব'লে শব্দাক্ষরের পরিমাণ-নির্বিশেষে তা' শব্দের শুরুতে, মধ্যে কিংবা অন্তে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান বিচারে যে-কোনো অক্ষরকেই নাসিক্যীভূত করতে পারে, তুলনীয়— /নাচুনি/, /বিনুনি/, /জননী/, /রমণী/, /মারানী/, /নামুন/, /নামানো/ /নমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ। সংশ্লিষ্ট nasal phonemeএর সাহায্যে এ ধরনের নাসিক্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হ'লেও সমগ্র অক্ষর কি শব্দের উচ্চারণ থেকে তাকে আলাদা করা যায় না দেখে শব্দ ও শব্দাক্ষরের এ নাসিক্য অনুরণন তখন phonematic না হ'য়ে prosodic property হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের আলোচ্য বিশ্লেষণাত্মক পরিভাষায় তখন /মন/, /মামা/, /নামুন/, /নাম নাই/, /জননী/. /নমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ ও বাক্যাংশকে $\overset{N}{\text{মন}}$, $\overset{N}{\text{মামা}}$, $\overset{N}{\text{নামুন}}$, $\overset{N}{\text{নামনাই}}$, $\overset{N}{\text{জননী}}$, $\overset{N}{\text{নমনীয়}}$ ইত্যাদি রূপে লেখা যেতে পারে।

বাংলায় সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াও অনুনাসিক স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়। স্বরধ্বনির নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-অসম্পৃক্ত-অনুনাসিকতা আভিধানিক পর্যায়ে অনুরূপ অনুনাসিকতাবিহীন শব্দকে অর্থের দিক দিয়ে পৃথক ক'রে দেয়। তুলনীয় /বাক/ এবং /বাঁক/, /কাচা/ এবং /কাঁচা/, /চাচা/ এবং /চাচা/, /কাদা/ এবং /কাঁদা/, /রাধা/ এবং /রাঁধা/, /বাধা/ এবং /বাঁধা/, /কাটা/ এবং /কাঁটা/ প্রভৃতি শব্দ। বাংলায় প্রতিটি স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট অনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াই অনুনাসিকতা লাভ ক'রে তাদের মৌখিক রূপের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টি করে। এজন্যে অনেকে

বাংলার মৌখিক (oral) স্বরধ্বনিগুলোর তুলনায় তাদের প্রতিটি অনুনাসিক (nasalized) স্বরধ্বনিকে স্বতন্ত্র phoneme বা মূলধ্বনি হিসেবে গণ্য করেছেন। বাংলার এ ধরনের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিঅসংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিকে মূলধ্বনি বা phoneme হিসেবে গণ্য করা হোক বা না হোক অক্ষরের মধ্যে ব্যবহৃত হলেই স্বরধ্বনির এ অনুনাসিকতাও সমগ্র অক্ষরটিরই গুণগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। /বাক/ এবং /বাঁক/ শব্দের নাক ও মুখের Kymograph tracing নিয়ে পরীক্ষা করলে প্রথম শব্দটিতে নাসিক্য অনুরণন-জাত চিহ্নের অভাব দেখা যায় অথচ দ্বিতীয়টিতে শুধু সংশ্লিষ্ট 'আ' স্বরধ্বনিটির বেলাতেই নয়, তার পূর্বে 'ব' এর মুক্তি-অংশ থেকে নাসিক্য অনুরণন শুরু হ'য়ে 'ক' গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেতে দেখি। /বাঁক/ শব্দটির আলোচ্য স্বরধ্বনিটির অনুনাসিকতা সেজন্যেই সমগ্র অক্ষরটির এবং এটি একটি একাক্ষরিক শব্দ ব'লে সমগ্র শব্দটিরই একটি বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। এ অনুনাসিকতাও সেকারণে অক্ষর এবং শব্দের সামগ্রিক গুণগত তথা prosodic সম্পদ।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-সংশ্লিষ্ট নাসিক্যভূত অক্ষর ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান বিচারে শব্দের যে-কোনো স্থানে একাধিকবার ব্যবহৃত হতে পারে (তুলনীয় /জননী/, /অনমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ)। কিন্তু নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-অসম্পৃক্ত অনুনাসিক স্বরধ্বনিজাত-অক্ষর শব্দে কেবল যে একটিবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তা-ই নয়, /বিস্ময়/, /আজ্ঞা/, /অবজ্ঞা/, /বিজ্ঞ/ প্রভৃতি কয়েকটি তৎসম শব্দে ছাড়া তাদের অবস্থানও শব্দের প্রথম অক্ষরেই নির্দিষ্ট থাকে। বলা বাহুল্য, সে কারণে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিহীন অনুনাসিকতা বাংলা শব্দের একটি বিশেষ সম্পদ। /বিস্ময়/ কিংবা /অবজ্ঞা/ প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরের ধ্বনিগত যে অনুনাসিকতা তাও বাংলা বানানের প্রভাবজাত। সেদিক থেকে নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনিহীন-অনুনাসিকতা বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরেরই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

বাংলায় শব্দের গোড়াতে 'ন' এবং 'ম' ব্যবহৃত হয়। (তুলনীয়ঃ /নাক/ ও /মাস/ শব্দ।) শব্দের মধ্যে ও শেষে, 'ঙ', 'ন' এবং 'ম' এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিই ব্যবহৃত হয়। তুলনীয় /রাঙা/ ও/ রঙ/, /জানা/ ও /জান/ এবং /ধামা/ ও /জাম/ প্রভৃতি শব্দ।

শব্দের শুরুতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শব্দের মধ্যেও 'ন্', 'ম্' এবং 'ল্ল' এক প্রশ্বাস-জাত সংযুক্ততার সৃষ্টি ক'রে সংশ্লিষ্ট অক্ষরটিকেই সামগ্রিকভাবে নাসিক্যীভূত করতে পারে। তুলনীয় ঃ—/নৃমণি/, /নৃপ/, /অমৃত/ ; /মৃত/, /অন্নৃত/, /ম্লান/, /অম্লান/ প্রভৃতি শব্দ। /স্নান/, /স্নিগ্ধ/ প্রভৃতি শব্দে সংযুক্ত 'স্ন' শুধু শব্দের প্রথম অক্ষরকেই নাসিক্যীভূত করে।

শব্দের মাঝখানে —cc— পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার হয়, যথা ঃ—

(১) 'ঙ' ছাড়া 'ন' এবং 'ম'এর দ্বিত্ব ঃ—পান্না, কান্না, সম্মান, আম্মা, ইত্যাদি।

(২) দ্বিত্বলাভ করলে 'ন' এবং 'ম' দ্বিতীয় স্থানে কয়েকটি সংস্কৃত শব্দে শালীন উচ্চারণে মহাপ্রাণিত হ'তে পারে। যেমন ঃ—চিহ্ন, চিহ্নিত, বহ্নি, অপরাহ্ন, ব্রহ্মা, ব্রাহ্ম ইত্যাদি।

৩। সমস্থানজাত স্পর্শধ্বনির পূর্বে সংশ্লিষ্ট-বর্গীয়-নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার। যেমন ঃ—

(ক) ক-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার ঃ— শঙ্কা, সংখ্যা সঙ্গ, সঙ্ঘ।

(খ) চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্তদন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— সঞ্চয়, বাঞ্ছা, গঞ্জনা, ঝঞ্ঝা।

(গ) ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— কণ্টক, কুণ্ঠা, খণ্ডন।

(ঘ) ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— সন্তাপ, পন্থা, মন্দা, সন্ধ্যা।

(ঙ) প-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— কম্প, গুম্ফ, গম্বুজ, গম্ভীর।

৪। শব্দমধ্যবর্তী ভিন্নস্থানজাত-cc-র প্রথমটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে 'ঙ', 'ন' এবং 'ম' তিনটিই ব্যবহৃত হ'তে পারে, যেমন ঃ—

(ক) -ঙc- রাংতা, রংচঙ্, আংটি, আংঠা, চিংড়ি, রংপুর, সংবাদ, সংশয়, সংযোগ, বাঙ্লা, হিংসা, বংশ, সিংহ, মুংরু, ন্যাংড়া ইত্যাদি। (ঙ্ এবং অনুস্বার (ং) বাংলায় ধ্বনির দিক থেকে অভিন্ন)।

(খ) —nc— ফন্কা, ঠুন্কো, সান্কি, পানকৌড়ি, কান্খা, বনগাঁ, তানপুরা, সন্বাপ, পন্রো, জান্লা ইত্যাদি।

(গ) —mc— কুম্‌কো, দম্‌কা, খাম্‌খেয়ালী, রাম্‌গড়, যম্‌ঘর, ঘোম্‌টা, চাম্‌চে, নাম্‌তা, চম্‌চম্‌, গাম্‌ছা, রাম্‌থাল, রাম্‌দা, কাম্‌ধেনু, চাম্‌ড়া, কাম্‌রা, কাম্‌লা· গাম্‌লা, আম্‌ড়া, তাম্‌সা ইত্যাদি।

৫। শব্দমধ্যবর্তী বিভিন্নস্থানজাত—cc-র—দ্বিতীয়টি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে 'ঙ' শব্দ ও অক্ষর গঠন করে না দেখে শুধু 'ন' এবং 'ম'ই এ পরিবেশে ব্যবহৃত হয়, 'ঙ' নয়। যেমন ঃ—

—cn—বক্‌না, পাখ্‌না, ভগ্ন, রুগ্ন, বিঘ্ন, যাচ্‌না, (যাচ্ঞা)
জ্যোছ্‌না, বাজ্‌না, বাট্‌না।
রত্ন, যত্ন, পত্নী, মদনা, বধ্‌না, স্বপ্ন, যাব্‌না,
ওড়না, ডাল্‌না, কর্ণ, রোশ্‌নি, বাহ্‌না ইত্যাদি।

—cm—তক্‌মা, বাগ্‌মী, মচ্‌মচ, আজমীর, কর্ম, গুল্ম,
চণ্‌মা, আস্‌মান, গহ্‌মা ইত্যাদি।

৬। ভিন্ন স্থানজাত (-cc-) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ—
(ক) জন্ম, তন্ময়, (খ) ওমনি, তেম্‌নি, সাম্‌নে
(গ) বাঙ্‌ময়, রঙ্‌ময় ইত্যাদি।

উপরিউক্ত এক থেকে ছয় সংখ্যক উদাহরণগুলোতে দ্বিত্বপ্রাপ্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং সমস্থানীয় স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণই বেশ জোরালো এবং একাত্মতাপ্রাপ্ত। অন্যান্য উদাহরণগুলোর—cc-র প্রথম কিংবা দ্বিতীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কোমল এবং sequential বা পারম্পর্যগত।

এদের উচ্চারণ পদ্ধতি উদাহরণ বিশেষে যেমনই হোক না কেন—cc-র প্রথমটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে তার পূর্ববর্তী অক্ষরকে এবং দ্বিতীয়টি তার পরবর্তী অক্ষরকে সামগ্রিকভাবে নাসিক্যীভূত করে। কিন্তু /তন্ময়/, /জন্মায়/. /কান্না/, প্রভৃতি শব্দে—cc-র দুটোই নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ব'লে তাদের পূর্ব ও পরবর্তী অক্ষরকে তারা সমানভাবেই অনুনাসিক অনুরণনে ঝঙ্কৃত ক'রে তোলে। এরকম উদাহরণে নাসিক্যগুণ সেজন্যে সমগ্র শব্দবিশেষেরই ধ্বনিসম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।

ব্যঙ্ক, ল্যাম্প, পাম্প্ প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজী কৃতঋণ শব্দেই শব্দশেষে —NC (নাসিক্য ও অন্ত্যব্যঞ্জন)র সংস্থান দেখি। এগুলোতেও নাসিক্য অনুরণন সমগ্র শব্দেরই ধ্বনিগুণ।

বাংলায় নাসিক্য-ব্যঞ্জনবহির্ভূত-অনুনাসিকতা কেবলমাত্র শব্দের প্রথম অক্ষরের গুণ হলেও রেঁায়া, চুঁয়া প্রভৃতি একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে প্রসৃত হ'য়ে গিয়ে সমগ্র শব্দটিতেই নাসিক্য অনুরণনের সৃষ্টি করে।

বাংলায় পার্শ্বজাত তরলধ্বনি 'ল' এর সঙ্গেই কোনো নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনি-অবিমিশ্র-অনুনাসিক অক্ষর সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় না।

বাংলার ট-বর্গীয় 'ট,' 'ঠ,' 'ড,' 'ঢ' এবং তাড়নজাত 'ড়' ও 'ঢ়' ধ্বনি দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কানাড়া প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণ-ঘটিত এ ধ্বনিগুলোর তুলনায় খাঁটি মূর্ধন্য ধ্বনি নয়। এতদঞ্চলের এ ধ্বনিগুলোকে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লাগিয়ে যে ভাবে উচ্চারণ করা হয়, বাংলায় সেভাবে করা হয় না। বাংলায় এদের উচ্চারণ স্থান দন্তমূলই। তবু বাংলাতেও এদের উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় জিভের ডগা দুমড়ে যায় দেখে এসব ধ্বনির মুক্তি-ঘটিত পরবর্তী স্বরধ্বনিটিও তাদের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি গাঢ় ব্যঞ্জনা লাভ করে। এ ধ্বনিগুলো উচ্চারণের এ ব্যঞ্জনা মুখগহ্বরে জিভের প্রতিবেষ্টনজনিত রূপেরই সৃষ্টি। এদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতে প্রতিবেষ্টনজাত গাঢ় ব্যঞ্জনা যেমন প্রসৃত হ'য়ে যায়, তেমনি শব্দ মধ্যবর্তী যে কোনো ট-বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের ডগা তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি গঠনের সময়ই প্রতিবেষ্টিত রূপ ধারণ করতে উদ্যত হয় দেখে শব্দমধ্যমবর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বের ও পরের অক্ষরে সমানভাবেই এ ধ্বনি-নিঃসৃত গাঢ় ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যায়। ট-বর্গীয় এবং ড়, ঢ় ধ্বনির উচ্চারণগত এ গাঢ় ব্যঞ্জনা সমগ্র অক্ষরেরই স্বাদ। এ স্বাদ আমাদের ব্যাখ্যা মতে Prosody of Retrofloxion বা R Prosodyর অন্তর্ভুক্ত।

Prosody of Retroflexion
R Prosody
সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ ও অনুকরণে লেখা ব'লে বাংলা ব্যাকরণগুলোতে 'ষ'কেও মূর্ধন্য ধ্বনির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধ্বনিবিশ্লেষণে আমরা দেখেছি 'ষ' বলে স্বতন্ত্র বা কোনো মূলধ্বনি বাংলায় নেই। আছে দন্তমূলীয় 'শ' ধ্বনি।

বাংলায় স্পর্শধ্বনির সঙ্গে নিম্নলিখিত পরিবেশে অক্ষর মূর্ধন্যীভূত হয় ঃ—

১। প্রথম অক্ষরে ঃ— টাক্, ঠিক্, ঠক্, ডাল্, ঢাল্ ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় অক্ষরে ঃ— কাটা, কাঠা, মাঠা, গাড়ি, গাড়ো ইত্যাদি।

৩। তৃতীয় বা শেষ অক্ষরে ঃ— কাবাটি, পাহাড়ী, শাশুড়ি, মারাঠি ইত্যাদি।

৪। শব্দের closed বা বদ্ধাক্ষর হিসেবে ঃ— কাঠ, মাঠ, লাট, ভাট, ভাঁড়, ঠোট, কপাট, পাহাড়, আষাঢ় ইত্যাদি।

বাংলায় নির্দিষ্ট কতকগুলো শব্দেই পাশাপাশি দুটো অক্ষর মূর্ধন্যীভূত হ'তে পারে, যেমন ঃ—

১। ইংরেজী কৃতঋণ শব্দে ঃ— টিকেট, টমাটো, ডাকোটা ইত্যাদি।

২। নামবাচক বিশেষ্যে ঃ— টাটানো, টোটা, টেরিটি, ঢেঁড়োস ইত্যাদি।

৩। কতকগুলো অভদ্র শব্দে ঃ— ঠেঁটা, ঠুঁটো, ডাঁটা, ট্যাঁঠা ইত্যাদি।

৪। কতকগুলো ধ্বন্যাত্মক ও দ্বৈতশব্দে ঃ— ঠুন্‌ঠুন্, ঢংঢং, ডিম্‌ডিম্, টম্‌টম্, টক্‌টক্, টুক্‌টুকে, টস্‌টস্, টিক্‌টিকি, টল্‌মল্; টাল্‌মাটাল্, টুন্‌টুনি ইত্যাদি।

৫। সাধারণ কতগুলো শব্দে ঃ— টুঁটি, ঠাট্টা, ডাণ্ডা ইত্যাদি।

এছাড়া (ভাড়াটে প্রভৃতি দু-একটি উদাহরণ ছাড়া) শালীন শব্দে বাংলায় শব্দের প্রথমে কি মধ্যাক্ষরে কিংবা শেষাক্ষরে যেখানেই মূর্ধন্যধ্বনির আমদানি হোক না কেন, একটি শব্দে একাধিক মূর্ধন্যীভূত অক্ষর চোখে পড়ে না। শুধু তা-ই নয় মহাপ্রাণ অক্ষরের পর মূর্ধন্যীভূত অক্ষর বাংলায় ব্যবহৃত হয় (তুলনীয় খাঁটি, ভাড়াটে ইত্যাদি) কিন্তু তার বিপরীত অর্থাৎ মূর্ধন্যীভূত অক্ষরের পরে মহাপ্রাণিত অক্ষর বাংলায় নেই বলেই আমার ধারণা।

ইংরেজী কৃতঋণশব্দে 'র' পরে এসে 'ট' ও 'ড' এর সঙ্গে শব্দের প্রথম অক্ষরকে মূর্ধন্যীভূত করে, যেমন ঃ— ট্রাম, ড্রাম ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যাক্ষরে — cc- পর্যায়ে 'ন' পরবর্তী ট বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে (যেমন—ঘণ্টা, লুণ্ঠন; মণ্ডা প্রভৃতি শব্দ), 'ল' পরবর্তী ট-এর সঙ্গে (যেমন উল্টা, পাল্টা, গিল্টি ইত্যাদি) এবং 'ষ'ও পরবর্তী ট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলোকে অর্থাৎ ট বর্গীয় ধ্বনি সংশ্লিষ্ট-অক্ষরের পূর্ব ও পরবর্তী স্বরধ্বনিকে প্রতিবেষ্টিত করে। সেজন্যে এসব ক্ষেত্রেও অক্ষরের মূর্ধন্যীভূত বা প্রতিবেষ্টিত রূপ সমগ্র অক্ষরের এবং সেজন্যেই সমগ্র শব্দের সামগ্রিক ধ্বনিসম্পদ ; অন্য কথায় তাদের Prosodic গুণ।

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে লিখিত হয় দেখে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'ণত্ব' ও 'ষত্ব' বিধানগুলো বাংলার ঘাড়ে মান্ধাতার আমল থেকে চেপে বসে আছে। সে বিধানগুলো প্রধানতঃ এরূপ ঃ—

ণত্ববিধান ঃ ১। টবর্গের পূর্বে মূর্ধন্য-ণ-হয়, যেমন ঃ— বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, খণ্ডন, চণ্ড ইত্যাদি।

২। ঋ, ঋ, র, ষ এর পরে প্রত্যয়ের দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ হয়, যেমন ঃ— ঋণ, ঘৃণা, কৃষ্ণ, (< √কৃষ্ + ন), বর্ণ (< √বৃ =বর্ + ন), বিষ্ণু (< √বিষ্ + নু), পূর্ণ (< √পৃ =পূর্ + ন) ইত্যাদি।

৩। একই পদের মধ্যে প্রথমে ঋ, ঋ, র, ষ, ও পরে স্ববরর্ণ, ক-বর্গ প-বর্গ, য-, ব-, হ-কার ও অনুস্বারের ব্যবধান এবং তারপরে দন্ত্য ন থাকলে উক্ত দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ হ'য়ে যায়, যেমন ঃ— দর্পণ, শ্রবণ, শ্রাবণ, হরিণ, রুক্মিণী, বিষাণ, কৃপণ, রেণু, লক্ষ্মণ, ইত্যাদি।

৪। ঋ, র ষ এর পরে উপরিক্ত ধ্বনিগুলো ছাড়া অন্যধ্বনির ব্যবধান থাকলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়না।

ষত্ব-বিধান ঃ ১। ঋ ও র এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়, যেমন ঃ— ঋষি, বৃষ, ঋষভ, বর্ষা, বর্ষ ইত্যাদি।

২। অ, আ ভিন্ন স্বর এবং ক ও র-পদস্থিত এই কয়টি বর্ণের পরে প্রত্যয়াদির দন্ত্য-স এলে উক্ত 'স' মূর্ধন্য-ষ-য়ে পরিবর্তিত হয়, যথা — কল্যানীয়েষু, মুমূর্ষু, চিকীর্ষা, ইত্যাদি।

৩। উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পরস্থিত কতকগুলি ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়, যথা—অভি + √সিচ্ > সেক + অ = অভিষেক ; স্থা + অন = স্থান — কিন্তু অধি + স্থান = অধিষ্ঠান, প্রতি + স্থিত = প্রতিষ্ঠিত ; সিদ্ধ কিন্তু নিষিদ্ধ, নিষেধ ; সন্ন কিন্তু নিষন্ন ইত্যাদি।

৪। দুইটি পদ সমাসবদ্ধ হ'য়ে এক শব্দে পরিণত হ'লে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদের শেষে -ই, উ, ঋ, ও—থাকলে, পরবর্তী পদের আদ্য দন্ত স মূর্ধন্য-ষ-য়ে পরিবর্তিত হয় ; যথা— যুধি + স্থির = যুধিষ্ঠির, সু + স্থু = সুষ্ঠু, মাতৃ + স্বসা =

মাতৃষ্বসা, পিতৃ + স্বসা = পিতৃষ্বসা, সু + সমা = সুষমা, সু + সেন = সুষেণ, বি + সম = বিষম, গো + স্থ = গোষ্ঠ ইত্যাদি।*

সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়মগুলো বেশ জটিল এবং সাধারণের জন্যে বিভীষিকাপূর্ণ। বাংলা বানান সংস্কৃতের গতানুগতিক পদ্ধতিতে শেখানো হয় ব'লে বানান আয়ত্তকরণের জন্যে এখনও হয়তো এসব দুরূহ সূত্রের কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা ধ্বনিতে এদের কোনো অস্তিত্বই নেই। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান এক ধ্বনির অন্যধ্বনিতে পরিবর্তনের কথা স্বীকার করে না ; ধ্বনি যে ভাবে মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় এ বিজ্ঞান তারি যথাযথ বিশ্লেষণ করে। একারণে বর্ণনাত্মক বাংলা ব্যাকরণেও এসব ক্ষেত্রে এক ধ্বনির অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তনের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিভংগী থেকে বাংলায় ণত্ব ও ষত্ব বিধান-শাসিত বানান এবং তার সূত্রাদির পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

সংস্কৃত ণত্ব ও ষত্ব বিধানমতে এক ধ্বনির অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হবার কথা না ব'লে আমাদের আলোচ্য Prosodic পদ্ধতির সাহায্যে মূর্ধন্যীভূত সামগ্রিক অক্ষর ও শব্দের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।** তুলনীয় সংস্কৃত উচ্চারণ মতে /শ্রাবণ/, /ব্রাহ্মণ/, /বিষণ্ণ/, /বিষ্ণু/, /ঋণ/, /পাঠ/, /তণ্ডিস্তান/ প্রভৃতি শব্দ। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূর্ধন্যধ্বনি উচ্চারণে মূর্ধায় জিহ্বার ডগা প্রতিবেষ্টিত হ'য়ে যে গাঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে, তা-ই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমগ্র শব্দে এবং কোনো কোনো শব্দে সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলোতে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষর ও সেজন্যে সমগ্র শব্দটিরই বিশেষ ধ্বনি সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শব্দ ও অক্ষর-গুলোর সামগ্রিক মূর্ধন্যীভূত বা প্রতিবেষ্টিত রূপ R prosodyর চিহ্ন দিয়ে এভাবে দেখানো যেতে পারে, যেমন :— শ্রাবণ, ব্রাহ্মণ, নিষণ্ণ, বিষ্ণু, ঋণ, তণ্ডিস্তান ইত্যাদি।

* ণত্ব ও ষত্ব বিধানের সূত্র ও উদাহরণগুলো ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (২য় সং) পৃঃ ১১০-১১৪ থেকে সংগৃহীত।

** দ্রষ্টব্য :— W.S. Allen — Some Prosodic Aspect of Retroflexion and Aspiration In Sanskrit; BSOAS 1951 XIII/4.

সংস্কৃতে 'ন' ও 'ণ' এবং 'শ', 'ষ', ও 'স' ধ্বনিগুলো আভিধানিক পর্যায়ে শব্দ সৃষ্টি করে। বাংলায় ঋ, র, ষ, ণ জাতীয় কোন মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। এখানে একটি 'শ' এবং একটি 'ন' ই আছে। সেজন্য এসব ধ্বনিসমন্বিত মূর্ধন্যীভূত সংস্কৃত অক্ষরের নিয়মগুলো বাংলায় চলেনা। কেবলমাত্র শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে -cc- পর্যায়ের দ্বিতীয় ধ্বনিটি ট-বর্গীয় হ'লে কষ্ট, কাষ্ঠ, অষ্ট, মুণ্ডা, আণ্ডা, লুণ্ঠন, প্রভৃতি শব্দে Contact assimilation এর ফলে 'ষ' এবং 'ণ' এর উচ্চারণ দেখা যায়। এ পরিবেশের মূর্ধন্যীভূত 'ষ' এবং 'ণ' এর উচ্চারণও সেজন্য আমাদের মতে prosodic এবং সংশ্লিষ্ট ধ্বনির পূর্ব ও পরের অক্ষরে প্রসৃত।

বাংলায় এ ধরনের সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন এক বাক্যে পাশাপাশি বহু শব্দেই ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন— /বড়ো হাড়টা ঠিক ঠিক বসেছে/, /ওর বড়ো বাড় বেড়েছে/, /কাল ওই ওড়ে বড়ো ঝড় হয়েছে/ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সমগ্র বাক্য ঘিরে প্রতিবেষ্টিভূত ব্যঞ্জনাই বহুল পরিমাণে ধ্বনিগুণ বা ধ্বনিসম্পদের সৃষ্টি করে।

নিছক একটি উপাদানে তৈরী একটি ব্যঞ্জনের যে স্বাদ বহু উপাদানে তৈরী সে ব্যঞ্জনের স্বাদ তার তুলনায় বহুগুণে মিষ্টতর। তা যেমন রসনাকে তৃপ্তি দেয় তেমনি আত্মার আনন্দেরও কারণ ঘটায়। ধ্বনি মানুষের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে না, জিহ্বার লালাও ক্ষরণ করে না, কিন্তু যা করে তাতে মানুষের আত্মা উল্লসিত হয়, পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্বাদে তার মনপ্রাণ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। মানুষের বাক্‌ধ্বনির অবিরল ধারাস্রোতে এক-একটি অক্ষর ও শব্দে একাধিক গুণ সমন্বয়ে বহু উপাদান সমন্বিত ব্যঞ্জনের মতো অপরূপ স্বাদের সৃষ্টি হলে তার আত্মা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়। বাংলা শব্দাক্ষর এবং শব্দে নিম্নলিখিত এ ধরনের একাধিক সামগ্রিকতা বা Prosody র সমন্বয়ই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য বিচারের জন্যে যথেষ্ট ঃ—

আন্তর Prosodic সমন্বয়

১। V+H Prosody ঃ— ঘর, রঘু, বাঘা, গাধা ইত্যাদি।

২। H+N Prosody ঃ— খাঁটি, হাঁড়ি, ঝাঁটা, ছিঁট ইত্যাদি।

৩। R+H Prosody ঃ— ঠাকুর, ঠোকর, কাঠা, মেঠো ইত্যাদি।

৪। R+V Prosody ঃ— ঢাকা, ঢেকুর, গাঢ়ো ইত্যাদি।

৫। V+H+N+R Prosody ঃ— ভাঁড়, হাঁড়ি, ঘণ্টা, ঢেঁটরা ইত্যাদি।

মীর-মানস

মুনীর চৌধুরী

১.০. বর্তমান প্রবন্ধ মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে পরিকল্পিত আমার বিস্তৃততর আলোচনার ভূমিকা হিসেবে পাঠ্য।

১.১. কোনো কবি-সাহিত্যিকের মানসপ্রকৃতি ও শিল্পকর্মের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করার কতগুলো সাধারণ নিয়ম একাধিক সমালোচকদের কাছ থেকে সমাদর লাভ করে আসছে। রীতিগুলো যে একেবারে অভাবনীয় এবং অপরিবর্তনীয় এমন বলা যায় না। তবে এর শৃঙ্খলাপূর্ণ অনুশীলন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত লেখক সম্পর্কে পাঠক সাধারণের খণ্ডিত ও অস্পষ্ট ধ্যানধারণাকে সহজে সংহতি ও স্বচ্ছতা দান করে।

প্রথম কর্তব্য পরিবেশকে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা। শিল্পীর জীবন যে স্থান ও কালের অধীন ছিল তার ব্যাপক পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করা। কিন্তু সে পটভূমি ভাব ও কর্মের সহস্র ধারায় অভিষিক্ত, তার সকল আবর্ত হয়ত সরাসরি চিত্তবিশেষকে স্পর্শ করেনি। তাই প্রয়োজন হয় সেই পরিব্যাপ্ত বিরাট পশ্চাৎপটের বিশেষ এলাকা সীমাচিহ্নিত করা, যার সংক্রমণ-বিশেষ শিল্পীর মানস গঠনকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, তার নানা অনালোকিত প্রবণতাকে প্রখর করে তুলেছে। পরিবেশ থেকে প্রামাণ্য ও প্রাসংগিক তথ্য চয়ন করে, তার সংগে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক স্থাপন করে শিল্পীর সামগ্রিক মানস সংঘটনের একটা মূল্যবান স্থূল প্রতিকৃতি রচনা সম্ভব। এই বিচারেরই বিপরীত পিঠ বা পরবর্তী স্তর হলো শিল্পীর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁর বিচিত্র ভাবনার প্রতিফলনকে লোচন করা এবং তার নানা সংকেতকে অনুসরণ করে শিল্পীর পরিপূর্ণ মানস-মণ্ডলের চিত্র রচনা করা। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা শিল্পবিচারের ঋজুতর মানদণ্ড

আরোপ করে লেখকের কোনো বিশিষ্ট রচনার বা রচনারীতির কোনো সুনির্দিষ্ট রূপের রসোৎকর্ষ ও কলাকৌশলকে পাঠকের ধারণাধীন করে তুলতে সচেষ্ট হই।

বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য মূলতঃ দ্বিতীয় স্তরের। কখনো কখনো প্রসংগ রক্ষার অনিবার্য তাগিদে প্রথম ও তৃতীয় এলাকার প্রান্ত স্পর্শ করেছি মাত্র।

২.০. মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব বিচার পেশ করবার আগে অন্যান্য গবেষকবৃন্দ এই বিষয়ের ওপর নানা গ্রন্থে প্রবন্ধে যে সকল মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন তা সংক্ষেপে জরীপ করা যাক। নানা মুনির নানা মতের সীমানা নির্দেশের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তকেও স্পষ্টতা দান করতে সক্ষম হবো। মীর মশারফ হোসেন সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হোলো ঃ

ক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২৮নং ২৯নং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা ১৩৫৫)।

খ। কাজী আবদুল ওদুদ, বিষাদ-সিন্ধু, শাশ্বত বংগ, (কলিকাতা ১৩৫৮), পৃঃ ১২৪-১২৬।

গ। আবদুল লতিফ চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, (সিলেট ১৯৫২)।

ঘ। মুহম্মদ আবদুল হাই, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬), পৃঃ ৬৯-১১৪।

ঙ। আশরাফ সিদ্দিকী, মীর মশাররফ হোসেন, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা (ঢাকা ১৯৫৭), পৃঃ ১৭-২৫,। সম্পাদিত জমিদার দর্পণের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট, (ঢাকা ১৩৬২)। মাসিক মোহাম্মদী, মাহে-নও ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ।

চ। কাজী আব্দুল মান্নান, উদাসীন পথিকের মনের কথা, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃঃ ৪২-৬৩।

ছ। মোহাম্মদ ইদরিস আলী, বাজীমাত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, (ঢাকা, ভাদ্র—চৈত্র ১৩৬৫)।

জ। আহমদ রফিক, শিল্প সংস্কৃতি জীবন, (ঢাকা ১৩৬৬)। দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ 'মীর মশাররফ ঃ অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার রূপায়ণ' পৃঃ ৯৮-১১২।

২.১. বলা বাহুল্য এই রচনাসমূহের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ। রচনাটি প্রাচীনতম হলেও পরবর্তী কোনো লেখকই মীর সাহেবের সমগ্র রচনাবলীর সংগে অধিকতর ব্যাপক বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যক্ত করতে সমর্থ হন নি। মীরের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে চুম্বক আকারে যত সংবাদ এখানে সরবরাহ করা হয়েছে এমন অন্য কোথাও নজরে পড়ে না। বিস্তৃততর তথ্য অনুসন্ধানের যে সব সংকেত এই পুস্তিকায় ছড়ানো রয়েছে তাকে সম্বল করেই আমরা মীর সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়েছি। গ্রামবার্তার সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার যে মীর মশাররফ হোসেনকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন, সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে মীরের কোনো কোনো রচনার রদবদল করেছিলেন, বঙ্কিম যে বঙ্গদর্শনে মীরের দুটি গ্রন্থের সমালোচনা করেন, ভারতীতে বিষাদ সিন্ধুর প্রশস্তি প্রকাশ, প্রদীপে গাজী মিঞার বস্তানীর ওপর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের দীর্ঘ প্রবন্ধ, বসুধায় মীরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা মীর সাহিত্যের বিস্তৃত বিচার এবং এই পর্যায়ের আরো নানারকম অজানিত তথ্যের হদিস ব্রজেন বাবুই প্রথম দেন। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে মীরমানস ও মীরের সাহিত্যকীর্তির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ না হলেও, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি সংকলিত করে এবং প্রাসংগিক যাবতীয় তথ্যসম্পদের প্রাপ্তিস্থানের নির্দেশ দান করে তিনি সংক্ষেপে সাধ্যমত সম্পূর্ণ মশাররফ হোসেনকে চিত্রিত করেছেন। এই বিচারবিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সুনির্বাচিত সুশৃংখলিত তথ্যভাণ্ডারের সংগে আমাদের সাম্প্রতিক বর্ণনামূলক সংযোজনা এখন পর্যন্ত তুলনায় ক্ষীণ এবং গৌণ।

হয়ত স্বাভাবিক কারণে একটা বিষয়ে ব্রজেন বাবুর মীমাংসা সীমাবদ্ধ, একপেশে। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কিছু জীবন্ত কৌতূহল এই পুস্তিকা পাঠের দ্বারা পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করে না। এ লেখায় জোর পড়েছে

মীর সাহেবের সাহিত্যাদর্শের অসাম্প্রদায়িক বিশুদ্ধতার ওপর, মীর মানসের হিন্দুমুসলিম ভেদাভেদ লোপকারী প্রয়াসের ওপর, তাঁর ভাষার সংস্কৃতানুসারী সাধুতার ওপর। অবিশ্লেষিত থেকে গেছে মীর মানসে মুসলমানী ঐতিহ্যের চক্রমণ, মীর রচনাবলীর মধ্যে সেই ধর্মীয় চেতনার বহুরূপী প্রকাশ অথচ মীর রচনাবলীর এক বৃহৎ অংশ যে এই প্রশ্নের বিশদ বিচার দাবী করে সেকথা অস্বীকার করবে কে!

২.২. আশরাফ সিদ্দিকী ও আব্দুল লতিফ চৌধুরীর রচনা মূলতঃ বর্ণনামূলক, তথ্য পরিবেশনই তার প্রধান লক্ষ্য। দুজনের মধ্যে আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর রচনা সংখ্যার বাহুল্যে এবং অনুসন্ধান কর্মে অক্লান্ত শ্রমশীলতার জন্য পাঠক সাধারণের কাছে অনেক বেশী প্রিয় এবং শ্রদ্ধার্হ। তবু যেসব কারণে তাঁর আলোচনা কৌতূহলী বিশেষজ্ঞের কাছে যথেষ্টরূপে পরিতৃপ্তিকর বা আস্থা উদ্রেককারী নয় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত আশরাফ সিদ্দিকী পরিবেশিত পুঞ্জীভূত তথ্যের আন্তর-পরিচর্যা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সামগ্রিক উপলব্ধির পরিচয় বহন করে না। এই কারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সরলতা, বিচ্ছিন্নতা ও আকস্মিকতা মীরের দুনিয়া বা ধান্দা সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রকৃত নেত্রমুক্তি ঘটায় না। সম্প্রতি প্রকাশিত (মাহে নও, ডিসেম্বর ১৯৬০, ঢাকা) হিতকরী প্রবন্ধে কবে এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, কোন্ কালে কে তার সম্পাদক সহসম্পাদক এজেন্ট ছিলেন, কোন্ ছাপাখানা থেকে ছাপা হোতো, সে ছাপাখানার মালিক কে ছিলেন ইত্যাদি অনেক লঘুগুরু সংবাদের জটিল তালিকা দিয়েছেন। কেবল যখন হিতকরী প্রথম পর্যায়ে মীর মশারফ হোসেন দ্বারা সম্পাদিত হোতো তখন এই পত্রিকায় কারা লিখতেন, কি নিয়ে লিখতেন, কোন্ ঢংগে লিখতেন সেই অতিবিহিত সংবাদটাই প্রচার করলেন না। ১৮৯৯ইং বা ১৩০৬ বাংলা সনে হিতকরী নব পর্যায়ে খাঁটি ও নিখুঁত মুসলমানি ভাবে প্রচারিত হওয়ায় মীর মানসের কোনো উল্লেখযোগ্য স্তরোত্তরণ সূচিত হোলো কিনা, মীরের সমগ্র সাহিত্য-কর্মের বিবর্তনধারার সংগে তার কোনো সংগতি আছে কি না সে সব কথা অমীমাংসিত থেকে গেল। জমিদার দর্পণের আলোচনা প্রসংগে আশরাফ সিদ্দিকী কাঙাল হরিনাথ সম্বন্ধে যে পর্যাপ্ত তথ্যের অবতারণা করেছেন তার

প্রাসংগিকতা গোটা প্রবন্ধের আয়তনের অনুপাতে গৌণ, মূল সিদ্ধান্তের পোষকতার বিচারেও মামুলী। স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল যে কাঙাল হরিনাথের জীবন চেতনা বরাবর এক তালে চলে নি; লালন ফকির এসে তার মূলে মোচড় দিয়ে গেছে! মীর সাহেব উভয় স্তরেই কাঙালের সুহৃদ ছিলেন। প্রবন্ধের বক্তব্যের মধ্যে এই ভাবদ্বৈতের কোনো স্পষ্ট স্বীকার নেই, ব্যাখ্যা নেই। এমন কি কাঙালের সংগে লালনের সাক্ষাৎকারের সময় নির্দেশের যায়গায় এসে লেখক অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। শুধু বললেন, কাঙাল যখন কুমারখালীতে তখন। তথ্য জড় করেও সত্য প্রতিষ্ঠার বেলায় মীরের চিত্তদর্পণের একাংশকেই মাত্র মূল্য দান করলেন। তাও এমন এক অংশের যার ধারণা লাভ করা খুব শ্রমসাপেক্ষ ছিল না।

আশরাফ সিদ্দিকীর সাহিত্য বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো সর্বাপেক্ষা সরল ও দুর্বল। নাটক হিসেবে জমিদার দর্পণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে, মীরের সমাজ চেতনার নির্বিরোধ বাঙালিয়ানার পরিচয় দিতে গিয়ে, মীরের ভাষার খাঁটিত্ব বোঝাতে গিয়ে গর্জমান ইংরেজী বাংলা উদ্ধৃতির যে আড়ম্বর প্রকাশ করেছেন তা বর্জনেই সত্য বেশী পোক্ত হোতো। মীরের পূর্বসূরীদের নামের তালিকা দিয়েছেন গুরত্বপূর্ণ কালক্রম লংঘন করে, মুখ্যগৌণের ভেদ অস্বীকার করে তাঁদের সবাইকে দায়ী করেছেন সংস্কৃত রীতির নকলকার বলে। শেষে অনাবশ্যক সাফাই হিসেবে মীরের গতানুগতিকতাকে তুলনা করেছেন 'জলে যেন ভাসে মীন' এই প্রবাদ বাক্যের সুলভ সত্যতার সংগে।

গবেষণামূলক প্রবন্ধে উদঘাটিত তথ্যের বিদ্যমানতা সম্পর্কে পাঠকের পূর্ণ আস্থা থাকা চাই। একবার সেটা নষ্ট হলে সবই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকীর আলোচনা পাঠ করে সকল সময় ঠাহর করা যায় না যে কোন্ তথ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সত্যি প্রত্যক্ষ, কোন্ ক্ষেত্রে সেটা পরোক্ষ, আর কখন একেবারেই কল্পিত। বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেন প্রবন্ধে তিনি মীরবংশের যে পীঠিকা তৈরী করেছেন তা প্রমাদপূর্ণ। মীর সাহেব আরবী ফারসী নানা ভাষা এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন, একথার কোন প্রমাণ নেই। মশাররফ হোসেন কোনো কালেই মেম বিয়ে করেন নি। কি হয়েছিল তার অকপট বর্ণনা আছে বিবি কুলসুম, আমার জীবনীতে নয়। মেম সংক্রান্ত ব্যাপারটা

ঘটেছিল কুলসুমকে বিয়ে করার অনেক পরে, আগে নয়। আশরাফ সিদ্দিকীর তথ্যবহুল প্রবন্ধে সত্যাসত্যের এমন এলোমেলো মিশাল সতর্ক পাঠকের শ্রদ্ধাবোধকে বিচলিত করে।

আবদুল লতিফ চৌধুরীর বইয়ের ভিত্তি ব্রজেন বাবুর পুস্তিকা। তবে যে সকল বই লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন সেগুলো সম্পর্কে স্বভাবতই বিস্তৃততর পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। গাজী মিঞার বস্তানী, বিবি কুলসুম ও ইসলামের জয়ের ওপর লেখা অংশগুলো পড়ে অনেক পাঠক উপকৃত বোধ করবেন। কিন্তু যে সকল বই লতিফ সাহেব দেখন নি অথচ তার ওপর মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেছেন সেসব ক্ষেত্রে মতামত হয় নিতান্ত মামুলী ধরনের; নয় রীতিমত বিভ্রান্তকারী হয়েছে। যেমন সুকুমার সেনের ওপর বরাত দিয়ে রত্নবতীকে বলেছেন রোমান্টিক উপন্যাস। আশরাফ সিদ্দিকীও রত্নবতীকে রোমান্সমূলক উপন্যাস বিবেচনা করে বংকিমের দুর্গেশনন্দিনীর সংগে তার তুলনা করেছেন। রত্নবতী প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা। তার ধর্ম উপন্যাসের চেয়ে রূপকথার অনেক কাছাকাছি। লতিফ চৌধুরী ও আশরাফ সিদ্দিকী কেউ গ্রন্থটি দেখেন নি বলে স্বাধীন ও পৃথক মত প্রকাশ করার কোন অসুবিধা বোধ করেন নি। লতিফ চৌধুরী গ্রন্থের সার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমার জীবনী 'মীর সাহেবের বাল্যকাল থেকে দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্বের কৌতুকাবহ জীবন-আলেখ্য' আসলে বইটি শোকাবহ।

অবশ্য লতিফ চৌধুরীর মূল্যবোধ যে সর্বত্র অগ্রাহ্য এমন কথা আমরা কখনো বলি না। গাজী মিঞার বাস্তনীপ্রসংগে নীচের মীমাংসা পরিণত রসদৃষ্টি ও পরিপ্রেক্ষিত বোধের পরিচায়ক ঃ

> সাহিত্যিক মূল্য ও রচনাকৌশলের দিক দিয়ে কমলাকান্তের দপ্তরের সংগে গাজী মিয়াঁর বস্তানীর তুলনা হয় না। কমলাকান্তের দপ্তর দীপ্তবুদ্ধি, অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা ও অকাট্য যুক্তি বিচারের ফল। গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে প্রখর বুদ্ধি ও রসদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে গাজী মিয়াঁ যে কমলাকান্ত অপেক্ষা ভূয়োদর্শী একথা স্বীকার করতে হবে। গাজী মিয়ার বস্তানীর ভাষা কমলাকান্তের দপ্তরের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ঃ বস্তানীর ভাষার সাথে আলালের ঘরের দুলালের ভাষার বেশ মিল আছে। | পৃঃ ২১ |

বাজীমাত্ প্রবন্ধের লেখক মোহাম্মদ ইদরিস আলীও মীরমানসের বিচারে সুস্থির রসবোধ এবং অস্থির ইতিহাস চেতনা উভয়কে অবহেলা করেছেন। যদি না করতেন তাহলে কখনই বলতে পারতেন না যে "বাজীমাত্ ব্যংগ-রংগ রচনা। তৎকালে প্রচলিত ব্যংগরচনার মতই এর মধ্যে স্থূলতার প্রশ্রয় আছে। এদিক দিয়ে সূক্ষ্মতা এখনও অবশ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছায়নি। ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই ব্যংগের স্থূল রূপটা দেখিয়ে গেছেন।" বাজীমতের প্রকাশ কাল ১৩১৫। 'তৎকালে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবন অতিক্রম করে গেছেন। এই তৎকালে প্রচলিত ব্যংগরচনায় স্থূলতা যদি কোথাও প্রশ্রয় পেয়ে থাকে তবে তা সাহিত্যের আসরে নয়, বটতলায়। বটতলায় আর একাল সেকাল কি; তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে রংগরস সৃষ্টির বিবর্তন ধারায় ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ও দান একই বিন্দুতে স্থিতিশীল নয়। কালের বিচারেও সংবাদ প্রভাকর ও বঙ্গদর্শনের মধ্যে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পঞ্চাশ বছরের পার্থক্য, তাৎপর্যের বিচারে, অনেক সময় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েক শত বৎসরের তুল্যমূল্য। দীনবন্ধু ও বঙ্কিম উভয়েই ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ছিলেন নামে মাত্র, আসলে আয়ত্ত করেছিলেন গুরুমারা বিদ্যে। ঈশ্বরগুপ্তের পর দীনবন্ধু দামী ও দীপ্যমান ব্যংগরংগ সৃজনের ক্ষেত্রে আনকোরা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাংগালীর রসচেতনার স্তর ও পরিধি শতগুণে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। বঙ্কিমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় আরো পরে। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মই অশ্লীলতা ও কুরুচি, স্থূলতা ও গ্রাম্যতার বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিবাদ স্বরূপ। ঈশ্বরগুপ্ত কি দীনবন্ধুর গুণকীর্তন করতে বসেও বঙ্কিম বদ্জোবান সম্পর্কে নিজের অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন রাখেন নি।

কাজী আবদুল মান্নান লিখিত প্রবন্ধটির বর্ণনামূলক অংশ মূল্যবান। তবে উদাসীন পথিককে মীর মানসের সর্বোত্তম প্রতিনিধি নির্বাচিত করা শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছিল না। নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের এমন কিছু অবর্ণনীয় রূপ এই গ্রন্থে মূর্ত হয়ে ওঠে নি। বাল্যস্মৃতি মন্থন করে এবং অন্যের কাছ থেকে শুনে শুনে অতীত পারিপার্শ্বিকের যে চিত্র পুনর্গঠন করেছেন তার মধ্যে অনেক রচনাকুশলতার পরিচয় থাকলেও উদাসীন পথিকের আসল তাৎপর্য

অন্যত্র অনুসন্ধান যোগ্য। মীরমানসের এক অতি সংকটপূর্ণ ক্রান্তিকালে রচিত এই গ্রন্থে লেখক মনের কথা বলার সংকল্প গ্রহণ করেন। নিজের মনের গোপন কথার সংগে গোটা পরিবারের ও বাইরের প্রকাশ্য ঘটনাবলীর যোগসূত্র নিপুন ভাবে গ্রথিত হয়নি বলে এই বইয়ের কাহিনী অংশ একটা সামগ্রিক সুসংবদ্ধতা লাভ করেনি। তা সত্ত্বেও এই মনের কথার স্বরূপ বিচারে উদ্যোগী হয়ে গ্রন্থ-রচনাকালীন মীরমানসের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল। সে কাজটাই বেশী জরুরী ছিল। মান্নান সাহেব এই প্রয়োজনকে গৌণমূল্য দান করায় প্রবন্ধটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাবয়ব হতে চায় নি।

খণ্ডিত বিচারের একশেষ করেছেন আহমদ রফিক। জমিদার দর্পণ, উদাসীন পথিকের মনের কথা এবং গাজী মিয়াঁর বস্তানীকে আশ্রয় করে লেখক মশাররফ হোসেনের অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার অকুণ্ঠ তারিফ করেছেন। জমিদার দর্পণে না হলেও শেষের বই দুটোতে যে মীর মানসের গণচেতনা ও অসাম্প্রদায়িকতা কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে সমালোচক তা নিজ উদারতায় লক্ষ্যপথে আনেন নি। আনলে আরো লক্ষ্য করতেন যে মীরের পরবর্তী সকল রচনাই সার্থক, স্বসম্প্রদায় এবং স্বপরিবারের প্রতি একক প্রীতির নিদর্শন।

২.৩. কাজী আবদুল ওদুদই প্রথম মীর মানসের দ্বন্দ্বমূলক মূল সূত্রটি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন। মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা বিষাদসিন্ধু বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তিনি মীরমানসের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপরীতধর্মী সরলতা ও জটিলতা, গতানুগতিকতা ও মৌলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা, গ্রাম্যতা ও নাগরিকতা, মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা সকলই মীরের স্বভাবজ। বিগত কালের রসবোধ ও জীবন-চেতনার যে প্রকাশ পুঁথিসাহিত্যে লক্ষ্য করি মীরমানস তার সংক্রামকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। "অনেকের ধারণা মীর মশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু জংগনামা ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধু ভাষায় রূপান্তর মাত্র।" আবার বিষাদসিন্ধুরই এমন অনেক দিক ও অংশ আছে যা প্রমাণ করে যে মাইকেল বংকিমের শিল্পানুভূতিরও তিনি উত্তরাধিকারী। "জগৎ ও জীবন, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর তা নয়। মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে

তার পরিচয়ও যথেষ্ট।" কাজী আবদুল ওদুদের বিচারের এই সংকেত অনুসরণ করে আমরা মীরমানসের স্বরূপ ও তার রূপান্তরের ধারা দুইই সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হই।

মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে পাকিস্তানে প্রকাশিত যাবতীয় রচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের অংশটুকু তথ্যের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। বিচার-বিশ্লেষণমূলক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাহ্যমানতার গুণে হয়ত অপ্রতিম নয়, কিন্তু তাই বলে সেগুলোর মূল্য সামান্য নয়। লেখক মীর মানস সম্পর্কে একাধিক মীমাংসার অবতারণা করেছেন। প্রত্যেকটির লক্ষ্য আরেকটু স্পষ্টতার সংগে মীর রচিত মানসের বৃত্তি ও বৃত্ত, ধর্ম ও মূল্য যথাযথ রূপ নিরূপণ করা। যে তিনটি মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের সংশয় এখনো কাটে নি তার দুটো হলো মীর মানসের সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা এবং সমন্বয়ধর্মিতা প্রসঙ্গে, তৃতীয়টি বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের তুলনায় মীরের আসন নির্বাচন বিষয়ক।

মীরের সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা বা শিল্পী জীবনের নিঃসংগতা বলতে অধক্ষ্য মুহম্মদ আবদুল হাই এই বোঝাতে চেয়েছেন যে মীর মশাররফ হোসেন সমাজসচেতন খুবই ছিলেন কিন্তু কোনো রকম সভাসমিতি বা প্রতিষ্ঠান আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। মেহমেডন লিটারারী সোসাইটি থেকে সুরু করে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, ওহাবী থেকে বংগভংগ কোনো কিছুই যেন মীর মানসকে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করে যেতে পারে নি। হাই সাহেবের মতে মীরের এই নিস্পৃহতা মূলতঃ শৈল্পিক, তাঁর নিছক সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পানুরাগের ফল। অবশ্য একটু পরে একথাও তিনি বলেছেন যে "...এমনও হতে পারে যে তিনি ইচ্ছে করেই এসব জাতীয় আন্দোলন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, এতে প্রবেশ করে এর অংশভাগী হতে চান নি।"

জমিদার দর্পণ থেকে গাজী মিয়াঁর বস্তানী পর্যন্ত পাঠ করে কখনই মনে হয় না যে এই জীবন পথিক দুনিয়াদারীর ব্যাপারে শিল্পী সাধকদের মতো উদাসীন। বরঞ্চ যিনি বলাৎকারী হায়ওয়ান আলীর মতো জমিদার চরিত্র সোৎসাহে আঁকতে পারেন, যমদ্বারের মানুষরূপী আস্ত পিশাচ পিশাচীদের অবিকল প্রতিকৃতি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তিনি আর যাই হোন নির্বিকার পুরুষ নন। মীরের এই শ্রেণীর রচনার পেছনে ব্যক্তিগত ভাবে

আক্রান্ত হৃদয়ের উত্তাপ ও আলোড়ন এত প্রবল যে শৈল্পিক নৈর্বক্তিকতা পদে পদে নিগৃহীত হয়েছে। অপর দিকে শেষ বয়সের রচনাবলীর সমাজবিমুখ ধর্মানুপ্রাণতাও কেবল মাত্র বয়স্ক সামাজিকের সাধারণ অবসাদ ও নিরাসক্তিকে প্রকাশ করে, কোনো শিল্পীজনোচিত নির্লিপ্ততাকে নয়।

শিল্পীর নৈর্বিক্তকতা ও নির্লিপ্ততা সামাজিকের ব্যক্তিগত নৈর্বক্তিকতা ও নির্লিপ্তিতার ঠিক বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। শিল্পী পারিপার্শ্বিকের ক্ষুদ্রতম স্পন্দনকে নিজের চিত্তদর্পণের সহস্র রংগেবিভংগে প্রতিফলিত দেখেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মথিত হন না। মীর মানস নিজের পরিচিত দুনিয়ার নিকট ঘটনাবলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আচ্ছাদিত। এই কারণে যে ঘটনা তাঁকে সরজমিনে গ্রাম, গৃহ, পরিবার, পেশার সূত্রে সরাসরি আঘাত করে নি তিনি সে বস্তুকে স্বাভাবিক ভাবেই উপেক্ষা করে এসেছেন। এ অবহেলা ঘোরতর রকম মানসিক, শৈল্পিক নয়। মীর তাঁর বক্তব্যের সংগে মানুষ হিসেবে যে পরিমাণ যুক্ত, অনেক ক্ষেত্রে, শিল্পী হিসেবে সে পরিমাণে তা থেকে মুক্ত নয়। হাই সাহেব তাঁর মূল সিদ্ধান্তের উপান্তে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা মিথ্যা নাও হতে পারে। বিবি কুলসুম থেকে তাঁর একটি সংকেত উদ্ধৃত করছি ঃ

> স্বদেশী অন্দোলোনে কুলসুম বিবি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। আন্দোলনকারিদিগের দুই তিনজন ব্যতীত সকলের ঘরের খবর সন্ধান করিয়া বলিতেন যে,— ইহাদের এরূপ বাকমারি কেন? ঘরে তণ্ডুল নাস্তি, ওদিকে ধনেকুবের— অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশজাতি, বিদ্যাবুদ্ধিতে জগত শ্রেষ্ঠ। সভ্যতায় জগতে সর্বজাতির আদর্শ এবং অগ্রণী। বিচার ক্ষেত্রে স্থির ধীর। এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ— বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে? দিদিমনীরা সভাসমিতি করিয়া হাতের বলয় এবং অন্য অন্য অলংকার পর্যন্ত খুলিয়া দিয়া দেশ উদ্ধার করিতেছেন। তোমাকে কাব্য বিশারদ পত্র লিখিয়াছে, সাবধান বিশারদের কথায় ভুলিও না। তোমাকে ছ মাস পর্যন্ত কি ভোগান ভোগাইয়াছে। দশ হাজার বিষাদ সিন্ধু সস্তাদরে লইয়া খবরের কাগজের জন্য উপহার দিবে। মনিবে তিনমাস, চাকরে তিনমাস ঘুমাইয়া দিব্বি খাতির করেছে। ওর নাম মুখে আনিও না। ওরূপ সভায় আমি তোমাকে যাইতে দিব না।... যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশহিতকর সভায় যাইতে পারেন। দু' বেলা উপাসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের হিত সাধন সভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভা-সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।

সভা-সমিতি সম্পর্কে মীরের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের এই কারণ সাচ্চা হলে তাকেও শিল্পী-সুলভ বলা চলে না।

মীর মানসের সমন্বয়ধর্মিতা তাঁর রচনাবলীর প্রথম আর্দ্ধেক অংশে হয়ত সত্য। বাদবাকী রচনার বিচারে এই গুণনির্দেশ অপ্রয়োজ্য।

৩'১ লাহিনীপাড়া, দেলদুয়ার, পদমদী। কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরের এই তিন পূর্ব-বংগীয় গ্রামাঞ্চলে মীর মশাররফ হোসেনের কৈশোরোত্তর সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে। কৃষ্ণনগর কলিকাতার সংগে একবার সামান্য যোগাযোগ ঘটে বাল্যে ও কৈশোরে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে জীবনেও সৎ-সংগের অভাব ছিল। নাগরিক জীবনের যে এলাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের কলিকাতা সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও বোধকে আত্মসাৎ করে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মুখর ছিল মীর মানসের সংগে তার সম্পর্ক পরোক্ষ এবং দূরাগত। সতের বৎসর বয়সে (১৮৬৪) উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা আসেন। ঠিক হয়েছিল আলীপুরের আমীন পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের বাসায় থেকে পড়াশুনো করবেন। কিন্তু ;

> ... লেখাপড়ার নাম কাহারও মুখে শুনি না।... চাঁদ মিয়ার মুখেও না। সে কেবল দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আবার বারুণীঠাকুরাণীর সহিত অতি নির্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রলাপ করেন। আমার সহিত ঠাকুরাণীর এতদিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে। লম্বোদরী ক্ষীণ গ্রিবা ঠাকুরাণীর বহু প্রলোভনের মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বৎসর কাটাইয়াছি। গায়ের রক্ত দেহের আঘ্রাণ মন মজান, প্রাণ মাতান ভাব, দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে আত্মমন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হইত, কারণ বড় বড় মহানুভব ঋষিতুল্য জ্ঞানী, পূজ্যপাদ গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ হরিহর আত্মা ... । আমার জীবনী ।

আঠার বছর বয়সে মীরের সংগে নাদির হোসেনের দ্বিতীয় কন্যা আজিজন নেসার বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সম্ভবতঃ এই অতি সংক্ষিপ্ত কলিকাতা পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বাল্যকালের পড়াশুনোর বৃত্তান্তও গ্রাম্য মলিনতা থেকে মুক্ত নয়। হাতে খড়ি হয় মুন্সী সাহেবের কাছে, কারণ মুরব্বিরা বিশ্বাস করতেন যে, 'মুন্সী সাহেবের হাতে খড়ি দিলে দারগাগিরি চাকরী না হইয়া যায় না।' পাঁচ বছর বয়সে কোরান শরীফের প্রথম পারার বেশ

কিছুটা পড়ে ফেলেছেন। তবে অক্ষর পরিচয় বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরান পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরানের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে? চোদ্দ বছর বয়সে কুমারখালী ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ। মীরের আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে ঃ

> ইংরাজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মরিবার সময় গিডিমিডি করিয়া মরিতে হইবে। আল্লা রসুলের নাম মুখে আসিবে না। ... ইংরেজী পড়িলে, একরূপ ছোট খাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়। জবহা ঝটকার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক নাপাকের জ্ঞান থাকে না। মাথায় চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।... | আমার জীবনী।

এই সময়ে বাংলা চিঠিপত্র এবং হেঁয়ালী লেখাই ছিল মীরের অন্যতম কাজ। স্কুলে ফারসীও একরকম পড়ান হোতো। 'অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি গদ্য মুখস্থ আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া মুন্সীজিকে সংগে করিয়া আমরা ৫।৬ জন শিষ্য অন্য কোন আত্মীয় বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম।' বালক মীর পুঁথির বড় ভক্ত ছিলেন। যদিও 'পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ।' পনের বছর বয়সে 'যৌবন জোয়ারারম্ভে' 'অভ্যাস দোষে, সংগ দোষে, এরূপ হইল যে পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সংগে হাসি রহস্য তাস খেলিতে ইচ্ছা করে।' সম্ভবতঃ ১৮৬৩ তে পদমদী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়তেন। ষোল বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সতেরতে কলিকাতা আগমন এবং প্রথম বিবাহ। নিয়মিত পাঠাভ্যাসের অন্য কোনো সংবাদ এর পর থেকে আর পাই না।

৩.২ মীর পরিবারের বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির যে চিত্র মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী মূলক রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে তার বৈভবের মধ্যেও একটা মধ্যযুগীয় স্থৌল্য প্রবল। মীর মশাররফ হোসেনের পিতা সেকেলে অর্থে বাদ্য গীত ও নৃত্যভক্ত মাহফেলী লোক ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনকে তাঁর মাতামহী অনেক দুঃখে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ

যদি তোমার বাপ অন্য স্ত্রীলোক ঘরে না আনিতেন, যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবেন কেন? ··· সতীনের যন্ত্রণায় আগুনে পীর পয়গম্বরের মেয়েরা পর্যন্ত জলিয়া পুড়িয়া ছারেখারে গিয়াছেন। আমরা ত কোনো ছার। বিবি হনুফার জন্য বিবি ফাতেমা জলিয়াছেন। তারপর ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জয়নাবের কথা...?

মীর মশার্‌রফ হোসেনের চরিত্রে প্রথম কলংকদোষ ঘটে ঘরের দাসী-বাঁদীর সংসর্গে। ষোড়শ বর্ষে চন্দনমৃগীর নবাব মীর মহাম্মদ আলীর বজরায় মনোমোহিনী দেহপশারিণীর আহ্লাদ নাচগান রগড় রহস্যের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার বিষময় ফল ভোগ করেন। বারণীঠাকুরাণীর সংগে আলাপ পরিচয় কখন কি পরিমাণে ঘটে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি না থাকায় তার কাল নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সপ্তদশ বর্ষে গ্রাম্য প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়ে যাকে ভালবাসতেন তার বদলে অন্যকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে নতুন প্রেমিকা দ্বাদশ বর্ষীয়া কিশোরী কুলসুমকে দ্বিতীয় পত্নী রূপে গ্রহণ করেন। মীর পরিবারের পীর বিনদীয়ার হজরত কুলসুমকে মুরিদ বলে গ্রহণ করেন এবং নিকাহের অনুমতি দেন। এই ১৮৭৩ থেকে মীরের নবজীবন সূচিত হোলো।

কুলসুমকে নেকাহ্ করার পূর্বে আমি মানব সমাজে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত ছিলাম না। — পাঁচ ইয়ার লইয়া পঞ্চ মকারের সেবা ···! বিবি কুলসুম আমার গৃহে আসিলেন, গৃহিনী হইলেন। তাঁহার প্রথম কার্যই হইল আমার মতিগতি ফিরান, আমাকে সৎপথে আনা। ভূত প্রেত ছাড়ান। ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিবে; ঔষধ ধরিতে আরম্ভ হইল! ঈশ্বরের কৃপায় ধর্মশাস্ত্রমত একত্র সম্মিলনে ক্রমেই ভালবাসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। [বিবি কুলসুম]

দ্বিতীয় বিবাহের অন্ততঃ প্রথম দশ বৎসর মীরের সংসার সপত্নীবাদের হিংসানলে দাউদাউ করে জ্বলেছে। আজিজন্‌নেসা 'সপত্নী হিংসাবাদে দিন দিন মনের গতি ও সদিচ্ছা সকল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমাকে বাধ্য করিবার জন্য শাসন নীতি আরম্ভ করিলে, শাসনে গর্জনে কুলসুম সহিত শত্রুতাচরণে, তাহাকে জব্দ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশলজাল গোপনে বিস্তার করা আরম্ভ করিলেন।' এমন কি 'আজিজন বিবি মীরসাহেব

আলীর সহায়ে নুরুদ্দীন ডাকাতের সাহায্যে কুলসুমকে জগৎ হইতে সরাইতে পরামর্শ আঁটিয়াছেন। অতি সহজ উপায়, দুইটি উপায়—কৌশলে হস্তগত করিয়া হস্তপদ বাঁধিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ। অথবা গলা টিপিয়া মারিয়া রেলওয়ে লাইনের উপর রাখিয়া দিলেই যে দেখিলেই বুঝিবে এরূপ মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি হতে পারে।' (বিবি কুলসুম) অষ্টাদশ বর্ষে বাংলা ১২৮৬ সনে বিবি কুলসুম সন্তানবতী হন। পরবর্তী পনের বছরে বিবি কুলসুম একাদশ সন্তানের জননী হন। মীর মানসের সৃষ্টিশীল বিকাশও এই পর্বে সর্বাপেক্ষা উর্বর ও সার্থক। এই পরিতৃপ্ত জীবনের প্রত্যয়বোধকে মীর সাহেব যেভাবে বিবি কুলসুম বইতে ব্যক্ত করেছেন তার একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি।

> ১২টার মধ্যে স্নান আহার শেষ করিতে হইবে, আমার বাঁধা নিয়ম। একত্র আহার করিয়া আমি কাছারিতে চলিয়া যাইতাম। ... কাছারি হইতে আসিয়াই তাঁহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া আমি একটু ঘুমাইব। ৩০ মিনিটের বেশী নহে। তাহার পর জাগিলেই আমার হাত পা টিপিয়া দেওয়া কুলসুম বিবির কর্তব্য কার্য ছিল। ৭টা বাজিলেই উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পুস্তক পাঠ, না হয় গ্রামোফোন গান শুনা অথবা দুজনে তাস খেলা করা। রাত্রে আটটা বাজিলে আহার—আহারের গোলমাল মিটিতে দশটা বাজিয়া যাইত। তাহার পরে আমার নিজ লিখার কার্য। যেই ১২টা বাজিয়া গেল—আমিও শয্যায়। কুলসুম বিবি যে দিন নূতন কোন লিখার কথা শুনিতেন, সে দিন আর শয়ন শয্যায় যাইতেন না। লিখা শুনিয়া পরে শয়ন করিতেন। তিনি রাত্র ৪টা বাজিয়া গেলে, বিছানায় শুইতেন না। শৌচাগার গমন, বস্ত্র পরিবর্তন—প্রভাতীয় উপাসনা জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সূর্য্যোদয়ের সংগে সংগে চা আণ্ডা আলু সিদ্ধ আমার জন্য প্রস্তুত। আমি আমার জীবনে সাংসারিক সুখ বিবি কুলসুম জন্য বিশেষ রূপে ভোগ করিয়াছি।

বিবি কুলসুমের মৃত্যু বাংলা ১৩১৬ সনে। সেই বৎসরে প্রকাশিত বিবি কুলসুম মীরের শেষ রচনা। তার দু বছর পর মীর মশাররফ হোসেনও দেহাবসান করেন।

এই সুফলপ্রসু সুনির্মল দাম্পত্য জীবন অনভিপ্রেত ঘটনার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে নি। পরিশোধিত মীর-চরিতের সকল প্রবৃত্তি নবজীবনের

অনুপ্রেরণাধীন ছিল না বলে সন্দেহ করি। নিজের জীবন বর্ণনা প্রসংগে বিবি কুলসুমের শেষ পরিচ্ছেদে একটি ঘটনার কথা এই ভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

> ... হঠাৎ দেখি বিবি কুলসুম মহা ক্রোধান্বিতা হইয়া বাড়ীর একটি দাসীকে মারিতে একখানা জ্বালানী কাঠের চেলা হাতে তাড়া দিয়াছেন। আমি কিছুই বলিতেছি না। কারণ কোন বিষয়ে বিবি কুলসুমের হঠাৎ রাগ দেখিলে আমি চুপ করিয়া থাকি। ... আমি বলিলাম আমি মিথ্যাবাদী নহি, বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি কাহার সহিত কোন কথা কহি নাই, কাহারও গায়ে হাত দেই নাই।

ঐ বইতেই বাংলা ১২৯২ সনের আরেকটি গল্প বলা আছে। তখন মীর সাহেবের কলিকাতার ঠিকানা ১১নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। প্রিয়তম বন্ধু মুন্সী সাহেব মীর সাহেবের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে পান খেতে গলির মধ্যে ঢুকেছেন। কোনো একটি ঘরের দুয়ারে দুই অপেক্ষারতা ইংগবংগ দেহপশারিণীকে লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ রংগরসের অবতারণা করায় তারা বিশেষ রুষ্ট হয়ে কিছু কটু বাক্য ব্যবহার করে। 'তাহার পর ঘটনাক্রমে এরূপ হইল যে শ্যামবর্ণা—যাহার কালা আদমীর প্রতি বেশী ঘৃণা—বৎসরকাল মধ্যে তাহার গর্ভে আমার ঔরসে একটি পুত্র জন্মিল।'

৩.৩ মীর মশার্‌রফ হোসেন যখন সাহিত্য সেবা সুরু করেন তখন বঙ্কিমের এবং যখন শেষ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশিত হয়ে গেছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক মীরের বসন্তকুমারী নাটকের এবং দীনবন্ধুর নীলদর্পণ মীরের জমিদার দর্পণের তের বছর আগে লেখা। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল সবই বিষাদসিন্ধুর আটদশ বছর আগে প্রকাশিত। কমলাকান্তের সংগে গাজী মিয়াঁর পার্থক্য পঁচিশ বছরের। মীর মশার্‌রফ হোসেনের জীবিত কালেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নষ্টনীড়, উপন্যাস চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা, নাটক বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, কবিতা গীতাঞ্জলি পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্কিমের সংগে কোনো কোনো সূত্রে মীরের জীবন চেতনা ও শিল্পকলার যোগাযোগ আবিষ্কার সম্ভব হলেও রবীন্দ্রমানসের সংগে তাঁর সম্ভাব্য আত্মীয়তা

স্থাপনের প্রয়াস অবিহিত। রবীন্দ্রোত্তর যুগের নজরুল ইসলামের সংগে মীর-মানসের রেশতেদারী কল্পনা করা আরো অসংগত। মীরমানসের সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার ঐতিহ্য ও উৎস উপলব্ধি করতে হলে কালক্রম লংঘন করে বঙ্কিমেরও অনেক পেছনে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। এমন কি মাইকেল-দীনবন্ধু-টেকচাঁদ-বিদ্যাসাগরও নয়, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালই হলেন মীর মশাররফ হোসেনের নিকটতম পূর্বসূরী। ঈশ্বর গুপ্তের সংগে যোগসূত্রটি সরাসরি নয়, দূরসংস্থিত। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে লিখতেন কাঙাল হরিনাথ, কাঙ্গাল হরিনাথের গ্রামবার্তায় লিখতেন মীর মশাররফ হোসেন। কাঙ্গালের লেখার সংশোধন করতেন ঈশ্বরগুপ্ত, মীরের রচনা কাঙাল। জ্যেষ্ঠ গুপ্তের মৃত্যুর পর সংবাদ প্রভাকরের ক্ষীয়মান প্রতিপত্তির কালে যখন কনিষ্ঠ গুপ্ত সম্পাদক তখন তার সহসম্পাদক ভুবনচন্দ্র মজুমদার মীরের পরিণত রচনার রদবদল করার স্বাধীনতা গ্রহণ করতেন। বিবি কুলসুম লেখাপড়া শিখেছেন মীরের তত্তাবধানে। বিবি কুলসুমের প্রিয় কবি ছিলেন রঙ্গলাল। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল উভয়েই ছিলেন একালের কবি। নয়া জামানার কলিকাতা কালচারের স্পর্শ লাভ করলেও তাঁরা সে বস্তুকে সৃজনকর্মে পুনর্জন্ম দান করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে শোষণ করে নিতে পারেন নি। নবযুগের বহিপ্রাস্তীয় পরশ, ইংরেজীতে নিম্নমানের অধিকার পেছনের টানকে পরাভূত করতে পারে নি। মীরের সংকট আরো গভীরতর। তাঁর মানস প্রস্তুতির পটভূমিতে স্থূল ভূগোল হিসেবেও কলিকাতা নগরীর অবস্থান অস্বচ্ছ এবং অপ্রত্যক্ষ; বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের এই প্রতিকূল পরিমণ্ডলের বাসিন্দা হয়েও মীর মশাররফ হোসেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে।

অপর দিকে অস্তমান উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা কালচারের উদ্দণ্ড হিন্দুমূর্তি যে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে তারও দুটো রূপ ছিল। একটা একটু পণ্ডিতী ধরণের। অনেক অংশে নাগরিকতা মণ্ডিত ও যুক্তিমার্গীয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্বের পুনর্গঠনে এঁদের প্রয়াস মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। শিক্ষিত মুসলমানের চিন্তাজগৎকে প্রভাবান্বিত করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য এঁরা আরবী ফারসী সংস্কৃত ইংরেজী ভাল

করে আয়ত্ত করেছিলেন। মৌলবী মেয়ারাজ উদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশ্‌হাদী, শেখ আবদুর রহিম এই গোত্রভুক্ত। দ্বিতীয় ধারাটি তুলনায় বেশী ভাবপ্রবণ, সরল এবং গ্রামীণ। লেখায় এঁরা পুঁথি সাহিত্যের আদর্শকে অনুকরণীয় বলে মনে করেছেন, বলায় ওয়াজ বহেসীয় যুক্তিতর্কের তরীকাকে। জন জমিরুদ্দিন, মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্‌, নইমুদ্দিন এই পথের পথিক। বলা বাহুল্য যে কোনো চিন্তাধারার শ্রেণীকরণের মতো আমাদের এ ভাগাভাগিও কিছুটা কৃত্রিম, বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার্থে সত্যবস্তু থেকে নির্মিত। উভয় ধারার সংগেই মীরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মীর-মানসের ক্রম বিকাশের প্রথম অধ্যায় দীনবন্ধু-মাইকেল-বংকিমের সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী চেতনার গৌরববোধে সমুজ্জ্বল। শেখ আবদুর রহিমের হাফেজ (১৮৮৭) পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা দিয়েছেন। স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি-প্রকাশে অকুণ্ঠ হয়েও এঁরা তখন আজকালকার উপদ্রবী অর্থে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাছাড়া এই পর্বে এখনও মীর সাহেবের প্রধান উৎসাহ সাহিত্য-সৃজনে, সাধ্যমত মুসলমানী উপাদানের শিল্পগত রূপায়ণে। তৃতীয় পর্বে, মীরের বৃহত্তম সংখ্যক রচনা শিল্পানুপ্রেরণাহীন। ধর্ম বিষয়ক বাহ্য ও গৌণ ধারণা-দিতে অকীর্ণ মীর মানস এই পর্বে কেবল উপ-পুথিসাহিত্য সৃষ্টি করেই তুষ্ট ছিল।

৩.৪ মীর মানসের নানা অংগ ও ভংগী ভাল করে বোঝবার জন্যে সমগ্র মীর রচনাবলীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

ক। তাঁর প্রথম বিয়ে ১৮৬৫ সালে, দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন ১৮৭৩ সালে। অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত গ্রন্থ সমূহের নাম রত্নবতী, গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু, বসন্তকুমারী নাটক, জমীদার দর্পণ।

খ। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ সাল অপেক্ষাকৃত সৃষ্টিহীন পর্ব। সপত্নীবাদের বিষময় চক্রান্তে পড়ে মীর পরিবারে শান্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। এমনকি '১২৯০ সালে কুলসুম বিবি বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ভাত কাপড়ের কষ্ট। --- আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল।' । বিবি কুলসুম। ১৮৭৯তে প্রথম সন্তান লাভ, ১৮৮১তে দ্বিতীয়, ১৮৮৩তে তৃতীয়। এই সময়ে

প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে একমাত্র প্রমাণ ১৮৭৫, ২৫এ সেপ্টেম্বরের 'গ্রামবর্ত্তা-প্রকাশিকা'র একটি বিজ্ঞাপন, এর উপায় কি 'প্রহসন' সম্পর্কে।

গ। ১৮৮৪তে দেলদুয়ার আগমন। ১৮৯২তে নবম সন্তানের জন্মলাভ পর্যন্ত দেলদুয়ারে অবস্থান। দাম্পত্য জীবনের এই পরিতৃপ্ত সন্তানবহুল পর্বেই বিষাদসিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯২) ও উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) সৃষ্টি হয়। দেলদুয়ারে জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজার হিসেবে নানান জাতের লোকের নানা রকম নগ্ন ও কুৎসিৎ মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং অবশেষে ১৮৯২তে দেলদুয়ারকে 'জমদ্বার' জ্ঞানে ত্যাগ করেন।

ঘ। ১৮৯২ থেকে ১৯০২ এই দশ বৎসরের এক মাত্র রচনা গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯, ১ম খণ্ড)। এটি পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর মানসের এক প্রতিশোধাত্মক দপ্তর।

ঙ। ১৯০৩ থেকে ১৯১০। রচনার সংখ্যাধিক্যে উর্বরতম এই অন্তিম পর্বে মীর মানস, শিল্পবিচারে, অবসন্ন ও উদাসীন। মানব জীবনের রহস্য আর তাঁকে শিল্পানুপ্রেরণা যোগায় নি, ধর্মজীবনের গভীরতর উপলব্ধি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে নি। বেশীরভাগ রচনাই অলৌকিকতামণ্ডিত, কিংবদন্তিপূর্ণ, অসংস্কৃত পুঁথিসাহিত্যের ইসলামের পুনর্নির্মাণ। আংশিক ব্যতিক্রম ইসলামের জয়, আত্মজীবনীমূলক রচনা আমার জীবনী ও আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী।।

৩.৫ মীরের মানস বিবর্তনে একটি প্রধান বিদারণ-রেখা দেলদুয়ার ত্যাগের সমকালে কল্পনা করা যেতে পারে। এর আগের রচনা সমূহে মশাররফ হোসেন গভীর ও সরল জীবন চেতনায় যতটা আস্থাবান পরে তেমন নন। এই পর্বের জমিদার দর্পণে কেবল যে বোষদীপ্ত উচ্চকণ্ঠ গণদরদ ঘোষিত হয়েছে তা নয়, আবুমোল্লা ও নুরুন্নেহারের করুণ অনাবিল ঘরকন্নার চিত্রাংকনে গাঢ়তর জীবন বোধের আভাস আছে। প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় জর্জরিত মানুষ আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের যে মহামূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, বঙ্কিমের মত মীর মশাররফ হোসেনও প্রথম জীবনে তার রূপকার ছিলেন। প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ রেবতীতে (বসন্তকুমারী নাটক) তার উন্মেষ, রূপজ মোহে আত্মবিক্রিত

এজিদে (বিষাদ সিন্ধু) তার পূর্ণ পরিণতি। মানবী জায়েদার ট্র্যাজেডিও কম মর্মস্পর্শী নয়। মীরের ধর্মানুভূতিও এই পর্যায়ে উদার, শিল্পীজনোচিত। সামাজিক বিচারবুদ্ধিতে একে অসাম্প্রদায়িক এবং 'সমন্বয়ধর্মী'ও বলা যেতে পারে। গোজীবনে তিনি সরাসরি এই মনোভাব যুক্তিতর্ক যোগ করে পেশ করেছেন। সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রেমময় শিল্পীসত্তা বিষাদ সিন্ধুতে এই অভিযোগ উত্থাপন না করে পারে নি যে ঃ

> কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবি কল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে, কল্পনা কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ ভগবান! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কারতিমির সদ্‌জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রতিভার বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই, সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইতে মনের গতিরোধ তাহাতে জাতীয় কবিগণেরও বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের যে কল্পনাশক্তির যে বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করে না। এই সামন্য আভাসেই যথেষ্ট, আর বেশী দূর যাইব না। বিষাদ সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য পদে সম্বোধন করা হইয়াছে, মহাপাপের কার্য্যই করিয়াছি। আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে, ঈশ্বরই জানেন। কারণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে। । বিষাদ সিন্ধু, ৪র্থ পর্ব।

মীর মানসের সংকট সূচনা প্রকৃতপক্ষে উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) থেকে। নীলকুঠির লালমুখো সাহেবের সংগে নিজের পিতার আঁতাত অত্যাচারিত নীলচাষীর প্রতি লেখকের সমবেদনাকে দ্বিধাগ্রস্থ করেছে। গাড়োয়ান জকির কোনো রূপবতী সখের ময়নাকে রূপার লোভ দেখিয়ে নিজ ঘরে আনা ছাড়া কেনী সাহেবকে দিয়ে অন্য কোনো লোমহর্ষক পাপকর্ম করান নি। অন্ততঃ সামনাসামনি নয়। কেনী-পত্নী ত মীরের শ্রদ্ধা লাভ করেছে। সাগোলাম নিপীড়িত চাষীপ্রজার জন্য সংগ্রাম করেও গ্রন্থে বড় হতে পারে নি

কারণ মীরের এই ভগ্নিপতিটি পারিবারিক সম্পত্তি দখলের ব্যাপারে মীর-পিতার সংগে অসৎ ব্যবহার করেছিল। নিজের পিতামাতার জীবন আদর্শায়িতরূপে উপস্থাপিত করতে গিয়েও মীর সাহেব বিভিন্ন আপাতবিরোধী দৃশ্যের অবতারণা করে ফেলেছেন। এককালের জমিদার দর্পণের নাট্যকার আজ এই বইয়ে দীনবন্ধুকে মনের সুখে গালিগালাজ করেছেন। এসব সত্ত্বেও উদাসীন পথিকের মনের কথায় দুঃখীজনের জন্য যে দরদ প্রকাশ পেয়েছে, শোষিত হিন্দুমুসলিমের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ শিল্পীর যে সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, ঐতিহাসিক ঘটনাকে রসপুষ্ট করে তোলবার জন্যে জটিল মানবহৃদয়ের যে পশ্চাৎপট নির্মিত হয়েছে, সবেই প্রমাণ করে যে মীর মানস এখনও তার সৃষ্টিশীল শিল্পচেতনার মহত্তর প্রথম অধ্যায়ের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নি।

সংকট ঘনীভূত হয়েছে ১৮৯২ র পর গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯) রচনার আশপাশের সৃষ্টিহীন দশ বৎসরে। বস্তানীর জগৎ নারকীয়, ভালমন্দের ভেদজ্ঞান সেখানে লুপ্ত। মানবীয় হৃদয়ের অপার রহস্য মুগ্ধদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ্য করার পরিবর্তে লেখক কেবল মানুষ পশুর ঘৃণিত সামাজিক আচরণকে চীৎকার করে জাহির করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতেও মীরের সংস্থা বাষ্পীভূত ঃ

> ডিপুটী সাহেব বসিলেন, গায় গায় ঘেঁসাঘেসী করিয়া আদরে আহলাদে যেন কত পীরিতি, কত প্রণয় ভাব দেখাইয়া, গায়ে গায়ে মিশিয়া বসিলেন, বসাইলেন। কিন্তু মনে মনে তিন হাত ফাক্। বিদ্বেষের ভাবও খুব আছে। তবে বাহিরে নয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরে। হিন্দু, মুসলমানের জীবনের শত্রু। তবে যে ভাব, ভালবাসা মুখের মায়া, 'আমি তোমারই' সে কেবল আপন লাভ আর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য।
>
> । গাজি মিয়াঁর বস্তানী।

একাধিক তুলনীয় চরণ আছে বাজীমাতে (১৯০৮) যেমন ঃ

> বিশ্বাস ঘাতক হিন্দু দুষ্ট প্রবঞ্চক,
> যেই পাত খায় কোঁড়ে এমনি পাতক।

অথবা,

> তারা যে হিন্দুর পুত্র সংসারেতে পোকা। ইত্যাদি।

মীর মানসের এই পরিবর্তনের অব্যবহিত কারণ তাঁর ব্যক্তিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে নির্ণয় করা সম্ভব হলেও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনশীল ধারাও হয়ত এর জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী। পাশ্চাত্য শিক্ষা নগরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুকে কার্যত জাতিবৈর ভাব থেকে মুক্তিদান করে নি। সাহেবের লেখা ইতিহাসে মুসলমান শাসক মাত্রেই কামুক ও পীড়ক রূপে অংকিত। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইতে পাদ্রীর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ও রসুলুল্লাহ্ সম্পর্কে গর্হিত কথা অনেক দিন থেকে চালু ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শিক্ষা ও সাহিত্যের বিষাক্ত পরিণতি ফলতে শুরু করেছে। সেকালের মুক্ত-বুদ্ধির অগ্রনায়ক ব্রাহ্মধর্মের নেতারা পর্যন্ত ক্রমে অলক্ষ্যে হিন্দুয়ানীর প্রচারকে পরিণত হলেন। জাতীয় সভার কাজ হয়ে দাঁড়াল হিন্দু মেলার তদারক করা। যুগপুরুষ রাজনারায়ণ বসু ঘোষণা করলেন: 'মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সংগে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু-সমাজই আমাদিগের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হয়—যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ একহৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্মসংগত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব।'

১৮৮৭ তে রাজনারায়ণ বসু 'মহা হিন্দু সমিতি নামক একটি মহা সমিতি স্থাপনের আশা নিয়ে' বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রকাশ করলেন। বিরাশি থেকে সাতাশির মধ্যে বঙ্কিম লিখলেন রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম ইত্যাদি। বৃহত্তর মুসলিম পাঠকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে মীরকেও স্পর্শ করেছিল এমন অনুমান করা অসংগত নয়।

সমাজের কল্যাণ সাধনে নিরুৎসাহ, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রচারে বিমুখতা, মানুষের মহত্ত্বে অনাস্থা, ইহলোকের সৌন্দর্যে অশ্রদ্ধা, সবই ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ এর মধ্যে মীর মানসে তিল তিল করে দানা বেঁধেছে। মীরের শিল্পানুভূতিও

ক্রমশঃ পলায়মান। শেষ আট দশ বছরে সংখ্যায় অনেক বই লিখেছেন বটে, কিন্তু পূর্বতন মীরের সত্যদৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টি দুই-ই এখানে অনুপস্থিত। বইয়ের নাম প্রমাণ করে যে এগুলোর বিষয়বস্তু সরাসরি ইসলামিক ও ধর্মবিষয়ক। যেমন, মৌলুদ শরীফ, হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, মোস্লেম বীরত্ব, খোতবা ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে 'ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য তাঁর শিল্পী মনকে যে ভাবে নাড়া দিয়েছে তারই বহির্বিকাশ' এই বইগুলোর মধ্যে আমরা দেখি এমন বলা চলে না। সেই জন্যে নজরুলের সংগে মীরের তুলনাও অচল। মীরের এই জাতীয় রচনার যা প্রকাশিত হয়েছে তা হৃতপ্রতিভা বৃদ্ধ মীরের সামাজিক সত্তার আচার-আচ্ছন্ন, সংস্কার-বশ ধর্মকর্মের কথা, প্রকৃত বিশ্বাসে গৃহীত, পুঁথি-পরিবেশিত ধর্মবিষয়ক বাসনা ধারণাদির উপকথা মাত্র। স্থূলতারও অকুলান নেই। মেরাজ বর্ণনায় কবি লিখেছেন যে বেহেস্তে ঃ

অপূর্ব যুবতী নারী
দাঁড়াইবে সারি সারি
মণিময় রত্ন আভরণে।
সাজিয়ে অপূর্ব সাজে,
বীণা বীণ হাতে বাজে,
আর বাজে ঘুঙুর চরণে॥

দাসী তুল্য সেবিবারে
সকলেই ইচ্ছা করে
যাতে সুখ হইবে যাহার।
মনের আনন্দে সেই
সুখী হবে বিধি এই,
হুর সনে করি ব্যবহার॥

অথবা নরকে,

সুখেতে হারাম করি
হেসে হেসে গর্ভ ধরি,
প্রসবিল যে নারী সন্তান।

সে পাপের পরিণাম,
অগ্নি শিশু অবিরাম
প্রসবে প্রবেশে যথা স্থান ॥

এসব দেখে-শুনে রসুলুল্লাহ্ জেব্রাইল ভাইকে ডেকে বললেন যে তাঁর উম্মতরা কখনও এত এরকম আজাব সইতে পারবে না। পাগড়ী খুলে তিনি সেজদায় স্থির হলেন। তখন দৈববাণী হোলো ঃ

ওহে প্রিয় মোহাম্মদ (দঃ) তোমার আব্দার।
রক্ষা হবে তুমি আজ অতিথি আমার ॥

বিবি খোদেজার বিবাহ থেকেও অনুরূপ অগ্রহণীয় পাদবদ্ধ চরণাদি কাতারে কাতারে উদ্ধৃত করা সম্ভব।

একটা কথা এইখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। বিষাদ-সিন্ধুর সৃষ্টিকর্তা মশাররফ হোসেন কি এই শ্রেণীর কাব্যের দৃষ্টিভংগী ও আবেদনের স্বরূপ সম্পর্কে সত্যি হতচেতন ছিলেন? হয়তো নয়। বৃদ্ধ বয়সে প্রতিভার সাধারণ ক্ষয়, পরিবেশের হীনতায় শিল্পচেতনার বিকার, অবস্থা বিশেষে সহজ রোজগারের প্রতি মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা, সব স্বীকার করে নেবার পরও মীর-মানসের এই বিবর্তনের একটা শৈল্পিক আদর্শগত কারণ লোচন করা সম্ভব। জীবনের উপান্তে এসে মশাররফ হোসেন বৃহত্তর মুসলিম পাঠকের নৈকট্য কামনা করেছেন, পনের আনা নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর মুসলিম জনতার সংগে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। উদ্দেশ্য ঃ তাদের জ্ঞান ও রুচির উন্নতি বিধান। উপায় ঃ সে মানস যা ভোগ করে অভ্যস্ত সেই পুথিসাহিত্যের রূপ রস ভাষাকে কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করে পুনঃপ্রচার করা। বিবি খোদেজার বিবাহের ভূমিকা মীরের এই সচেতন পরিকল্পনার একটি প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। আমরা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি ঃ

> বর্তমান সময়ে বঙ্গবাসী মুসলমান সমাজে তিন শ্রেণীর পাঠক বর্তমান। এক শ্রেণীর পাঠক মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত পুস্তক পাঠ করেন। মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত পুস্তক ... সংখ্যা করা কঠিন। লিখকগণ সকলেই মুসলমান। পূর্বে আমীর-

হামজা, বাহারদানেস, জৈগুন, সোনাভান, আবুশ্যামা, ইউসুফজেলেখা, লাইলীমজনু, গোলেবকাওলী, চাহারদরবেশ, জঙ্গনামা প্রভৃতি স্বনামখ্যাত পুস্তক সকল বটতলা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্তমান সময়ে কত পুস্তক ... গণনা করা কঠিন। এক একখানি পুস্তকের নামের পরিচয়েই বিষয়ের ও লিখকের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—আলমশ্যামী, মাণিকপীর, কাজিহয়রাণ। কালীর বউ ঘর ভাঙ্গানী, শ্যমন-বিমান, সুরতজামাল, লালমন, বীর হনুমানের লড়াই ইত্যাদি। এই সকল পুস্তকের কাট্‌তিও অধিক। পাঠক সংখ্যাও অত্যধিক। ২য় শ্রেণীর পাঠকগণ মুসলমানি বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী, পুঁথি পড়ার আবশ্যক হইলে, ধর্মগ্রন্থাদি যাহা মুসলমানি বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গানুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে তাহার প্রতিই অধিক টান। তবে নূতন নাম ... পুস্তক প্রকাশিত হইলে —। এই শ্রেণীর মহোদয়গণ এসলামি ভাষায় লিখিত—কি সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রিকা যাহাতে মাত্র খবর থাকে তাহা পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ করেন না। এই দুই শ্রেণীর পাঠকগণের বিশ্বাস যে পদ্যে লিখিত না হইলে—কেতাব কি প্রকারে হয়?

পদ্যপদ সংযোজিত না করিতে পারিলে সে আবার লিখক কিসের; একথার প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার মুসলমানি বাংলা পুস্তক বটতলার বাজার হাট পুরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে একখানি পুস্তকও পদ্যপদ ভিন্ন নহে। সমুদায় পয়ার ত্রিপদী চৌপদীতে লিখিত। অনেক পুস্তকে আবার রাগ রাগিণী তালের পরিচয়ে গানও আছে। এই প্রকার নিত্য নূতন প্রকাশ হইতেছে। কত হিন্দু মহাশয় ছাপাখানা করিয়া মুসলমানি বাংলা পুস্তক ছাপাইতেছেন। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যাই অধিক। বেশ দশ টাকা লাভের জন্য কত পাইন, দে, দত্ত, শীল, বসাক মহাশয় মল্লিকা আকার, কেরামত নামা, গো কোরবানীর ফজিলাত, হাজরাত ইসমাইলের বিবরণ—বিক্রয় করিতেছেন। লজ্জাতন্‌নেসার লজ্জতে মরিতেছে। ইহাতেই স্পষ্টই প্রমাণ মুসলমান সমাজে পদ্যের বড়ই আদর। ...

এখন তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক সম্বন্ধে কথা—কথা কিছুই নাই। তবে শাখা আছে পত্র আছে—মূল কাণ্ড সংখ্যায় অতি অল্প। ইহাদের রুচি পরিমার্জিত, সাধুভাষার দিকেই অধিক টান। এই শ্রেণীর মধ্যেই ভাল লিখক বর্তমান। সহজেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে সিদ্ধহস্ত। যথা—রেয়াজদ্দীন, আবদুর রহিম, মোজাম্মাল হাক, আবদুল হামিদ, পণ্ডিত রেয়াজদ্দীন এবং নওসের আলী প্রভৃতি প্রিয় ভ্রাতাগণ ইহারা আরজ্জনা ছাড়াইয়া মুসলমান সমাজে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা প্রচলনে বিশেষ

যত্নবান। কিন্তু সমাজের চৌদ্দআনা লোককে ফেলিয়া দুই আনা লোক লইয়া সাহিত্য সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন করুন। কিন্তু দুই চারজন লিখক চৌদ্দআনা দলের সহিত মিশিয়া মিশিয়া ক্রমশ দুই এক পদ করিয়া অগ্রসর হইলে কি ভাল হয় না?

'বিবি খোদেজার বিবাহ'

এরূপ সরল ভাষায় পত্ত লিখিবার উদ্দেশ্যই এই বিজ্ঞাপনাভাস। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকগণের চক্ষে পড়িলেও পড়িতে পারে, কিন্তু শাখাপত্র শ্রেণীর চক্ষে পড়িবার কথাও নহে। আশাও করি না। এক প্রকার সে আশা দুরাশা। কারণ মৌলুদ শরীফ জাতীয় বিবরণ জাতীয় ধর্মকথা, বাজে গল্প নহে, আখ্যায়িকা, উপন্যাস নহে। ধর্মসংস্রবী, আদব তামিজ সংস্রবী, শব্দ সমূহ বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশক প্রতিশব্দ না থাকিলেও কিছু না কিছু না আছে তাহা নহে, সেইটুকু বাদ দিয়া মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করায় কোন কোন নব্য লিখক প্রিয় ভ্রাতা, ডাল খিচুড়ির সংগে দৃষ্টান্ত দিয়াছন। ··· সুতরাং নব্য দলে — আদরণীয় হইবে না—লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। তার মূল উদ্দেশ্য আশা কথঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।

৩.৬ কালানুক্রমিক শ্রেণীকরণ অতিক্রম করে কেবল বিষয়বস্তু, আংগিক ও আবেদনের বৈশিষ্ট বিচার করেও মীর রচনাবলীকে নানা গুচ্ছে ভাগ করা যেতে পারে।

বসন্তকুমারী নাটকে মীরমানসের জীবনরস রহস্য ভেদের যে প্রয়াস উন্মোচিত হোলো তা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে ইসলামী ইতিহাস আশ্রিত রোমান্সমূলক উপাখ্যান বিষাদ সিন্ধুতে।

সামাজিক শ্রেণীসংঘাতের যে সমালোচনার সূত্রপাত জমিদার দর্পণ নাটকে, তার বর্ণনামূলক বিস্তার উদাসীন পথিকের মনের কথায়, তার বিকার গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে।

আত্মজীবনী মূলক রচনায় মীরের উৎসাহ প্রথম প্রকাশ পায় উদাসীন পথিকের মনের কথায়। এই বিশেষ সাহিত্যিক রূপের আস্বাদন মীর মানসের সংকটকালেও

তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে। এমনকি মীর প্রতিভা শেষ পর্যায়ে যখন এক রকম নিঃশেষিত তখনও কেবলমাত্র এই শ্রেণীর দুটি রচনায়, আমার জীবন ও বিবি কুলসুমে, মীরের সৃষ্টিধর্মী ক্রিড়াশীলতা অক্ষুণ্ণ। মশাররফ হোসেনের শৈশব কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় জীবনের যে চিত্তাকর্ষক আত্মবর্ণনা এগুলোর মধ্যে বিধৃত, সমাজবিজ্ঞানীর কাছেও তার মূল্য অপরিসীম। সম্ভবতঃ বিষাদ সিন্ধুর পর মীর মানসের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে এই শ্রেণীর রচনায়।

মৌলুদ শরীফ থেকে আরম্ভ করে খোত্‌বা পর্যন্ত মীরের রচনাবলী স্বতন্ত্র মানদণ্ডে বিচার্য।

মেহেরুল্লাহ্ ও জামিরুদ্দীন

আনিসুজ্জামান

খৃষ্টান পাদরীদের কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণ অনেক।

ষোড়শ শতাব্দীতেই পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এই পাদরীরা সপ্তদশ শতাব্দীতে রীতিমতো কয়েকটি ধর্মপ্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, ঢাকা যার মধ্যে ছিল অন্যতম।[১] এঁদেরকে অনুসরণ করে সমগ্র বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন ইংরেজ পাদরীরা ঃ ড্যানিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে প্রোটেস্টাণ্ট মিশন-প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে খৃষ্টান প্রচারকেরা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেন এবং এভাবে এঁদের হাতে বাংলা গদ্যের কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভূষণার ধর্মান্তরিত রাজকুমার দোম আন্তনিওর লেখা 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এর মধ্যে সর্বপ্রাচীন রচনা। পর্তুগীজ পাদরী মানোএল দা আস্সুম্প্‌সাও-প্রণীত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' (রচনা ১৭৩৪, প্রকাশ লিসবন, ১৭৪৩) বাংলার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। একই বছরে তাঁর রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ লিসবনে প্রকাশিত হয়।[২]

প্রথম যুগের পাদরী লেখকদের মধ্যে সোনারগাঁও শ্রীপুরের জেসুইট পাদরী ফের্নান্দেস্ (ষোড়শ শতাব্দী), সোসা (ঐ), সান্তুচ্চি, গোমেশ, সরয়বা (সপ্তদশ শতাব্দী), বেরবিয়ের (অষ্টাদশ শতাব্দী) প্রভৃতির বাংলা

১। Sushil Kumar De, *A History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* (Calcutta : University of Calcutta, 1919), Ch. II দ্রষ্টব্য।

২। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স ; কলিকাতা ঃ মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৩৫৬), পৃ ১০-১৪ দ্রষ্টব্য।

রচনার নিদর্শন না পেলেও, তার খবরাখবর পাওয়া গেছে।[১] রেভারেণ্ড বেণ্টোর লেখা 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নমালা' বলে দুটি বইয়ের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়।[২]

শ্রীরামপুর মিশনের পাদরীদের মধ্যে উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে বাইবেলের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (১৮৯১) মিশন থেকে প্রচারিত হয়েছিল। বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে কেরীর ভূমিকা স্ফুটতর হবার সুযোগ পেল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠায়। পরবর্তী বৎসরে এই কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্বোধন হলে কেরী এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর অধীনে দুজন পণ্ডিত ও ছজন সহকারী নিযুক্ত হলেন—যদিও প্রথম বৎসরে বাংলা বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ছয়।[৩] ইংরেজীতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা (১৮০১) এবং বাংলা-ইংরেজী অভিধান সংকলন (১৮১৮-২৫) করা ছাড়াও কেরী হয়তো কিছু কিছু বাংলা লিখেছিলেন — কিংবা হয়তো লেখেন নি। তবে বাংলা গদ্যের এই উদ্যোগ পর্বে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী মার্শম্যান, ওয়ার্ড, এলার্টন প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের কাজ করেছিলেন।[৪] প্রত্যক্ষতঃ তাঁদের প্রেরণাতেই রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ লেখক বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন।

২

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে খৃষ্টান পাদরীরা তাই স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের গদ্যরচনার জন্যে। আমাদের কাছে এঁরা কেবল লেখকরূপেই পরিচিত — ধর্মপ্রচার যে এঁদের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল, একথা আমরা বিস্মৃত

১। গোপাল হালদার, বাঙ্গলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২ঃ (কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৫) ৭১।

২। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় (সম্পাদিত), সাহিত্য পঞ্জিকা (কলিকাতা, ১৩২২), পৃ ১৬৪।

৩। Brajendranath Banerji, *Dawn of New India* (Calcutta: M. C. Sarker & Sons., 1927), p 105.

৪। De, *Op. cit.* Ch. IV দ্রষ্টব্য।

হতে পেরেছি। আর তাই একথাও ভুলে যাওয়া সহজ হয়েছে যে, এদেশের ভাষাকে এঁরা যত সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম ও বিশ্বাসকে এঁরা ঠিক ততখানি ঘৃণা করতেন।

অনেকখানি এই মনোভাবের জন্যেই এদেশে ধর্মপ্রচারকার্যে খৃষ্টান পাদরীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী সাহায্যলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের প্রতি সরাসরি বিরূপতা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। প্রথম যুগে কোম্পানীর এলাকায় কোন মিশনারীকে বসতি স্থাপন করতে দেওয়া হত না। তাই ১৭৯৩-তে কেরী যখন কলকাতায় আসেন, মিশনারী বলে সেখানে তিনি নামতে পারেন নি। তাঁকে বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল সুদূর মালদহে — তাও আবার ড্যানিশ পতাকার আশ্রয়ে। এমন কি, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার পরও পাদরীদের প্রতি কোম্পানীর মনোভাব সুপ্রসন্ন হয় নি। এর কারণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ফার্কুহারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

> In order to understand their attitude, we must realize that their [the Company's] only object was trade, and that it was purely for safeguarding of their trade that they had interfered with the politics of the land. In consequence, they regarded themselves as in every sense the successors of the old rulers and heirs to their policy and method, except in so far as it was necessary to alter things for the sake of trade. .. the Government believed it to be necessary, for the stability of their position, not merely to recognize the religions of the people of India, but to support and patronize them as fully as the native rulers had done, and to protect their soldiers from any attempt to make them Christians.[১]

কোম্পানীর এলাকায় মিশনারীদের বসতিস্থাপন সম্পর্কিত নিষেধ তুলে দেওয়া হয় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে।[২] এর ফলে, খৃষ্টান পাদরীরা এদেশবাসীর ধর্ম-

১। J. N. Farquhar, *Modern Religious Movements in India* (London : Macmillan & Co. Ltd., 1924) pp 8-9.

২। *ibid.*, pp 10-11.

বিশ্বাসকে আঘাত করবার ক্ষমতাটা বেশ ব্যাপকভাবে লাভ করলেন। তাঁদের এ ধরণের প্রচারণা যে একজন বিদেশী খৃষ্টানকেও কতখানি ব্যথিত করে তুলেছিল, তার পরিচয় আছে কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাছে লেখা লর্ড মিণ্টোর একটি পত্রে :

> Pray, read especially the miserable stuff addressed to the Gentoos in which, without one word to convince or to satisfy the mind of the heathen reader,without proof or argument of any kind, the pages are filled with hell fire and hell fire and still hotter fire, denounced against a whole race of men for believing in the religion which they were taught by their fathers and mothers and the truth of which it is simply impossible it should ever have entered into their minds to doubt. Is this doctrine of our farth ?[১]

৩

এ দেশবাসীর অনেক কুসংস্কার ভেঙে দেবার জন্যে বাইরের আঘাতের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা এই ভয়ংকর মূর্তিতে না এলেও পারত। প্রকৃতপক্ষে, এদেশের সামাজিক অগ্রগতি মিশনারীদের বিরূপ প্রচারে ত্বরান্বিত হয় নি, সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ভাবাদর্শের প্রভাবে। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

এই সহানুভূতিহীন আক্রমণকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে কিন্তু এ দেশবাসীর পক্ষে কুসংস্কারগুলোকে নিজের পরমপ্রিয় ঐতিহ্য বলে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করা স্বাভাবিক ছিল। অন্যপক্ষে, এই ধরণের আক্রমণকে নীরবে মেনে নেবার মধ্যেও একটা হীনমন্যতার পরিচয় আছে। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার আবশ্যকতা সেদিন ছিল। সেক্ষেত্রে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। পাদরীদের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করে তিনি বলেন :

১। Edward Thompson and G. T. Garratt, *Rise and Fufilment of British Rule in India* (London : Macmillan & Co. Ltd., 1935), p 247 এ উদ্ধৃত।

> To introduce a religion by means of abuse and insult, or by affording the hope of worldly gain, is inconsistent with reason and justice. If by the force of argument they can prove the truth of their own religion and the falsity of that of Hindus, many would of course embrace their doctrines, and in case they fail to prove this, they should not undergo such useless trouble, nor tease Hindus any longer by their attempt at conversion. [১]

রামমোহন তাঁর প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনে হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলমানী আদর্শকে অনেকখানি জায়গা দিতে পেরেছিলেন। কেশবচন্দ্র অবশ্য খৃষ্টান প্রভাবকে অনেক বেশী করে আত্মস্থ করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যীশুখৃষ্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি, যেমন 'ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়' —এ উক্তি করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মেরা এতখানি স্বীকার করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, খৃষ্টানদের আক্রমণাত্মক প্রচারণায় ব্যথিত ও রুষ্ট হয়ে এর প্রতিবাদকল্পে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গেও তাঁরা আপোষ করেছিলেন।[২] তবে পাদরীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশেষ করে সনাতন হিন্দু সমাজের মুখপাত্রেরাই, প্রথম যুগে যাঁরা 'ধর্মসভা' স্থাপন করে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পাদরী হেস্টি ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তর্কযুদ্ধ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা,' কলকাতার 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' এবং প্রথমটির প্রেরণায় 'ন্যাশনাল' নবগোপালের 'হিন্দু মেলা' এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক আয়োজন।

৪

খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ সবটুকুই যে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, তা নয়। ইসলামের বিরুদ্ধেও তাঁরা বেশ সচেতন আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন— বক্তৃতা এবং বইপত্র রচনার মাধ্যমে। মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কতকগুলো বইপত্র তাঁরা বিশেষ করে রচনা করেছিলেন, লঙ

১। Rammohan Ray, *Works* (Allahabad: The Panini Office, 1910), p146.

২। কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), অধ্যায় ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।

সাহেবের পুস্তক তালিকায় তার অনেকগুলোর নাম আছে। যেমন, Prophet's Testimony of Christ (১৮২৯), Muhammedan Ceremonies এবং Reasons for not being a Mussalman বা মুসলমান ধর্ম্মের অপ্রমাণ্য কথন (১৮৩৭)। আরবী ফারসী শব্দবহুল বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যসমূহ মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় হওয়ায় সেই ভাষায়ও তাঁরা কেন কোন বই লিখেছিলেন।[১] সাধু ভাষায় তাঁদের রচনার নমুনা, জে. লঙ প্রণীত 'মহম্মদের জীবনচরিত্র' (১৮৫৫)।[২] এর থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করলেই অনুভব করা যায় এঁদের আক্রমণের তীব্রতা ঃ

> মক্কানগরে ২০,০০০ বিংশতি সহস্র লোক বাস করে। হিন্দুদিগের পক্ষে যেরূপ কাশী, মুসলমান লোকদিগের সেরূপ মক্কা; অনেক ভিক্ষুক সেখানে বাস করিয়া অনায়াসে কালক্ষেপ করে, এ কারণ মক্কাকে ভিক্ষুকদিগের স্বর্গ বলে। [পৃ ১১]
>
> মহম্মদ সের্জিয়স এবং ঊদাসীন নেষ্টোরিয়ানদের হইতে খ্রীষ্ট ধর্মসম্বন্ধীয় যে বিদ্যা পাইয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে কোরান রচনায় তাঁহার উপকারজনক হইল। [পৃ ৩৬]
>
> বিশেষতঃ সে [খাদিজা] ভোজের সময় আপন পিতাকে মদ্য দ্বারা মত্ত করিলে তিনি নিজ কন্যা খাদাইজাকে মহম্মদের সহিত বিবাহ দিলেন। [পৃ ৩৮]
>
> [ক্রীতদাস-দাসীরা] তাঁহাকে [মুহম্মদকে] মৃগীরোগে পীড়িত দেখিয়া ঈশ্বরাবির্ভূত জ্ঞান করিত। [পৃ ৪২]
>
> দেখ, যীশুখ্রীষ্ট পাপিদের হইতে পৃথক ও নির্দোষ এবং পবিত্র; মহম্মদ কামুক ও সাংসারিক সুখে আসক্ত ছিলেন। [পৃ ৫৫]

কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মধ্যে তখন এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এর প্রতিবাদ করতে পারেন।

১। J. Long, *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (Calcutta : Sanders, Cones & Co., 1855).

২। কলিকাতা : সত্যার্ণব প্রেস (ক্রিষ্টান ট্রাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি), ১৮৫৪। আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নেই। লঙের ক্যাটালগে গ্রন্থকারের নাম আছে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপিতে হাতের লেখায় "To the Asiatic Society from the author" কথাগুলির পর স্বাক্ষর আছে "J. Long."

তার অর্থ এই নয় যে, একালে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মজীবন নিয়ে কোনরকম চিন্তা-ভাবনা হয়নি বা আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। ইংরেজ আমলের প্রথম একশ' বছরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যেসব ধর্মান্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে আদি ইসলামের আদর্শসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাহ্যিকপ্রভাব-জনিত সর্বপ্রকার বিকার থেকে ইসলামকে মুক্তিদান। এই সংস্কার-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অভিব্যক্ত হয় দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র (১৭০৩-৬২) রচনায় এবং তাঁর পুত্রদের প্রচারিত আদর্শে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১) যে সংস্কারান্দোলন উপস্থিত করেন, তা ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত (যদিও এই নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে)। এই আন্দোলন-কারীরা প্রথমে শিখদের সঙ্গে এবং পরে— পাঞ্জাব ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হলে— ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই ইংরেজবিরোধী মনোভাব বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে সৈয়দের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য এনায়েত আলীর নেতৃত্বে। বাংলা দেশে এই আন্দোলন বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ওয়াহাবীদের ইংরেজবিরোধী দলটি বাঙালী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল।[১] অনেকটা একই ধরণের ধর্মীয় সংস্কারান্দোলন স্বতন্ত্রভাবে বাংলা দেশেও গড়ে ওঠে তিতুমীর (মৃত্যু ১৮৩১) ও হাজী শরিয়তউল্লাহ্র (১৭৮০-১৮৪০) নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হবার ফলে এই দুটি আন্দোলনও দমিত হয়। এঁরা সকলেই ধর্মকে তার আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, একথা মনে রাখা দরকার।

সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে এবং পরবর্তী সময়েও ওয়াহাবীদের ভূমিকা সক্রিয় ছিল। তবে এই অভ্যুত্থানের পরই সৈয়দ আহ্মদ খাঁ (১৮১৭-৯৮) ('স্যার' তখনও হন নি) সর্বভারতীয় মুসলমানের নেতারূপে দেখা দেন এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মিতালীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলমান সমাজকে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতিসাধনের আহ্বান জানান। খৃষ্টান পাদরীদের বিকৃত প্রচারণা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম হেতু, একথা তিনি স্বীকার করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান

১। E. Rehatsak, "The History of the Wahhabys in Arabia and in India", *JBRAS*, XIV, 355.

ইংরেজ ও মুসলমান ভারতীয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যেও অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদার মনোভাবের জন্যে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের কাছ থেকে যথেষ্ট লাঞ্ছনাও তিনি পেয়েছেন।[১] কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠনে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁর — এবং সেই সঙ্গে স্যার সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) — অবদান অবিস্মরণীয়। নবযুগের এই সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম ছিল উর্দু ও ইংরেজী ভাষা। অতএব, বাঙালী মুসলমানের কাছে তা খুব ব্যাপকভাবে পৌঁছতে পারে নি। হিন্দুধর্মের সাহচর্যে এবং সুফী প্রভাবের ফলে বাংলায় প্রচলিত ইসলামধর্মে নানা বিকৃতি প্রবেশলাভ করেছিল।[২] ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাব এই বিকৃতিটুকুকে অনেকখানি চিনিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে সবটুকু কাজ হয় নি। খৃষ্টধর্মের প্রচারকদের আক্রমণ আবার নতুন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ — যেমন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১৮) — ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং কোরআন হাদিসের অনুবাদ করে ইসলামকে জানতে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। তবে ইসলামের ধর্মমতের সঙ্গে সুফী অধ্যাত্মতত্ত্বের পার্থক্য তাঁরা লক্ষ্য করেন নি। তাই কোরআন-হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র অনুবাদ করেছিলেন 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'।

পলাশী-যুদ্ধের পরবর্তী একশ' বৎসরে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে নানাকারণে বাঙালী মুসলমানের যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁর নেতৃত্বে এবং বাংলা দেশে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৮) ও সৈয়দ আমীর হোসেন প্রভৃতির চেষ্টায় এই যোগাযোগ স্থাপিত হল নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও মুসলমান লেখকদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে

১। G. F. I. Graham, *The Life and Work of Sir Syed Ahmed Khan* (2nd edn ; London : Hodder & Stroughton, 1909) দ্রষ্টব্য।

২। এই বিকৃতির পরিচয় পেতে হলে Murray T. Titus, *Indian Islam* (London : Oxford University Press, 1930) এবং মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব (কলিকাতা : মোহসীন এণ্ড কোং, ১৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

এই সময়েই। একালের মুসলমান লেখকেরা সকলেই ধর্মবিষয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন। এ সত্ত্বেও এঁদেরকে দুটি ভাগে ফেলে দেখা যেতে পারে। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) ও কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) — এঁরা প্রধানতঃ সৃষ্টিধর্মী লেখক। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্মনীতি ও জীবনসাধন প্রণালী ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) ও মেয়ারাজউদ্দীন আহমদের নাম স্মরণীয়। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দু খণ্ড 'এসলাম তত্ত্ব' (১৮৮৫-৮৬) এবং আবদুর রহিমের সুবৃহৎ 'হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭) এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এবং মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদের নাম এই সঙ্গে এসে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখক-চতুষ্টয়ের সঙ্গে এঁদের উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবে পার্থক্য এই যে, ওঁরা প্রধানতঃ লেখক আর মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরউদ্দীন প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারক। তাঁদের বিশেষ গৌরব এই যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে তাঁরা এদেশের মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে যেয়ে কিছু গ্রন্থাদি তাঁরা রচনা করেছিলেন, তাই সেযুগের লেখকদের সঙ্গে তাঁদের নামটিও সহজে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

দুই

দেখা যাচ্ছে, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র তিনটি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি তাঁর প্রধানতম সহকর্মী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের লেখা 'মেহের-চরিত' (কলিকাতা, ১৩১৫)। প্রায় একই সময়ে বের হয় মোহাম্মদ আসিরউদ্দীন প্রধান-রচিত 'মেহেরুল্লা-জীবনী' (জলপাইগুড়ি, ১৯০৯)। তৃতীয়টি অনেক পরবর্তী রচনা ঃ শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা' (কলিকাতা, ১৯৩৪)।

মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী-বর্ণনায় আমি বিশেষভাবে অবলম্বন করেছি 'মেহের-চরিত' আর 'কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা' ঃ শেষোক্ত বইটির অনেকখানি বিষয়বস্তু

অবশ্য প্রথমোক্ত বইটির থেকে নেওয়া। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'মেহেরুল্লা-জীবনী'র কিছু অংশ নকল করে এনেছেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ঃ তাঁর সৌজন্যে আমি সেটাও ব্যবহার করতে পেরেছি।

২

যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ তারিখে (১৮৬১ খৃঃ) মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি তাঁর পিতা মুন্‌শী ওয়ারেসউদ্দীনকে হারান। পিতৃহারা বালকের লেখাপড়ার সুযোগ বিশেষ হয় নি ; 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়ার প্রথম পর্ব তিনি সাঙ্গ করেছিলেন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে হঠাৎ গৃহত্যাগ করেন তিনি। তারপর কয়ালখালি ও করচিয়া গ্রামে দুজন সহৃদয় ব্যক্তির আশ্রয়ে বছর ছয়েক থেকে আরবী ও ফারসী ভাষাশিক্ষার সুযোগ পান। ১৮৮১র দিকে তিনি খোজারহাট গ্রামে আসেন এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার ভিত্তিটা এখানেই পাকা করে নেন। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তিনি যা শেখেন, তা হচ্ছে সেলাইয়ের কাজ।

শিক্ষানবিশী পর্বের শেষে যশোর শহরেই তিনি একটা দর্জির দোকান খুলে বসেন। অনতিবিলম্বে 'সাহেব বাড়ী'র দর্জি হিসেবেও নিযুক্ত হন। সাহেবদের আনুকূল্যে যশোর জেলাবোর্ডে একটি কর্মও তিনি লাভ করেছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পর সেই পদ ত্যাগ করে সেলাইয়ের কাজেই পুনরায় প্রবেশ করেন। তাঁর দোকানের সামনেই মিশনারীরা ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে বক্তৃতা করতেন। নির্বিকারচিত্তে এইসব বক্তৃতা শ্রবণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ঃ এঁদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর মন আকুল হয়ে ওঠে। পাদ্রী ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দবাবুর প্রচার শুনে তাঁর মনেও ইসলাম সম্পর্কে অনাস্থা ও খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস জন্মায়, এমন কি, তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলেও স্থির করে ফেলেন।[১] এমনি সময়ে হাফেজ নিয়ামতউল্লাহ্-রচিত 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' এবং পাদ্রী ঈশানচন্দ্র মণ্ডল (যিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুন্‌শী

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত (কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৫), পৃ ৮। লেখকের কাছে ১৮. ১. ১৩০৪ তারিখে লেখা পত্রে মেহেরুল্লাহ্ এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দ্র ঐ, পৃ ৪২-৪৩।

মোহাম্মদ এহ্ছানউল্লা নামে পরিচিত হন) প্রণীত 'ইঞ্জিলে হজরত মোহম্মদের খবর আছে' পাঠ করে তিনি স্বধর্মে নিষ্ঠ থাকার যথেষ্ট প্রেরণা পান। মহীশূর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মনসুরে মোহাম্মদী' পত্রিকা এবং খৃষ্টধর্মের আক্রমণ পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি উর্দু পুস্তক পাঠ করার ফলেও তিনি বেশ শক্তি লাভ করেন। এবারে মেহেরুল্লাহ্ খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি প্রথমে পাদ্রীদের বক্তৃতাসভায় কিছু কিছু বাদ প্রতিবাদ করতেন; তারপর হাটে হাটে মিশনারীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। প্রচারক জীবনের এই প্রথম পর্যায়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ কাসেম ও মুনশী গোলাম রব্বানী।

কিছুকাল পর ব্যবসায়ী জীবন ত্যাগ করে মেহেরুল্লাহ্ পুরোপুরি প্রচারক-জীবন গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর একটি বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতা থেকে শেখ আবদুর রহিম, মেয়রাজউদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদকে যশোরে নিয়ে যান। এরপরেই তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তা হচ্ছে, মিশনারী জন জমিরুদ্দীনকে ইসলামধর্মে পুনরায় দীক্ষাদান।

৩

শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর 'ধোঁকাভঞ্জন' (কলিকাতা, ১৩২৩) বইটিতে জমিরুদ্দীন আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাঁর অন্যান্য বইতেও অল্পস্বল্প ব্যক্তিগত সমাচার আছে। এ থেকে তাঁর জীবনকাহিনী সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। তাঁর পিতা শেখ মোহাম্মদ আমিরুদ্দীন নদীয়া জেলার গাঁড়াডোব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালা ও মক্তবে বিদ্যাচর্চার পর তিনি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতসমেত নর্মাল শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মিশনারীরা তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে কলকাতার সি, এম, এস, হাইস্কুল, এলাহাবাদের সেণ্ট পলস ডিভিনিটি কলেজ ও কলকাতার সি, এম, এস, ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে দীর্ঘকাল খৃষ্টধর্মতত্ত্ব এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি মিশনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে H. G. R. ডিগ্রী লাভ করেন।[১]

১। পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য।

এরপর জন জমিরুদ্দীনকে দেখতে পাই খৃষ্টধর্মপ্রচারকরূপে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাসিক 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব পত্রিকা'য়[১] "আসল কোরাণ কোথায়?" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, হজরত মুহম্মদের (দঃ) সময়ে কোরআন সংকলিত হয় নি; হজরত আবু বকর ও হজরত ওসমান সে কাজ সম্পন্ন করেন। ওসমান আবার সেকালে প্রচলিত কোরআন দগ্ধ করেছিলেন; তাই, কোরআন শরীফ বলে বর্তমানে যা প্রচলিত আছে, তা মূল কোরআন নয়। এই প্রবন্ধের উত্তরে সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকায়[২] মেহেরুল্লাহ্ "ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯; ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) লিখে জন জমিরুদ্দীনের যুক্তি খণ্ডন করেন। জমিরুদ্দিন এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর দেন 'সুধাকরে' একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে (২৩ বৈশাখ, ১৩০০), যার জবাবে 'সুধাকরে' মেহেরুল্লাহ্ লেখেন "সর্ব্বত্রই আসল কোরআন" নামে একটি প্রবন্ধ (১৭ আষাঢ়, ১৩০০)। এরপর জমিরুদ্দীন আর তর্কে প্রবৃত্ত হন নি। বরঞ্চ, পরে তিনি স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের পরামর্শে ১৩০৪ সালের প্রথম দিকে তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র কাছে চিঠি লিখে ইসলাম-প্রচারকার্য সম্পর্কে আলাপ করেন। ঐ বছর ১১ই ফাল্গুন তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। অনতিবিলম্বে ইসলাম-প্রচারকার্যে জমিরুদ্দীন হয়ে ওঠেন মেহেরুল্লাহ্‌র প্রধান সহকর্মী।

৪

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রচারক-জীবনের সূত্রপাত-কালে কলকাতায় কতিপয় মুসলমান লেখক ইসলাম-সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে লেখনী ধারণ করেন। এঁদের নামোল্লেখ আগেই করেছি। 'সুধাকর' ছিল এঁদের মুখপত্র। মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে অনতিবিলম্বে এঁদের যোগাযোগ হয় এবং তাঁর রচনাদিও এতে প্রকাশিত হতে থাকে। সাপ্তাহিক 'সুধাকর' ও মাসিক

১। প্রথম প্রকাশকাল: বৈশাখ ১২৯৬। "খ্রীষ্টধর্ম-বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক— জি, এইচ, রুজ (Rouse),।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, ২ (দ্বি-স; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৯): ২৯।

২। প্রথম প্রকাশকাল: কার্ত্তিক ১২৯৬ (১৮৮৯)।— ঐ, ২: ৫৭। সম্পাদক: [শেখ] আবদুর রহিম। দ্রষ্টব্য রাজবিহারী দাস, "বঙ্গীয় সংবাদপত্র" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪; সমাদ্দার ও রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৭।

'মিহির'[১] পত্রিকা একত্রিত হয়ে যখন শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' রূপে প্রকাশিত হতে থাকে (১৮৯৬-১৯০৪), তখন মেহেরুল্লাহ্‌ এই পত্রিকার গ্রাহকসংগ্রহের জন্য সার্থক প্রচেষ্টা চালান। 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা'র লেখক এরকম ধারণা দিয়েছেন যে, সুধাকর-দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় 'মিহির ও সুধাকরে'র যুগেই ঃ কিন্তু তার বহু পূর্বেই যে এঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা বোঝা যায় 'মেহের-চরিত' থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৩১২ সালে প্রকাশিত 'সোলতান' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেহেরুল্লাহ্‌ ও জমিরুদ্দীনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল।

মেহেরুল্লাহ্‌র সাংগঠনিক প্রচেষ্টার প্রথম পরিচয় পাই যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা'র প্রতিষ্ঠায়। পরে খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দর ও খান বাহাদুর নূর মুহম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ সমাজহিতৈষীর সহায়তায় তিনি 'নিখিল ভারত ইসলাম-প্রচার সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এই আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে সহায়তা লাভ করেন ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের।

১৩১০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনের ব্যাপারে মেহেরুল্লাহ্‌ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৩১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। এই সম্মেলনের শেষেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এই সময়ে সারা দেশে বঙ্গভঙ্গ-রদের আন্দোলন চলছিল ঃ মেহেরুল্লাহ্‌ যথাশক্তি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

৫

জমিরুদ্দীনকে সঙ্গে পেয়ে মেহেরুল্লাহ্‌র প্রচার-আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। নিজেদেরকে 'ইসলাম ধর্মপ্রচারক' আখ্যা দিয়ে তাঁরা এবার বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়াতে থাকেন। এই সভাসমিতির কিছু কিছু বিবরণ সমকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এরকম একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করি ঃ

১। প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৮৯২। সম্পাদক ঃ শেখ আবদুর রহিম।

... ২৮শে বৈশাখ [১৩০৮] রবিবার নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমাস্থ ছাত্র সমিতির ৫ম অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট সভা হয়। স্থানীয় ১ম মুন্সেফ বাবু সারদাপ্রসাদ সেন বি. এম. মহোদয়, মীর মোহছেন আলি সাহেব ও মুনশী মোহাম্মদ মেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব যথাক্রমে প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ সাহেব, শেখ জমিরউদ্দীন সাহেব, কবিবর মুনশী মোজাম্মেল হক সাহেব, মুনশী মরজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মীর মশাররফ হোসেন সাহেব, মৌলবী সাবের আলী সাহেব, মৌলবী সৈয়দ মর্তুজা হোসেন সাহেব, মৌলবী খবিরুদ্দীন আহমদ সাহেব, কোহিনুর সম্পাদক এস. কে. এম. মোহাম্মদ রওশন আলী সাহেব, কুষ্টিয়া স্কুলের পার্সিয়ান টীচার মৌলবী ফজলুর রহমান সাহেব ও মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম সাহেব প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।[১]

কলকাতায় এবং বাংলার অন্যত্র ভাল বক্তা হিসেবে এঁরা দুজনে বিশেষভাবে পরিচিত হন। ১৩০৫ সালে তাঁদের নোয়াখালি-সফর উপলক্ষে সেখানে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। এর পরিচয় পাওয়া যায় অজ্ঞাতনামা কবির 'আখলাকে আহমদীয়া' নামক কাব্যে ঃ

... মুনশী মেহেরুল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম॥
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জানো দীনের হাতিয়ার॥
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খৃষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া॥
মুসলমান হইল সবে কলমা পড়িয়া।
অনার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া॥
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার॥
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তের শত পাঁচ সালে ছিল বাঙ্গালায়॥
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালি সহর বিচেতে॥ ..[২]

১। ইসলাম প্রচারক, ৪ ঃ ২৮১।
২। জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৪-৫৫ এ উদ্ধৃত।

তাঁর বক্তৃতা সভার একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা আসিরুদ্দীনের বইতে আছে :

> সভার প্রথম দিন ২।৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩।৪ সহস্রেরও উপর লোক সমবেত হইয়াছিল।..... তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুন্সী ছাহেব মগরেবের নমাজ অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজপতন ও উদ্ধারবৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্যকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার উপকারীতা, মোক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিল্পশিক্ষা, ধর্মগত প্রাণগঠন, ব্যায়ামচর্চ্চা, সভাসমিতির উপকারিতা, বয়তুল-মাল তহবীল গঠন, বাল্যবিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।[১]

ধর্ম বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জগত ও জীবনধারা সম্পর্কে যে সচেতনতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাতনের পুনরাবির্ভাব তিনি কেবল কামনা করেন নি, তার নবরূপায়ণ প্রত্যাশা করেছিলেন।

তাঁর তর্কযুদ্ধের ফলে বহু অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বহু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন। জমিরুদ্দীন লিখেছেন :

> তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক শেরেক বেদাত পরিত্যাগ করিয়া দীনদার হইয়াছেন, সহস্র সহস্র বেনামাজী নামাজী হইয়াছেন। কত শত স্থানে তাঁহার বক্তৃতায় মাদ্রাসা, মক্তব ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কত সুদখোর মহাজন তাঁহার উপদেশে সুদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া বহু লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য মন দিয়াছেন। কত সময়ে কত শত হিন্দু ও খৃষ্টান তাঁহার নিকট তৌবা পড়িয়া দীন ইসলাম কবুল করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত শত সামাজিক কার্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই গৌরবের অংশ জমিরুদ্দীনেরও প্রাপ্য।

৬

১৯০৭ সালের ৭ই জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪) মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। এরপর জমিরুদ্দীন কতদিন জীবিত ছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা দুষ্কর, তবে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বইতেও তাঁর রচিত ভূমিকা দেখা যায়। জমিরুদ্দীনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আর দু' তিনটি ঘটনা মাত্র

১। আসিরউদ্দীন, মেহেরুল্লা-জীবনী, পৃ ২৫-২৭।

আমাদের জানা আছে। ১৩০৮ সালের ৮ই কার্তিক তাঁর সহধর্মিনী শামসুন্নেসার মৃত্যু হয়। পরবর্তী বৎসরে "কলিকাতা সিন্দুরিয়া পটীর সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা" হাজী মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। ১৩১০এর ২২শে আষাঢ় হাজী সাহেব পরলোকগমন করেন, এ খবরটি তখনকার 'ইসলাম প্রচারকে' মুদ্রিত হয়।

তিন

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রথম বই 'খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা' (১২৯৩ ১৮৮৬)[১] ষোল পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সূচনায় তিনি খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের নিন্দা করেছেন—অপরাপর ধর্মমতের প্রতি তাঁরা নিয়তই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন বলে। কিন্তু ধর্মসংশ্লিষ্ট বিতর্কে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা টিকিয়ে রাখা যে কত কঠিন, তার প্রমাণ তিনি নিজেও দিয়েছেন। যীশুখৃষ্টের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন (পেরষ ও বোয়স) যে জারজ সন্তান ছিলেন এবং অনেকে যে পরনারীগমন করতেন, পানাসক্ত ও প্রবঞ্চক ছিলেন, বাইবেল থেকে এই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে মেহেরুল্লাহ্‌ বলতে চেয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার এই ধারাই পরবর্তীকালের খৃষ্টানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যীশুখৃষ্টের মধ্যে সাধারণ নীতিজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন ঃ

> যীশুর আগমনে জগতের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং কত শত নিষ্পাপ শিশুর প্রাণহত্যা ও কত শত স্ত্রী পুরুষের অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করাই সার হইয়াছিল। যদি ইনিই খ্রীষ্টানদিগের শান্তিকর্ত্তা হন, তবে এমন শান্তিকর্ত্তাকে আমাদের নমস্কার! [১৩]

শুধু যীশুকেই নয়, বাইবেলের স্রষ্টাও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন নি ঃ

> আহা! বাইবেলের ঈশ্বর কত বড় নির্দ্দয়! "দেখ, আমালেকীয় নামে এক জাতি পাপী হওয়াতে, ঈশ্বর সেই জাতির সর্ব্বস্ব বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে ও তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ ও স্তন্যপায়ী শিশু এবং গরু, মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ করিতে শৌল রাজাকে আজ্ঞা দিলেন।" ১ম শিমুয়েল পুঃ ১৫। ... বাইবেলের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা শিক্ষাদাতা; দেখ ১ম রাজাবলী ২২—২০...। [১৬]

১। মোহাম্মদ মেহেরউল্লা, খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা (তৃ-স; কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৮)।

ত্রিত্ববাদের অসত্যতা ও বাইবেলে পরস্পরবিরোধী উক্তি প্রদর্শনের চেষ্টাও তিনি এখানে করেছেন।

'মেহেরুল ইসলাম'[১] সম্ভবতঃ তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি গদ্য-পদ্য রচনা; মূল রচনা অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ, কিছু অংশ এবং পাদটীকা গদ্যে লেখা। এতে, প্রথমে তিনি একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং হিন্দু ও খৃষ্টানদেরকে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য করেছেন:

যদিও নাছারা হিন্দু আদি ছারা
মুখে এক খোদা কয়।
কাজে ও পূজায় ছাফ দেখা যায়
একজন কভু নয়॥...
খ্রীষ্টীয়ান দলে মূল খোদা ভুলে
হজরত ইছার তরে।
কভু পরোয়ার কভু বেটা তাঁর
জানিয়া বন্দেগী করে॥

প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তিনি খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন:

> হিন্দুদিগের মধ্য হইতে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায় আরবী, পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মশাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।

বইয়ের পরবর্তী অংশে তিনি মোমিন মুসলমানের পক্ষে আবশ্যকীয় ধর্মানুষ্ঠান পালনের (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক বোঝাতে প্রায়ই তিনি ব্যবহারিক জীবন থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন; যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও জমিদার-রায়তের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। যাঁরা এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, তাঁদের প্রতি তীব্র ক্ষোভও এতে প্রকাশিত হয়েছে। এই দলের মধ্যে তাঁর প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন বাউল ("নাড়ার ফকির") ও কবি-গায়কেরা ("গাইন"):

১। অধ্যাপক মুহম্মদ মোহর আলীর সৌজন্যে এই দুষ্প্রাপ্য বইটির একটি খণ্ডিত কপি (পৃ ১৭-৬৮) দেখেছি। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয়, এটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালের রচনা।

যে সকল আহম্মক নামজে নারাজ।
বলে, পাচ ওয়াক্ত কেনে পড়িব নামাজ।
হামেশা ইয়াদ মোরা করি পরোয়ারে।
ডাকিলে কি হবে তায় শুধু পাচ বারে॥
নাড়ার ফকির যারা আছে গায় গায়।
এই ঘোরে বহুজনে ফেলিল দাগায়॥

তাঁর শ্লেষোক্তি থেকে ধনীরাও রক্ষা পান নি ঃ

... এদেশের অধিকাংশ ধনী মোছলমানদের বিশ্বাস যে, নামাজ রোজা ইত্যাদি কাজ কেবল মিছকিনদিগের জন্য ভদ্র হইতে গেলে দহলিজে ঢোলক তবলা রাখাই আবশ্যক।

এদেশে অনেক সুদখোর মোসলমান আছেন, যাহারা সুদকে হারাম জানিয়াও লোভবশতঃ তাহা ছাড়িতে পারিতেছেন না, আবার জানিয়া হারাম খাই বলিয়া নামাজ পড়িয়াই বা কি করিব, এই জ্ঞানে অনেকেই আজ কাল করিতে করিতে মরণ পর্য্যন্তও তওবা করিয়া দিন কবুল করিয়া মরিতে পারিল না।

গাইনদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

এখনও অনেক গাইনের স্পষ্ট কাফেরী কালাম পাওয়া যায়, তাহাদের জানাজা নমাজ পড়া ঠিক নহে।... হে গাইনগণ, তোমরা নিজেও ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে।[২৭]

২৭। এই মন্তব্যটি তিনি করেছেন পাগলা কানাইয়ের প্রসঙ্গে। তিনি আরো বলেছেন ঃ "যশোহর—ঝিনাইদহার অন্তর্গত বেড়বাড়ী সাকিনে 'পাগলা কানাই' নামে যে বিখ্যাত জারি গাইন ছিল, অশিক্ষিত লোকের মধ্যে তাহার ন্যায় নামোয়ার গাইন আর কখনো বঙ্গে দেখা যায় নাই। এই গাইনের প্রতি জোড়া ধুয়া গানের মূল্য অনেক টাকা হইত, ইহার আখড়ায় ১০।১৫ হাজার লোক জমা হইত। ...কানাই গাইনের অনেক গানে স্পষ্ট শেরেকী আছে, সে রাম ও রহিমকে প্রায় তুল্য জানিত।" পরে অবশ্য মেহেরুল্লাহ্ জানতে পারেন যে, ইসলাম ধর্মে কানাইয়ের অটুট বিশ্বাস ছিল এবং তিনি তাঁর কবর জিয়ারত করেন — এ তথ্য একই বইতে শেখ জমিরুদ্দীন-রচিত একটি টীকায় উক্ত হয়েছে। কানাই সম্পর্কে জমিরুদ্দীন একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করেছেন ঃ "এই বেড়বাড়ী কানাই বয়াতির (পাগলা কানাইয়ের) জন্মস্থান। ১২৯৬ সালের ২৮শে আষাঢ় প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" ডক্টর মযহারুল ইসলাম পাগলা কানাইয়ের যে মৃত্যু-তারিখ অনুমান করেছেন, (১৮৯০-৯৫) সেটি এর থেকে (১৮৮৯) খুব দূরে নয়; তবে তাঁর অনুমিত কানাইয়ের জন্ম-তারিখ (১৭৮০) স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। দ্রষ্টব্য মযহারুল ইসলাম, কবি পাগলা কানাই (রাজশাহী ঃ বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯)। জমিরুদ্দীনের সাক্ষ্য-অনুযায়ী কানাইয়ের জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে।

এই উদ্ধৃতিসমূহ থেকে মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারাটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ-গোচর হয়ে উঠে। তিনি ইসলামকে কেবল খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান নি, প্রচলিত ধর্মজীবনের সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। সৈয়দ আহমদ বেরিলিভীর সংস্কারান্দোলনের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, এমন ধারণা করাও যুক্তিসঙ্গত। সৈয়দ আহমদ-পন্থীরা মুসলমানদের প্রচলিত জীবনধারা থেকে অনেক কুসংস্কার দূর করতে যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের রক্ষণশীলতা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন আপোষ করতে দেয় নি। অনুরূপভাবে, মেহেরুল্লাহ্‌ও যেমন আমাদের জীবনে ধর্মবোধের যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার অনুভূতির বিকাশকে প্রশ্রয় দেন নি। ধর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এর অনুকূলে ছিল না। তাছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, উনিশ শতকে নৃত্য-গীতের বিশুদ্ধ চর্চা আমাদের দেশের অভিজাত মহলে যতটা প্রচলিত ছিল, তার চাইতে এই সবের আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার চর্চাই প্রাধান্য লাভ করেছিল।[১] তবে সৈয়দ আহ্‌মদ-পন্থীদের সঙ্গে মেহেরুল্লাহ্‌র যে কালগত ব্যবধান, তার ফলে আধুনিক জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁদের মতো নির্লিপ্ত তিনি হতে পারেন নি। তাই ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও তিনি ভেবেছেন এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের চিন্তার পাশাপাশি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তার মূলগত ঐক্যের কথাও বলেছেন।

'বিধবাগঞ্জনা'র প্রথম প্রকাশকাল আমার জানা নেই।[২] এটি মূলতঃ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করে লেখা। মুসলমান সমাজেও এর

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নতুন-স; কলিকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫২) দ্রষ্টব্য।

২। আমার দেখা বইটির আখ্যাপত্র ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে "বিধবাগঞ্জনা /ও/ বিষাদ ভাণ্ডার" আখ্যার পর সীলমোহর আছে: Bengal library,/ Writers Buildings/ 31 MAR 98. এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৮৮৭র শেষভাগে (বা ১৮৯৮র প্রথমে) এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। ৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে: 'তিনি [কোন হিন্দু বিধবা] বিধবাগঞ্জনা প্রথমবার পাঠ করিয়া পত্র লেখেন—"। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিধবাগঞ্জনার ষষ্ঠ সংস্করণের উল্লেখ আছে।

অপ্রচলনের নিন্দা তিনি করেছেন এবং এ বিষয়ে সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর সঙ্গে তাঁর মতৈক্য লক্ষণীয়। এটিও গদ্য-পদ্য রচনা। প্রথম ও শেষ ভাগ ছন্দোবদ্ধ; মধ্যে গদ্যের ব্যবহার আছে। প্রথমাংশে সধবা সরলা ও বিধবা তরঙ্গিনীর কথোপকথন। নানাচ্ছন্দে বিলাপ করতে করতে তরঙ্গিনী বলছেন ঃ

পর পতি হেরে
প্রাণ যাহা করে
প্রকাশিয়া নরে বলা নাহি যায়
কলেমা গ্রহণ
করিলে তখন
দুঃখ বিমোচন হইবে নিশ্চয়।

ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের উপরেও বিধবাদের আশা-ভরসার উল্লেখ আছে ঃ

হা ইংরেজ শ্বেতকায় মহাবীর দল।
ধরে সব বীর বেশ উদ্ধারিলে কত দেশ
(হায়!) বিধবা-উদ্ধার তরে হলে দুরবল?

বলা বাহুল্য যে, এই আক্ষেপোক্তি-রচনার পূর্বেই হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। কাজেই, ইংরেজ শাসনের প্রতি এই আস্থা প্রকাশে বা মহারাণীর প্রতি বিধবাদের আবেদনে অথবা লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রশস্তিতে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে সরকারের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। এই মনোভাব তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তাধারার পরিচায়ক। আমরা জানি যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে সরকারের এসব প্রগতিশীল সংস্কারকর্মকে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের রক্ষণশীল চিত্তকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল এবং সে প্রচেষ্টা বিফল হয় নি। 'বিধবাগঞ্জনা'য় কিন্তু এইসব পদক্ষেপকে ধর্মীয় জীবনের উপরে খৃষ্টান সরকারের হস্তক্ষেপরূপে দেখা হয় নি, বরঞ্চ অভিনন্দিত করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদন এতে আছে। এ থেকে আমরা বুঝি যে, মেহেরুল্লাহ্‌র ধর্মবোধ এমন একটা যাথার্থ্য ও উদারতার

মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, যার ফলে কেবল স্বধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবনযাত্রাও সংস্কারমুক্ত হোক এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক, এই আত্যন্তিক অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

'বিধবাগঞ্জনা'র গদ্যাংশে মধ্যে মধ্যে কথার খেলা আছে ঃ

> আমার বাবা ও খুড়োরা এত যে বুড়ো, তবু তাদের বাজে কথার হুড়োহুড়ী দেখলে জ্ঞান বুদ্ধিটা গুঁড়ো হয়ে যায়।

তবে বইটিতে মেহেরুল্লাহ্ সুরুচির পরিচয় দেন নি। বিধবাদের (এবং বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাদের) দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে— ভারতচন্দ্রীয় 'নারীগণের পতিনিন্দা'র স্টাইলে — তিনি যতখানি বাস্তবধর্মী হতে চেয়েছেন, সাহিত্যকর্মের পক্ষে অতটা অনুমোদনযোগ্য নয়। এই কারণেই তাঁর 'বিধবাগঞ্জনা' এবং 'হিন্দুধর্ম্মরহস্য ও দেবলীলা' বই দুটির প্রচার সরকার বন্ধ করে দেন। তাঁর এই রুচিদোষের কারণ বোধহয় তাই, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের গর্হিত রুচির অন্যতম হেতু বলে নির্ণয় করেছিলেন —অর্থাৎ "পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা"।

'পান্দ্‌নামা' (দ্বি-স ১৯০৮) শেখ সাদীর সুবিখ্যাত কাব্যের অনুবাদ। এতে ফারসী ও বাংলা অক্ষরে মূল কাব্যের সঙ্গে তার পদ্যানুবাদ আছে।

মেহেরুল্লাহ্ আরও দুটি বই লিখেছিলেন ঃ 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম' দু খণ্ডে সম্পূর্ণ; দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'দলিলোল এসলাম' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। তার আগেই বের হয়েছিল 'খৃষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ'। পূর্বোক্ত বইটির মত এটিও খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচারণার জবাবে লেখা।

চার

জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ অনেকগুলো বই লিখেছিলেন। প্রচলিত মতে, তাঁর গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক ঃ তবে কেউ এ পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর ভার গ্রহণ করেন নি বলে এই সংখ্যাটিকে কিংবদন্তী রূপেই গণ্য করতে হয়। আমি তাঁর যেসব বইপত্র দেখেছি, তার একটা কালানুক্রমিক বিবরণ এখানে দেবার চেষ্টা করবো।

'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য' (১৯০০)[১] ষাট পৃষ্ঠার বই। ইসলাম সম্পর্কে "সঞ্জীবনীর সুযোগ্য সম্পাদক, সুবিদ্বান

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য (তৃ-স ; নদীয়া ঃ নূরজাহান খাতুন, ১৩১৯)। পঞ্চম-স ১৯২৬।

ও সুবিজ্ঞ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ, মহাশয়ের", "কোরাণ ও হাদিসের বঙ্গানুবাদক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের", "সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত টমাস কার্লাইলের", "সুবিখ্যাত পণ্ডিত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, ডি, এস্, সি, মহাশয়ের", "সুবিখ্যাত পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার য়্যাট-ল মহাশয়ের," আচার্য কেশবচন্দ্রের, পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর (এটি 'মিহির ও সুধাকর', ৫ শ্রাবণ ১৩০৯, থেকে গৃহীত হয়), "ইউনিটি ও মিনিষ্টার সম্পাদক, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক রেভাঃ মহেন্দ্রনাথ বসুর", "সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা হিতবাদী"র এবং পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য এতে সংকলিত হয়েছে। মেহেরুল্লাহ ও আরো কয়েকজনের অনুরোধে এই সংকলন কার্যে তিনি উদ্যোগী হন।

'আসল বাঙ্গালা গজল' (পরিবর্ধিত নবম-স; ১৯১৩)[১] -ও একটি সংকলন। ভূমিকায় জমিরুদ্দীন বলেছেন যে, মীর মশাররফ হোসেনের 'বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ' পাঠ করে তাঁর ও মেহেরুল্লাহ্‌র গজল লেখার আগ্রহ জন্মে। বিভিন্ন সভায় পঠিত এইসব গজল জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। এতে যে একুশটি গজল সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে বারোটি তাঁর রচনা এবং দুটি মেহেরুল্লাহ্‌র; মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক (ভোলা), দেওয়ান শামসুদ্দীন,[২] সলিমউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমান ইসলামিয়ার একটি করে গজল এতে গৃহীত হয়েছে। হিন্দু লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ("জীবনসঙ্গীত") এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, আসল বাঙ্গালা গজল (নবম-স; কলিকাতা: রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩২০)। প্রথম প্রকাশ ১৩১৫। নবম সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, "তিন চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।"

২। এঁর রচনার অংশ:

আমরা কি ওহে সেই মোসলমান,
করিতেন যাঁহাদের কন্যা সম্প্রদান,
কত হিন্দু রাজগণ
হয়ে হরষিত মন
ছুঁইও না বলি আজি করে হেয় জ্ঞান,
আমরা কি ওহে সেই মোসলমান।

ত্রিপুরা জেলার পাদ্‌রী জন টেকেল-বিরচিত 'শ্রেষ্ঠ নবী কে ? ও মুন্সীর ভুল' পুস্তিকার প্রতিবাদে জমিরুদ্দীন 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন'[১] (১৯১৬) প্রকাশ করেন। ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের আদেশে হজরত মুহম্মদের (দঃ) এই জীবনীটি তিনি রচনা করেন। 'মোজেজা'য় তিনি আস্থাজ্ঞাপন করেছেন, হজরতের অঙ্গুলিসংকেতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, এই প্রচলিত মতকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কোরআনের সত্যতা ও বাইবেলের অসত্যতা প্রমাণ করতেও তিনি চেষ্টিত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

> পাদ্রী [ওয়েন্ধার] সাহেব সার সৈয়দ আহমদ, ইমাম ফখরুদ্দীন কিম্বা বুখারী শরীফ হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, বাইবেল পরিবর্তন হয় নাই ; কিন্তু পাদ্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা কি এই সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন না পড়িয়াছিলেন ?

ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ছিল না বলেই মনে হয়।

খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারণার জবাবে তিনি অনেকগুলো প্রচার-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যেগুলোর সাধারণ নাম "রদ্দে খৃষ্টান"। এগুলোর অধিকাংশই ফুরফুরার পীর সাহেবের আদেশে লিখিত হয়। রদ্দে খৃষ্টান সিরিজের প্রথম নম্বর 'ইসলামী বক্তৃতা' (১৯০৭)[২] উৎসর্গ করা হয়েছিল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে। বইটি 'ক্রিশ্চিয়ানিটী এ্যাণ্ড ইসলাম' নামক ইংরেজী গ্রন্থের ভাবানুবাদ। পাঁচটি পরিচ্ছেদে ইসলাম সম্বন্ধে ক্যানন আইজাক টেলর, লিটনার, টমাস ও কার্লাইলের এবং ফারাক্লিত সম্বন্ধে ভূতপূর্ব পাদ্রী জন আবদুল্লাহ্‌র বক্তৃতার মর্ম এতে সংকলিত হয়েছে।

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বই 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য' (১৯২৫)।[৩] এটি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাউস-রচিত হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব বিষয়ক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বানী সম্পর্কিত প্রবন্ধের তরজমা বারো পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি, শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন (কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেস, ১৩২৩)।

২। শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি, ইসলামী বক্তৃতা (চ-স ; নদীয়া ঃ শেখ আজিমুদ্দীন, ১৩৩২)। দ্বি-স ১৩১৭ ; তৃ-স ১৩২২।

৩। শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-কাব্যনিধি, ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য (নদীয়া ঃ গ্রন্থকার, ১৩৩২)।

তৃতীয় পুস্তিকা 'রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান' (১৯২৫)।[১] নদীয়ার ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রীরা 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' বলে একটি পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন। এতে হজরত মুহম্মদকে (দঃ) মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্কৃতিকারী, লম্পট ও বৈরিনির্যাতক বলে চিত্রিত করে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর ভাষায়, "কোরাণের ধর্ম্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে কিন্তু শূকরের ধর্ম্ম"। এর প্রতিবাদেই জমিরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। বইটি মুদ্রণের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়ে ফুরফুরার পীর সাহেব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। মুসলমানদের পরিচালিত সাময়িকপত্রেও এ-সম্পর্কে আবেদন প্রকাশিত হয়। এইসব আবেদন নিবেদনে বাংলা সরকারেরও টনক নড়ে এবং তাঁরা নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন ঃ

> The attention of the Government has been drawn to an article which appeared in the "Mussalman"[২] of February 17, 1925 entitled "Malicious attack on the Holy prophet."... On securing a copy of the book, the Government have learnt that it was published in 1899. The Govt. has also been informed that it has been out of print for 15 years....

জমিরুদ্দীনের বইতে 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' থেকে "মোহাম্মদী ধর্ম্মের পরীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি (উপরে যার কথা বলা হয়েছে) পুনর্মুদ্রিত হয় এবং টীকা সংযোজন করে তার উত্তর দেওয়া হয়।

চতুর্থ পুস্তিকা 'হজরত ইসা কে?' (সহ-শিরোনামা ঃ 'অর্থাৎ তিনি বান্দা কি খোদা, এতদ্বিষয়ক সমালোচনা ও শাস্ত্রীয় মীমাংসা') প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে[৩]। আকবর মসীহ্-রচিত উর্দু গ্রন্থ 'উলুহতে মসীহ' অবলম্বনে মুন্‌শী

১। মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান (নদীয়া ঃ গ্রন্থকার, ১৩৩২)।

২। প্রথম প্রকাশ কলিকাতায় সাপ্তাহিক পত্ররূপে ঃ ডিসেম্বর ১৯০৬। সম্পাদক ঃ আবুল কাসেম, পরে মুজিবর রহমান। ১৯২৫ এর জানুয়ারী থেকে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ পেত। ১৯৩২ এর ৮ই জুলাই থেকে দৈনিক পত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৩। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, হজরত ইসা কে? (চ-স ; কলিকাতা ঃ শেখ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, ১৩৩৩)। পুস্তিকাকারে প্রকাশের পূর্বে 'ইসলাম-প্রচারক' মুদ্রিত (আগস্ট ১৮৯৯ ঃ "প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে?")। দ্বি-স ১৩১৪।

মেহেরুল্লাহ্‌র অনুরোধে এটি লেখা হয়ঃ মেহেরুল্লাহ্‌ বইটির আদ্যোপান্ত সংস্কারসাধনও করেন। এর থেকে একটু উদ্ধৃত করি ঃ

> ইসাই বা খ্রীষ্টানদিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে হজরত ইসা বা যীশুই পূর্ণ ঈশ্বর; স্বয়ং জগৎপিতা স্বর্গীয় ঈশ্বর...। [৭] ইঞ্জিলে জলন্ত ভাষায় লেখা আছে যে, 'আদম ঈশ্বরের পুত্র" দেখ, লুক ৩ অঃ ৩৮ পদ। এখন কি আমরা বলিব যে, আদমের পুত্রগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন এবং তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিত কি? সত্য যদি প্রেরিতগণ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সেই আদমের ন্যায়; কিন্তু তাহাতে তিনি কদাচ খোদা হইতে পারেন না। ... [২১-২২]

সাত নম্বর পুস্তিকা 'পাদ্‌রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন' (নদীয়া, ১৯২৭)।[১] হজরত মুহম্মদকে (দঃ) আক্রমণ করে মনরো 'হজরত মোহাম্মদএর বেগোনা থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা' নামে যে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, জমিরুদ্দীন তার উত্তর দেন এই পর্যায়ে। পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট অনুরোধ-পত্রে ফুরফুরার পীর আবুবকর লেখেন ঃ

- সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, খৃষ্টান পাদরীরা ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবার জন্য সাত কোটী কেতাব লিখিয়াছে। সম্প্রতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কুৎসা করিয়া ও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া ৫২ খানা কেতাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এই সকল কেতাবের প্রতিবাদ না লিখিলে ইস্‌লামের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইস্‌লাম-প্রচারক মৌলবী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব ব্যতীত বর্তমানে আমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নাই যে, পাদ্‌রীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন। আমি উক্ত মৌলবী সাহেবকে ঐ ৫২ খানা কেতাবের প্রতিবাদ লিখিতে আদেশ করিয়াছি। আর তাঁহার কৃত "রদ্দে খৃষ্টান" সংক্রান্ত সমস্ত কেতাব "মজমুয়ে রদ্দে নাছারা" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে বলিয়াছি, কেতাবও ছাপা হইতেছে। এই আবশ্যকীয় কার্য্যে বিস্তর টাকার আবশ্যক। আমার মুরিদান ও অন্যান্য দীনদার মুসলমানদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পূর্বোক্ত পুস্তিকায় মনরোর বক্তব্য ছিল এই যে, কোরআনে দেখা যায় যে, হজরত মুহম্মদ এবং (যীশু ভিন্ন) অন্যান্য নবী স্বীয় পাপ স্বীকার করেছেন এবং স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অতএব, তিনি নিষ্পাপ ছিলেন না। বাইবেলের উদ্ধৃতির সাহায্যে জমিরুদ্দীন দেখালেন যে, সেখানেও যীশুর

১। পাদরী মওলানা শাহ্‌ সুফী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী, পাদ্‌রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন (নদীয়া : শাহ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, ১৩৩৪)।

অপরাধ স্বীকৃতি ও ক্ষমাভিক্ষা আছে। হজরত মুহম্মদকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্যে তিনি আর একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; তার নাম, 'মাসুম হজরত মোহাম্মদ'।

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে জমিরুদ্দীন 'মেহের-চরিত' প্রকাশ করেন। মোট ১৫৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনকাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উভয়ের মিলিত প্রচার আন্দোলনের বিবরণ আছে। রচনারীতির বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ না পেলেও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়ে এটি মূল্যবান। বইটির শেষে মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে মুসলমান-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য এবং জমিরুদ্দীন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করিম ও শেখ হবিবর রহমান প্রভৃতি লেখকের কবিতা সংকলিত হয়েছে।

'মেহের-চরিতে' জমিরুদ্দীনের লেখা 'আমার জীবনী ও ইস্‌লাম গ্রহণ' বইটির উল্লেখ আছে: ১৩০৪ সালে মেহেরুল্লাহ্‌ এটি প্রকাশ করেন। তাঁর আর কয়েকটি বইয়ের নামও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: 'জওয়াবোন্নাছারা', 'খোশগল্প', 'উপদেশ ভাণ্ডার', 'দুইশত উপদেশ' প্রভৃতি। 'ইস্‌লাম-প্রচারকে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "বাইবেলে বহুবিবাহ" (সেপ্টেম্বর১৮৯৯) এবং "জীবহত্যা" (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯) উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে জমিরুদ্দীনের 'শোকানল' [১] প্রকাশিত হয়। তাঁর কয়েকজন পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে তিনি পাঁচটি কবিতা লেখেন, এখানে তা সংকলিত হয়েছে। প্রথমা পত্নীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন:

অকালে কোথায় গিয়া করিতেছ বাস,
কহ ত্বরা, ত্বরা করি যাই তব পাশ।...
মনে যত উপজয়
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন;
তব সনে হয় মম বিবাহ-বন্ধন;
সেই প্রেম-সম্মিলনে,
এক সঙ্গে দুই জনে

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, শোকানল (কলিকাতা: রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৬)।

সুখ-দুঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল,
ভাবি নাই ভাগ্যে মোর ঘটিবে এ কাল।...
রাখি নাই কত কথা কতই তোমার,
স্ত্রৈণ বলি পাছে হই ঘৃণিত সবার।

দ্বিতীয়া পত্নীর পিতার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

কেমনে ভুলিব পিতঃ! ভুলিতে না পারি,
তব মুখখানি আমি অনুক্ষণ স্মরি।
পক্ক-দাড়ী সুবদন,
সু সুন্দর ও গঠন
হেরিতে বাসনা সদা বলিব কি হায়,
এই ছিলে অকস্মাৎ লুকালে কোথায়?

'শোকানলে'র কবিতাগুলি সরলভাষায় লিখিত এবং আন্তরিক অনুভূতিতে পূর্ণ। তবে কবিত্ব এতে খুব কমই আছে, তা বোধহয় স্পষ্ট করে না বললেও চলে।

তাঁর আরেকটি বই 'বিশুদ্ধ খতনামা' (১৯০৩)[১] আদর্শ পত্ররচনা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত। পত্রলেখকদের প্রতি উপদেশে তিনি বলেছেন, "মুসলমানের নামের পূর্বে শ্রী লিখিতে নাই, উহা ইসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ"। বইটি থেকে কয়েকটি আদর্শ পাঠ তুলে দিচ্ছি।

পিতাকে লিখিত পত্রের শিরোনামা ঃ

বখেদমতে কেবলায়ে মোয়াজ্জম কাবায়ে মোকাররম,
জোনাব মুনশী আনারুদ্দীন আহমদ সাহেব
পাক জোনাবেষু।

ছোট বোন ও শ্যালিকাকে লিখিত পত্রের শিরোনামা ঃ

হামশিরা আকিফা মস্তমা
বিবি করিমন নেসা সাহেবা
দোওয়াবরেষু।

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, বিশুদ্ধ খতনামা (পঞ্চম-স; কলিকাতা ঃ মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩১৮)।

স্ত্রীকে ঃ

বেয়াপ্তনিহিতালা সানহু বানাজাদে বাহুয়ে
দামসাদ হামদাম ও হামরাজ ইয়ানে
নছিরুন্নেসা সাল্লাম আল্লাহতালা
বিবি নছিরুন্নেসা খাতুনে জান্নাত।

এর পরে সন্নিবিষ্ট স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পত্রটিও এগুলোর শিরোনামার মতোই কৌতুকাবহ।

জমিরুদ্দীনের গ্রন্থাদির যা কিছু মূল্য তা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। মেহেরুল্লাহ্‌র বই সম্পর্কেও আমরা এই মন্তব্য করতে পারি। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। রচনার যে প্রসাদগুণে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে, তা তাঁদের লেখনীতে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই। এঁরা কেউই সাহিত্য-যশোলিপ্সু ছিলেন না। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারের প্লাবনে এবং আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মজীবনে যে ভাঙ্গন এসেছিল, এঁরা তা রোধ করতে চেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে গৌরবের জয়টীকা এঁরা ললাটে ধারণ করেছিলেন, সেটাই আনন্দের কথা।

§

পরিশিষ্ট

ক ঃ দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ্

সেযুগে মোহাম্মদ মেহেরউল্লা নামে আরো একজন লেখক ছিলেন। ইনি সিরাজগঞ্জের (পাবনা) অধিবাসী ছিলেন এবং মেহেরুল্লাহর (যশোর) মতোই ইসলাম-প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে সানী (=দ্বিতীয়) মেহেরুল্লাহ্ বলে জানত। তিনি নিম্নোক্ত পুস্তিকাগুলি রচনা করেছিলেন ঃ

১। ইসলামিক বক্তৃতামালা
২। বাল্যবিবাহের বিষময় ফল
৩। এসলাহল কওম বা সমাজ-সংস্কার
৪। মানবজীবনের কর্তব্য
৫। মহা বাক্যাবলী
৬। বাঙ্গালা কোরাণ শরীফ
৭। শ্লোকমালা
৮। উপদেশমালা
৯। হক নছিহত

অনেক সময়ে এঁর রচিত গ্রন্থাদি যশোরের মেহেরুল্লাহ্র লেখা বলেও ভুল করা হয়ে থাকে।

প্রায় একই সময়ে খুলনায় মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ খান নামেও একজন সমাজ-সংস্কারকামী লেখকের অস্তিত্ব ছিল। তাঁর রচিত 'ইসলাম কৌমুদী' (১৩২১) বইটিতে এই সংস্কারপন্থী চিত্তের সাহসিক অভিব্যক্তি আছে।

খ ঃ পীর আবুবকর

সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর শিষ্য মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী গুরুর সমাজ-সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘোষিত জিহাদে যোগ দেন নি। পরবর্তীকালে তিনি দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ধর্মগতভাবে অসিদ্ধ। তিনি পীর-মুরীদ সম্পর্কেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র হাফিজ আহমদ ও ভাগিনেয় মুহম্মদ মহসীনের প্রচেষ্টায় তাঁর মতামত বাংলা দেশে বেশ ছড়িয়ে পড়ে। ফুরফুরার পীর আবুবকর (১৮৪৯-১৯৩৯) ছিলেন এই ধারার ধর্মসাধক।[১]

১। Benoy Gopal Ray, "Islam in Modern Bengal", *Visvabharati Quarterly*, XXI, I.

তাঁর উৎসাহে বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত বহু পুস্তক অনূদিত ও রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মপুস্তক পাঠযোগ্য নয়, এই ধরণের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছিলেন তিনিই। সেকালের বাঙালী মুসলমানদের সংবাদপত্রসমূহ যাতে জনপ্রিয় হয় এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, সেদিকে তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং প্রচুর চেষ্টাও করেছিলেন। এ প্রচেষ্টা অনেকখানি সাফল্যও লাভ করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের কালে হিন্দু মুসলমানে যাতে সংঘর্ষ না হয়, অথচ মুসলমানেরা যেন সরকারের কোপদৃষ্টিতে না পড়েন, এ বিষয়ে তিনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন। বল্কান যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের সুলতানের সাহায্যার্থে একদিনে বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে তাঁর প্রভাবের পরিচয়ও তিনি রেখে গেছেন।[১]

মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনে তাঁর প্রভাব স্পষ্টতঃই কার্যকরী হয়েছিল। যশোরের মনোহরপুরে মেহেরুল্লাহ্‌ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মওলানা কেরামত আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এর নামকরণ করেছিলেন 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া'। স্বদেশী আন্দোলনেও মেহেরুল্লাহ যোগদান করেন নি। তিনি বলেছিলেন :

> একখানি ভগ্ন ও একখানি সবল পদ লইয়া পথ চলা যেমন দুষ্কর সেইরূপ শিক্ষায় দীক্ষায় যতদিন মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ হইতে না পারিবে, ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুকরণ করিতে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।[২]

গ : জমিরুদ্দীনের উপাধিপত্র

C. W. Society
N. W. P. Conference

It is hereby certified that Shaikh Zomiruddin having passed the Examination for the higher grade of Theology in the first division and having been recommended by Rev. A. E. Johnston is approved by this conference for that office.

Allahabad — A. Sterne, *Chairman.*
Dated 15th May 1893. — A. Hednight, *Secretary.*

১। মোজাম্মেল হক, মাওলানা-পরিচয় (কলিকাতা : গণেশ পুস্তকালয়, ১৩২১), পৃ ৩২-৩৬ দ্রষ্টব্য।

২। হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮ এ উদ্ধৃত।

বিদ্যাপতি-বিচার*

সতীশচন্দ্র রায়

(ভূমিকা)

বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সর্বত্র সমাদৃত, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাপতি যখন মৈথিল-কবি বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণিত হইয়া গিয়াছেন, তখন দুইজন সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তার জন্মভূমি বলিয়া বঙ্গদেশের আর সে গৌরব করা সাজে না। বিদ্যাপতির শুধু জন্মভূমি হইলে বঙ্গদেশের যে গৌরব হইত, বিদ্যাপতির প্রধান আবিষ্কারক ও অনন্যসাধারণ রক্ষা-কারক বলিয়া বঙ্গদেশের উহা অপেক্ষা অনেক অধিক গৌরব ন্যায্য প্রাপ্য বটে। কথাটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। বর্তমান সময়ের আন্দাজ ৫৫০ বৎসর পূর্বে মিথিলার অন্তর্গত বিস্‌ফি নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে বিদ্যাপতি ঠাকুরের জন্ম হয়। বিদ্যাপতি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ২৯৩ লক্ষণ সংবত অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪০০ সালে মিথিলার রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে উক্ত বিস্‌ফী গ্রাম দান-প্রাপ্ত হন। ঐ দানপত্রে বিদ্যাপতিকে "নব-জয়দেব-মহারাজ-পণ্ডিত ঠাকুর" উপাধি দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে সংস্কৃত ও 'অবহট্‌ঠ' (প্রাকৃত-জাত অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ) মিশ্রিত 'কীর্ত্তিলতা', সংস্কৃত ভাষায়

---

* "বিদ্যাপতি-বিচার" প্রবন্ধটি শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'সোনার গৌরাঙ্গ' নামক মাসিক পত্রিকাতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পিতার মৃত্যুর ফলে তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত 'পদকল্পতরু'র পঞ্চম খণ্ডে বিদ্যাপতির উপর তাঁহার লেখা অন্যান্য প্রবন্ধের সন্ধান পাইবেন।

'সাহিত্য পত্রিকা'র সুযোগ্য সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের উৎসাহের ফলে "বিদ্যাপতি-বিচার" প্রবন্ধটি একসঙ্গে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই এজন্য অধ্যাপক হাই সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। —শ্রী ভবানীচরণ রায়, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইং ১.৭.৬০।

'পুরুষ-পরীক্ষা', 'লিখনাবলী', 'শৈবসর্ব্বস্ব-সার', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'বিভাগসার' 'গয়াপতন' ও 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থগুলিই প্রসিদ্ধ বটে। ইহা ব্যতীত তিনি মৈথিল ভাষায় যে কত পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা অসাধ্য। প্রকৃত কথা এই যে তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থের জন্যেই মিথিলায় পূর্বাবধি সমাদৃত হইয়া আসিয়াছেন। যে পদাবলীর জন্য পরবর্তী সময়ে তিনি বঙ্গদেশে অমর ও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই পদাবলী তাঁহার স্বদেশে বিগত পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত এক প্রকার অজ্ঞাত ও অনাদৃত অবস্থায় দুই চারি খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। গত ১৮৮১ ইংরেজী সালে মনীষী গ্রিয়ারসন সাহেব মহোদয় দারভাঙ্গার মধুবাণী মহকুমার এস, ডি, ও, থাকা কালে সেই প্রদেশের ভিক্ষুকদিগের মুখে বিদ্যাপতির কতক পদ গীত হইতে শুনিয়া তিনি ঐরূপ মাত্র ৮২টী পদ সংগ্রহ করিয়া, ভূমিকা, টীকা, শব্দ-কোষ ও ইংরেজী অনুবাদ সহ উহা কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার একটা অতিরিক্ত সংখ্যায় Maithili Chrestomathy নামে সর্বপ্রথমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন এবং সত্য কথা বলিতে হইলে তখন হইতেই বিদ্যাপতির পদাবলীর উপর তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এদিকে কিন্তু বঙ্গদেশে অন্ততঃ সাড়ে চারিশত বৎসর যাবৎ বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে পরমাদরে সর্বত্র গীত এবং বিদ্যাপতি ঠিক চণ্ডীদাসের মতই অন্যতর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও তাঁহার বৈষ্ণব-পদাবলী এতই সুপরিচিত যে, উহার বিশেষ ও বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যে কেবল অনাবশ্যক, তাহা নহে; আমাদিগের বিবেচনায় উহা দ্বারা বৈষ্ণব পাঠক সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অবমাননাও প্রদর্শিত করা হয়। অতএব আমরা এখানে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে বিদ্যাপতির পদাবলীর অসাধারণ প্রসিদ্ধি ও প্রসারের বিস্তৃত আলোচনা করিব না, তবে বিদ্যাপতির পদাবলী যে কিরূপ সুদীর্ঘকাল হইতে বঙ্গদেশে বঙ্গবাসীরই যত্ন ও চেষ্টায় প্রচারিত হইয়াছে, এখানে সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পূর্বেই বিদ্যাপতি তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গীয় কবি চণ্ডীদাসের নিকট রস-তত্ত্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন; "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁজন পিরিতি" ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র ৪র্থ শাখার ২৬ পল্লবের ভণিতা-হীন একটী সুপ্রাচীন পদে উল্লিখিত আছে —

দুহু গুণ শুনি চিত দুহুঁ উতকণ্ঠিত
দুহুঁ দোহাঁ দরশন লাগি।
দোহাঁর রসিকপন শুনি শুনি দুহুঁ-জন
দুহুঁ-হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল
তাহে আতি আরতি ভেল।
রাধা-কানুক প্রেম রস-কৌতুক
তাহে মগন ভৈ গেল॥
ইত্যাদি।

ইহারই পরবর্তী "চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ" এবং "সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি" ইত্যাদি পদে পরস্পর সম্মিলনোৎসুক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস মহাকবি-দ্বয়ের গন্তব্য পথের মধ্যবর্তী কোনও স্থলে বসন্ত-কালে মধ্যাহ্ন বেলায় বটবৃক্ষ-তলে মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "সময় বসন্ত" ইত্যাদি পদের ভণিতা আছে —

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনারাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান॥

যদিও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উদ্ধৃত পদের বর্ণিত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সম্মিলনকে অমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব কিংবদন্তীমূলক এই ঘটনাটী অলীক বলিয়া মনে করেন না। যাহা হউক শ্রীমহাপ্রভুর অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধেও কথিত আছে যে, তিনি একবার তীর্থ গমন-প্রসঙ্গে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করার সময়ে বিদ্যাপতির অসাধারণ প্রসিদ্ধিহেতু বিদ্যাপতির বাসস্থলী মিথিলার বিসফী গ্রামে যাইয়া বৃদ্ধ কবির দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার কতকগুলি পদও সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। বিদ্যাপতি যে শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা পরবর্তী গবেষণাদ্বারা নিশ্চিতরূপেই জানা গিয়াছে; সুতরাং শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্যের আন্দাজ ২০।২৫ বৎসর বয়সের সময় এই ঘটনা হইয়াছিল, এরূপ মনে করিলে ইহাও কোনরূপেই অসম্ভব বোধ হয় না।

'বিদ্যাপতির পদাবলী'র সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে তাঁহার মতে খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক মিথিলার তালপত্রের পুথি হইতে যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, উহার মধ্যে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদই দৃষ্ট হয় না; সেগুলি কেবল 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' ও 'কীর্তনানন্দ' প্রভৃতি বঙ্গদেশের প্রাচীন পদ-সংগ্রহেই পাওয়া যায়; সুতরাং সেই সকল পদ বহুকাল পূর্বেই মিথিলা হইতে সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালায় সযত্নে রক্ষিত হওয়ায় নষ্ট হইতে পারে নাই; কিন্তু মিথিলায় সেরূপ না হওয়ায়, সেখানে বিদ্যাপতির উক্ত উৎকৃষ্ট পদগুলি অযত্ন ও অনাদরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ অনুমান অপরিহার্য বটে। বস্তুতঃ শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কাল হইতেই যে বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গে সুপ্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কেননা, 'চরিতামৃত'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান-কালে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রামানন্দ রায়ের নাটক, 'কর্ণামৃত' ও 'গীতগোবিন্দে'র দিবারাত্র অনুশীলন করিতেন। মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের সময়ে অর্থাৎ আন্দাজ তিনশত বৎসর পূর্বে যে বিদ্যাপতির পদাবলীর বঙ্গদেশে অসাধারণ সমাদর হইয়াছিল, উহার প্রমাণস্থলে কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহাকবি গোবিন্দদাস এরূপ প্রৌঢ় বয়সেই বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত ও ব্রজ-লীলার পদাবলী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গদেশের প্রচলিত ভাষায় পদ-রচনা না করিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার অনুকরণে "ব্রজ-বুলি" নামক কল্পিত ভাষায় বহু-পরিমাণে বিদ্যাপতিরই পদের ভাষা ও ভাবের অনুসরণ করিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক অপর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাস, রায় শেখর প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পদ রচনা করিয়া থাকিলেও এই ব্রজবুলির অপূর্ব প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; ফলতঃ তাঁহারাও গোবিন্দদাসের মতই বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের অনুকরণে ব্রজবুলি পদ-রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আন্দাজ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পদসংগ্রহ 'ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি' ও প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন 'পদামৃতসমুদ্র' ও প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের প্রাচীন 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে যে বিদ্যাপতির কত উৎকৃষ্ট পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা পদাবলীর পাঠক-বর্গের অজ্ঞাত নহে; সুতরাং এ অবস্থায়ও যদি বঙ্গবাসীরা বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রথম ও প্রধান আবিষ্কারক এবং সংরক্ষক বলিয়া গৌরব না করিবেন, তাহা হইলে সেই গৌরব আর কাহার প্রাপ্য হইতে পারে? তবে অনেকদিন হইতেই আমাদের একটা

অপবাদ রটিয়াছে যে, আমরা বিদ্যাপতির পদগুলিকে রক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার জন্য আমরা সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। বিদ্যাপতির পদের ভাষা প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন মৈথিল বটে। মনীষী গ্রিয়ারসন মহোদয়ের পূর্বে আর কেহই মৈথিল ভাষার ব্যাকরণ কিংবা অভিধান সঙ্কলনের যত্ন চেষ্টা করেন নাই। স্বাভাবিক কারণবশতঃ বিদ্যাপতির পদের প্রাচীন ভাষার সহিত বর্তমানকালের মৈথিল ভাষার অনেক পার্থক্য ঘটায়, বর্তমান সময়ের মৈথিল পণ্ডিতেরাও বিদ্যাপতির অনেক পদের অনেক শব্দ ও উহার অর্থ সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়া পারেন নাই। গ্রিয়ারসন সাহেবের পূর্বোক্ত গ্রন্থ-প্রণয়নে সাহায্যকারী মৈথিল-পণ্ডিতগণ যে বিদ্যাপতির পদের ছন্দ ও অর্থ-নির্ণয়ে অনেক স্থলেই আশ্চর্যরকম ভুল করিয়াছেন এবং গ্রিয়ারসন মহোদয় ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে তাঁহার নিজের বহু দিনের পরিশ্রমে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে মৈথিল পণ্ডিতদিগের কতকগুলি ভ্রম-সংশোধনে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা তাঁহার উক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রিয়ারসন সাহেবের সংগ্রহে বিদ্যাপতির মাত্র ৮২টী পদ আছে; উহাতেও যখন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে অসাধারণ অভিজ্ঞ গ্রিয়ারসন সাহেবের জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে বহু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তখন অশিক্ষিত কীর্তন-গায়ক ও প্রাচীন পুথির লেখকদিগের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার জন্য যে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে অনেক বিকৃতি ও অশুদ্ধি প্রবেশ না করিয়াই পারে না, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের দেশের প্রাচীন পুথির অধিকাংশ লেখকই আধুনিক প্রাচীন পুথির সম্পাদকদিগের ন্যায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রাচীন পুথির দুর্বোধ্য বা অবোধ্য পাঠের পরিবর্জন ও পরিবর্তন করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদিগের লিপিকার্যের সনাতন রীতিই ছিল—"যৎ দৃষ্টং তৎ লিখিতং"; এরূপ লিপিকারগণকে "মাছি মারা কেরানী" বলিয়া সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা যতই বিদ্রূপ করুন না কেন, ইহারা নিজেদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে প্রাচীন পুথির পাঠের বিন্দু বিসর্গেরও ব্যতিক্রম না করিয়া, যেমনটা দেখিয়াছেন, ঠিক তেমনটাই লিখার জন্য চেষ্টা করায় প্রাচীন পুথির পাঠ বিশুদ্ধি যে অনেক স্থলেই আশাতীতরূপে রক্ষিত হইয়াছে ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। যাহা হউক, যখন হইতে প্রাচীন পুথির

মুদ্রাঙ্কন ও আধুনিক ধরণের সটীক সংস্করণ হওয়া আরম্ভ হইল তখন হইতেই কতকগুলি সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গুরুতর অসুবিধারও সূত্রপাত হইল। সে সকল অসুবিধা যে কি, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠ ও অর্থের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে পদে পদেই উহার আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে বিদ্যাপতির প্রধান আবিষ্কারক ও সংরক্ষক বলিয়া গৌরব করিতে গেলে সে গৌরব বঙ্গবাসীর প্রাপ্য; এখন আবার বলিব যে বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেষ্ঠ সংস্করণ-কার বলিয়া গৌরব করাও শুধু বাঙ্গালীদেরই সাজে। বাঙ্গালায় বিগত পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে বিদ্যাপতির পদের কৃতিত্ব, পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ের জন্য বহু সংখ্যক সুপণ্ডিত ব্যক্তি যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন, এবং উহার ফলে বিদ্যাপতির পদাবলীর যতগুলি উল্লেখযোগ্য সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার তুলনায় প্রতীচ্য পণ্ডিত গ্রিয়ারসন মহোদয়ের কথা বাদ দিলে, মিথিলায় এ পর্যন্ত এজন্য শতাংশের এক অংশ চেষ্টাও করা হইয়াছে কিনা, সন্দেহের বিষয় বটে।

যখন গত ১৮৮১ সালে গ্রিয়ারসন মহোদয় কর্তৃক পূর্বোক্ত Maithili Chrestomathy গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উহারই প্রায় সমকালে বঙ্গদেশে স্বর্গগত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় কর্তৃক 'মহাজন পদাবলী' নাম দিয়া সর্বপ্রথমে বিদ্যাপতির পদাবলী বিস্তৃত ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত পাদ-টীকা, পাঠান্তর ও শব্দকোষসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। জগবন্ধুবাবু শেষ জীবনে 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ও অন্যতম সুপণ্ডিত রসজ্ঞ বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও এই 'মহাজন পদাবলীই' তাঁহার সর্বপ্রধান অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। জগবন্ধুবাবু তখন গ্রিয়ারসনের উক্ত গ্রন্থ হইতে কোনও সাহায্য পান নাই। রাজকীয় ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকতার কার্য করিয়া তাঁহার যে অধিককাল ধরিয়া বিদ্যাপতি বা অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর অনুসরণ করার তেমন সুবিধা ঘটিয়াছিল এমনটাও জানা যায় নাই; সর্বোপরি এখন যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বহু চেষ্টায় নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হওয়ায়, উহাদের পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণগুলির সাহায্যে বিশেষ জিজ্ঞাসু গবেষক ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রাচীন পদাবলীর সম্বন্ধে গবেষণা করার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে, তখন সে সকল সুবিধা ও বিশেষ কিছু ছিল না; এ অবস্থায়ও যে নিজের অদ্ভুত উদ্যম ও অনুসন্ধান এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে

অভিজ্ঞ কতিপয় বন্ধু ব্যক্তির উদার সাহায্যের ফলে জগবন্ধুবাবু এরূপ একটা মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সংস্করণের শত ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। প্রায় এই সময়েই স্বর্গগত প্রসিদ্ধ লেখক সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' নাম দিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী প্রকাশিত করেন। সরকার মহাশয়ও সংক্ষিপ্ত পাদটীকার সংযোজন ব্যতীত বিদ্যাপতির পদাবলীর রীতিমত ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন নাই; পাঠ ও পাঠের অর্থ সম্বন্ধেও তিনি অধিকাংশ স্থলেই মহাজন পদাবলীর অনুসরণ অথবা জগবন্ধুবাবু অক্ষয়বাবুর অনুসরণ করিয়াছেন। জগবন্ধুবাবু ও অক্ষয় বাবুর প্রকাশিত প্রথম সংস্করণগুলি এখন আমাদের হাতে না থাকায় আমরা তাঁহাদের পৌর্বাপর্ব স্থির করিতে পারিলাম না; ভরসা করি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখক উভয়ের মধ্যে কে কাহার নিকট কি পরিমাণ ঋণী, এই জ্ঞাতব্য তত্ত্বটার নির্ণয় করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহলের পরিতৃপ্তি করিবেন। অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও পরবর্তীকালের অন্যতম বিচারপতি স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মিত্র মহাশয়ের প্রশংসনীয় গবেষণার ফলে ঐ সংস্করণে বিদ্যাপতির জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছিল। পদ-পাঠ ও পাদটীকা সম্বন্ধে তিনি প্রায় সর্বত্র অক্ষয়বাবুরই মতানুসরণ এবং ভূমিকায় উহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরেই 'হিতবাদী' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও প্রসিদ্ধ লেখক স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ভূমিকা, পাঠান্তর ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত সংস্করণটী প্রকাশিত হয়। কাব্যবিশারদ বিদ্যাপতির পদের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্যে তাঁহার পূর্ববর্তী বঙ্গীয় সম্পাদকদিগের অপেক্ষা অধিক যত্ন ও চেষ্টা করেন এবং উহারই সুফলে তিনি পূর্ব সংস্করণগুলির অনেক ভ্রম প্রমাদ দেখাইতেও সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা সত্ত্বেও তাঁহার সংস্করণে পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ে প্রায় শতাবধি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদকদিগের প্রশংসনীয় গবেষণার সুফলগুলি অনায়াসে নিজে প্রাপ্ত হইয়াও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক, অনেক স্থলেই তাঁহাদিগের ভ্রম প্রমাদগুলির উপলক্ষে তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ অসংযত

বিদ্রূপপূর্ণ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতই তাঁহার প্রাপ্য ন্যায্য যশের খর্বতা বিধান করিবে। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে কলিকাতার বঙ্গবাসী যন্ত্র হইতে ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সংস্করণটী প্রকাশিত হয়। তর্করত্ন মহাশয় দর্শন স্মৃতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও যে কাব্যশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী এ সংবাদটা বোধ হয় অনেকেই রাখেন না। যাঁহারা তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট শ্লেষপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকাবলী এবং তাঁহার কৃত 'রত্নাবলী' নাটিকার উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট তর্করত্ন মহাশয়ের কাব্য-রসজ্ঞতার অন্য পরিচয় দিতে হইবে না। কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে কৃতবিদ্য তর্করত্ন মহাশয় যে বিদ্যাপতির পদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বিদ্যাপতির কবিতার অলঙ্কারাদি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার সহিত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, তর্করত্ন মহাশয়ের বিদ্যাপতির প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ও পক্ষপাত থাকিলেও তিনি এভাবে একার্যে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল করিতেন। কেননা, বিদ্যাপতির পদাবলীর একটা প্রামাণিক সংস্করণ করিতে হইলে, সেখানে কেবল সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে অধিকারই যথেষ্ট নহে; উহার সঙ্গে সঙ্গে মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়ও বিশেষ জ্ঞান এবং বঙ্গীয় ও মৈথিল প্রাচীন হস্তলিখিত পদাবলীর পুথির বিশেষ অনুশীলনের আবশ্যক; দুঃখের বিষয়, তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার সংস্করণে এ সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতার কোনও পরিচয় দিতে পারেন নাই; তিনি উৎকট কল্পনার সাহায্যে অনেক সোজা হিন্দী ও মৈথিল শব্দের পাণ্ডিত্য-সূচক অর্থ করিতে যাইয়া অকৃতকার্যই হইয়াছেন। যাহা হউক, তথাপি আমরা তর্করত্ন মহাশয়ের এই সাধু উদ্দেশ্য ও সৎ দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আশা করি যে আমাদের দেশের অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রাচীন ভাষা কাব্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া এ ক্ষেত্রেও তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন।

সকলের শেষ ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতির সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় বাঙ্গালা ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর এই সংস্করণে

মিথিলার প্রাচীন তালপত্রের ও নেপাল রাজদরবারের পুথি হইতে বহু সংখ্যক প্রকাশিত পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন পুথি হইতে ও বিদ্যাপতির অনেক পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যবিশারদের সংস্করণের পদ সংখ্যা ১৯৯টীর স্থলে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে মোটে ৯৬৫টী পদ আছে। যদিও ইহার মধ্যে প্রায় শতাধিক পদ বিদ্যাপতির নহে, নগেন্দ্র বাবু ভ্রম বশতঃ তাঁহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি সংস্করণটী যে সমৃদ্ধ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উপর আবার নগেন্দ্রবাবু বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত ভূমিকা, অকারাদিক্রমে পদ-সূচী, পাঠান্তর ও বিস্তৃত টীকা সংযোজিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রেষ্ঠ মৈথিল পণ্ডিত কবীশ্বর চণ্ডা ঝা মহাশয়ের অধিকাংশ ভ্রম-প্রমাদগুলিরই সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন—"কবীশ্বর চণ্ডা ঝা (চন্দ্র কবি) বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে অদ্বিতীয় তত্ত্ববিৎ এবং অর্থ-পারদর্শী, ও মিথিলা ভাষায় সুকবি ছিলেন। যখন আমি পদাবলীর সম্পাদন আরম্ভ করি তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর, তথাপি তিনি অসীম উৎসাহের সহিত এই কার্যে যোগদান করেন। পদাবলী সংগ্রহ করা, কঠিন শব্দাদির অর্থ প্রভৃতি সকলই তিনি করেন। বিদ্যাপতির ভাষায় তিনি আমার শিক্ষাগুরু।" এরূপ অবস্থায় নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণটী যে পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি হইতে অনেক পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট তাহা সহজেই অনুমেয় বটে। কিন্তু বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিল ভাষার উপর আধুনিক শ্রেষ্ঠ মৈথিল পণ্ডিতেরও প্রভুত্ব খাটেনা বলিয়াই হউক, কিংবা ভাগের কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার সম্বন্ধে কতকগুলি স্বাভাবিক অন্তরায় থাকার জন্যেই হউক স্বর্গীয় চণ্ডা ঝা মহাশয়ের এরূপ সাহায্যলাভ সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সংস্করণখানায়ও এত অধিক ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে যে, বিদ্যাপতির আর একখানা প্রামাণিক সংস্করণের নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে। সেইরূপ সংস্করণ প্রকাশিত করার উপযুক্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও গবেষণা বর্তমানে কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। যে দেশে এরূপ একটী সুবৃহৎ আকারের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বহির প্রকৃত মূল্যে ঐ বহিখানি বিক্রয় করিয়াও নিঃশেষ করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রায় ১৬ বৎসর কাল গত হইয়াছে; এবং যেখানে উক্ত পরিষৎ অর্থাভাবে মুদ্রিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রাঙ্কন তো দূরের কথা, বহুদিন ধরিয়া

প্রারব্ধ নূতন গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনই শেষ করিতে পারিতেছেন না, সেখানে অন্য প্রকারে সামর্থ্য থাকিলেও কেবল অর্থভাবেই এরূপ ব্যয়সাধ্য কার্যে কেহ অগ্রসর হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবী করি না। চণ্ডা ঝা ও গ্রিয়ারসনের মত বিশেষজ্ঞ এবং নগেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও যখন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, তখন আরও গবেষণা এবং আরও অনুশীলন ব্যতীত এখন আবার বিদ্যাপতির আর একটা নূতন সংস্করণ করার প্রয়াস আমরা বাতুলতা বলিয়াই মনে করি। তথাপি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল যাবত অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদাবলীর সহিত আমরা সযত্নে বিদ্যাপতির পদাবলী অনুশীলন করিয়া আসিতেছি বলিয়া, আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনার ফলে নগেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণটীতে যে সকল ত্রুটী ও ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিয়াছি, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠকদিগের হিতার্থে উহা প্রকাশ করিলে, আমাদিগের মন্তব্য যদি প্রকৃত হয়, তাহা পাঠকবর্গের উপকারে আসিবে, আর যদি আমাদিগের মন্তব্য ভ্রমাত্মক হয়, তাহা হইলে সেই ভ্রম হইতেও ভবিষ্যত-সমালোচক সতর্কতা শিক্ষা করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই আমরা বিশেষ কুণ্ঠিতচিত্তে অন্যের ত্রুটী ও ভ্রমের আলোচনারূপ অপ্রীতিকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ সুবৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই আমরা তাঁহার সংস্করণ অবলম্বনেই বিদ্যাপতির আলোচনা করিব।

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণেরই প্রায় সমকালে বিহারের অন্তর্গত আরা জেলার নাগরী প্রচারিণী সভা দ্বারা আরানিবাসী বাবু ব্রজনন্দন সহায় (ব্রজবল্লভ) কর্তৃক সম্পাদিত 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি' নামক একখানা নাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণের অধিকাংশ পদই বঙ্গীয় সংস্করণগুলি হইতে গৃহীত হইয়া থাকিলেও সম্পাদক মহাশয় বিদ্যাপতির পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং প্রয়োজনীয় স্থলে আমরা এই নাগরী সংস্করণ ও বহু স্থলেই গ্রিয়ারসন মহোদয়ের পূর্বোক্ত "Maithili Chrestomathy" নামক গ্রন্থের লিখিত পাঠ ও অর্থের উল্লেখ ও আলোচনা করিতে বাধ্য হইব।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পূর্ববর্তী সম্পাদক দিগের প্রতি তিনি যে কোন তীব্র ও অসংগত মন্তব্য না করিয়া, সমীচীনতার পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমরা তাঁহার সংস্করণের নানা গুণের সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া প্রয়োজনবশতঃ

এখানে কেবল তাঁহার ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদগুলিই প্রদর্শিত করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগেরও এ বিষয়ে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, সেরূপ ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করিলে নগেন্দ্রবাবু কিংবা অপর কেহ অনুগ্রহপূর্বক উহা প্রদর্শন করিলে, আমরা অসঙ্কোচে আমাদের ভ্রম প্রমাদ স্বীকার করিয়া লইব। আর যদি আমাদিগের প্রদর্শিত ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদগুলি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করি, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠক ও ভবিষ্যতে সম্পাদকগণ সেই ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদগুলি স্বীকার করিয়া গুণিজন-সুলভ গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পদ-বিন্যাসে ত্রুটি

অলঙ্কারশাস্ত্রের সনাতন নিয়ম "আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা। "ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্ত্তনম্॥" অর্থাৎ কাব্যরচনা করিতে যাইয়া, প্রথমেই দেবতার বন্দনা, দেবতার আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা কিংবা বর্ণনীয় বস্তুর উল্লেখ দ্বারা কাব্য আরম্ভ করিতে হইবে। ক্বচিৎ কোন কোন কবি এসকলের পরিবর্তে দুর্জনের নিন্দা কিংবা সজ্জনের প্রশংসা দ্বারাও কাব্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরবর্তী বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্তারা সকলেই পদাবলীর পালা করিতে যাইয়া প্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ দিয়াছেন। বিদ্যাপতি শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবি সুতরাং তাঁহার কাব্যে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা থাকা অসম্ভব। তিনি বৈষ্ণব হইলে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা থাকা সম্ভব ছিল; কিন্তু জানা গিয়াছে যে, তিনি শৈব বা শাক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত শিব ও পার্ব্বতীর বন্দনা কয়েকটী পাওয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে ঐ পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীর সম্পাদকেরা কোন্ পদ দিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া খুব গোলে পড়িয়ছেন। 'মহাজন-পদাবলী'-সম্পাদক জগবন্ধুবাবু শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর বর্ণিত "শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল" ইত্যাদি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু ও সারদা বাবুও তাহাই করিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেরূপ না করিয়া, "গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদ প্রথমে দিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে "বন্দনা" নাম দিয়া দূতীর উক্তি একটা মৈথিল পদ ও 'রাধা-বন্দনা" নামে "দেখ দেখ রাধা রূপ অপার" ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র ১৪৭১

সংখ্যক পদটি প্রথমে দিয়া, তারপরে "বয়ঃসন্ধি" বিষয়ক পদগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত মৈথিল পদটী এই যথা—

(১)

(দূতীর উক্তি)

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তরে
ধিরে ধিরে মুরলি বলাব।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব ॥২।
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি ॥৩।
জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকে অবইতে জাইতে
জনি জনি পুছ বনমারি ॥৫।
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন শুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর যৌবতি
বন্দহ নন্দ কিসোরা ॥৭।

বলা বাহুল্য যে, এই পদটীও বয়ঃসন্ধির পদের মত শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতীর উক্তি। আগে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-সঞ্চারের বর্ণনা না দিলে তাঁহার দ্বারা আপ্ত-দূতীর প্রেরণ বা আপ্ত-দূতীর এসকল উক্তির তাৎপর্য কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না; সুতরাং এই "নন্দক নন্দন" ইত্যাদি পদ দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করা কোনমতেই সঙ্গত বলা যাইতে পারে না। কবি ভণিতায় দূতীর পক্ষ হইয়া শ্রীরাধাকে "বন্দহ নন্দ কিসোরা" বলাতেই ইহাকে বন্দনার পদ বলা যায় না। কবির ঐ কথার অর্থ—"শ্রীরাধে! তুমি বুদ্ধিমতী, মধুসূদনও বুদ্ধিমান; তোমাদের দুইজনের সংযোগ বেশ উপযুক্ত হইবে— তাই বলি, তুমি নন্দকিশোরকে ভজ।" 'পদকল্পতরু'র ২৪৭১ সংখ্যক "দেখ দেখ রাধা-রূপ অপার" ইত্যাদি পদটী কোন একজন অজ্ঞাত পদকর্তার পদ। উপযুক্ত মঙ্গলাচরণ-পদের অভাবে কবির বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার রূপবর্ণনার পদের দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিলে, উহা অবশ্যই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু বিদ্যাপতির সংস্করণে অন্য কবির রচিত

এরূপ রূপবর্ণনার পদ দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। নগেন্দ্রবাবু ভণিতাহীন অনেক পদই অকারণে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ভণিতা-হীন পদটিও তিনি বিদ্যাপতির বলিয়া অনুমান করেন কি? সেরূপ করিলে উহার অনুকূল যুক্তি দেখাইয়া সেকথা স্পষ্ট বলা উচিত ছিল।

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে জগবন্ধুবাবু অক্ষয়বাবু ও সারদাবাবু যে আপ্ত দূতীর উক্তি বয়ঃসন্ধির পদ দ্বারা পালা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। কাব্যবিশারদ মহাশয় বোধহয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই "গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ দ্বারা পালা আরম্ভ করিয়াছেন, আপাততঃ ইহা অসঙ্গত মনে না হইলেও, ইহাও যে প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রকারগণের মতবিরুদ্ধ ও সহৃদয়দিগের প্রীতিকর নহে, — শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদ দ্বারাই পালা আরম্ভ করা উচিত ছিল, ইহা না বলিলে চলে না। এ সম্বন্ধে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম কি, এবং ঐ নিয়মের অনুকূলেই বা কি যুক্তি আছে, এখানে আমাদিগকে উহার একটু আলোচনা করিতে হইবে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে উক্ত আছে—"আদৌ বাচ্যস্ত্রিয়া রাগঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ" অর্থাৎ আদৌ নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণিত করিয়া পরে সেই নায়িকার অনুরাগ চিহ্ন দর্শনে সঞ্জাত নায়কের পূর্বরাগের বর্ণনা করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম কেন করা হইল, সে সম্বন্ধে অলঙ্কারশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। একজন রসশাস্ত্রকার শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগই পূর্বে জন্মিয়াছিল, ইহা বলিলে যদিও কিছু অসম্ভব বলা হয় না, কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদিগের পূর্বরাগ আগে বর্ণিত করিলেই, তাহা অধিক চমৎকার হইয়া থাকে। এখানেও এইরূপ বলার তাৎপর্য সুগম নহে। 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের প্রণেতা ভানু দত্ত উজ্জ্বল রসের আলম্বন বিভাব অর্থাৎ আশ্রয় নায়ক-নায়িকার প্রকার ভেদের বর্ণনা করিতে যাইয়া, আগে নায়িকারই বিবরণ দিয়াছেন; তাঁহার উক্তি — "তত্র রসেষু শৃঙ্গারস্যা ভ্যর্হিতত্বের তদালম্বন-বিভাবত্বেন নায়িকা তাবৎ নিরূপাতে।" প্রসিদ্ধ টীকাকার নাগেশ ভট্ট শৃঙ্গার রসের "অভ্যর্হিতত্ব" অর্থাৎ সমধিক আদরের কারণ লিখিয়াছেন— "পুরুষোত্তমাশ্রয়ত্বাৎ কৃষ্ণদৈবত্যাচ্চ"; অর্থাৎ

যেহেতু শৃঙ্গার রসের আশ্রয় ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, সেই পুরুষোত্তমের যে শৃঙ্গার রস উহার আবার আশ্রয় নায়িকা; সুতরাং নায়িকাই আগে বর্ণনীয় বটে। "পুরুষোত্তম" শব্দটী এখানে উপলক্ষ মাত্র; সুতরাং এই যুক্তি অনুসারে সাধারণ নায়ক নায়িকার পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য বটে। নাগেশ ভট্টের প্রদর্শিত এ যুক্তিটী নব্য যুক্তিবাদী না মানিতে পারেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার অর্ধাঙ্গিনীকে প্রতীচ্য নজির অনুসারে Better half অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর অর্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অগ্রগণ্য না করিলে হাল ফ্যাসনমতে অসভ্যতারই পরিচয় দেওয়া হইবে; সুতরাং নায়িকার প্রাধান্য সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রাচীন ও নব্য মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকায় আমাদের বোধ হয় বাগ্‌বাহুল্য না করিলেও চলিবে। তবে তর্ক হইতে পারে যে প্রতীচ্য সভা সমাজে নায়িকারা নানাকারণে নায়কদিগের অপেক্ষা অধিক সম্মানর্হ হইলেও প্রতীচ্য সাহিত্যে সর্বত্রই নায়িকার পূর্বরাগ আগে বর্ণিত হওয়ার নিয়ম নাই— প্রতীচ্য সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেও ঐ মামুলী নিয়মটী উঠিয়া যাইতেছে; সুতরাং এখানে প্রতীচ্যের দৃষ্টান্ত খাটে না; ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকার পূর্বরাগ কেন পূর্বে বর্ণনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহার প্রকৃত সমাজতত্ত্ব-অনুযায়ী কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

বস্তুতঃ নায়িকার পূর্বরাগই যে প্রথমে ঘটিবে, এমন কোন কথা নাই; প্রণয়ের দেবতাটি প্রথমে যাহার স্কন্ধে ভর করিবেন, তাহাকেই তাঁহার বাধ্য হইতে হইবে। এ অবস্থায় এ রকম একটা অযৌক্তিক বাঁধা নিয়ম করিয়া ফল কি—এ কথা আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক বটে। তথাপি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই নিয়ম শুধু কাল্পনিক নহে; ইহার মূলে একটা সত্য নিহিত আছে। আজকালের কাব্যে আমরা তথাকথিত অশ্লীলতা কম দেখিতে পাইলেও, তাহাতে অধিকতর দুর্নীতির পোষক পরকীয়া প্রেমের নিতান্তই ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আলঙ্কারিকগণ কাব্যে পরকীয়া প্রেমের বর্ণনা "রসাভাস" সুতরাং সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বর্জনীয় বলিয়া গিয়াছেন। নিখিল সাহিত্যে কেবল ব্রজাঙ্গনাদিগের পক্ষেই এ কথা খাটে না; কেন না, তাঁহারা দ্রষ্টব্যে পরকীয়া হইলেও অন্ততঃ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ব্যতীত

আর কিছুই নহেন। শুধু প্রেমলীলার রসপুষ্টির জন্য তাঁহারা স্বকীয়া হইয়াও যোগমায়ার প্রভাবে আপনাদিগকে পরকীয়া মনে করিয়াছেন মাত্র। আমাদের ভারতীয় হিন্দু সমাজে কারণবশতঃ বহুপত্নীত্ব দূষনীয় বিবেচিত হয় নাই, কিন্তু পরকীয়ার প্রতি অনুরাগ সর্বদাই অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমাদিগের নায়িকারা সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ-চরিত্রে গঠিত।

তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কোন নায়কের প্রতি অনুরক্তা হইয়া, অনুরাগের চিহ্ন বাহ্যে প্রকাশ করিলে তিনি যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সেই নায়কের ধর্মপত্নী হওয়ার যোগ্য—এইরূপ অনুমান করিয়া এ নায়কও তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলে উহাতে কোন দোষ বা রসাভাসের কারণ ঘটে না; কিন্তু প্রথম দর্শনমাত্রেই যদি নায়ক অনুরক্ত হইয়া পড়ে ও পরে জানা যায় যে, তাহার অনুরাগের পাত্রী তাহার ধর্মপত্নী হওয়ার অযোগ্যা অনূঢ়া কিংবা পরকীয়া বটে, তাহা হইলে সহৃদয়গণের নিতান্ত অপ্রীতিকর রসাভাস দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠে। বস্তুতঃ জগতে সেরূপ নিন্দিত নায়ক বা নায়িকার অভাব না থাকিলেও, আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান অনুসারে, তাহাদের চরিত্র সৎকাব্যে সুকবিদিগের দ্বারা বর্ণনীয় নহে। এজন্যই পাছে সেইরূপ কোন রসাভাসের আশঙ্কা না ঘটে, সেজন্যই আলঙ্কারিকেরা "আদৌ বাচ্য-স্ত্রিয়া রাগঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ" এই সমীচীন নিয়মটী বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এজন্য বা অন্য যে কারণেই ঐ নিয়ম হইয়া থাকুক না কেন, সংস্কৃত কবিরা ও তাঁহাদিগের অনুসরণে বৈষ্ণব পদকর্তারা প্রথমে শ্রীরাধা প্রভৃতির পূর্বরাগই বর্ণিত ও পদাবলী গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক পদ-সংগ্রহে তাই আমরা প্রথমে শ্রীরাধার পূর্ব-রাগের পদাবলীই দেখিতে পাই। আমাদের বিবেচনায় বিদ্যাপতির পূর্বোক্ত সংস্করণগুলিতেও সেই সমীচীন প্রথা অনুসারে শ্রীরাধার পূর্বরাগের "কি কহব হে সখি কানুক রূপ" ইত্যাদি পদগুলিই প্রথমে সন্নিবেশিত করা কর্তব্য ছিল; তাহা না করায় রসের স্বাভাবিক পর্যায় ও আস্বাদনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

(১ সংখ্যক পদ)

এখন আমরা নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত ১ সংখ্যক পদের পাঠ-বিচারে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমেই বক্তব্য যে, এই পদটী বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই; নগেন্দ্রবাবু 'রাগ-তরঙ্গিণী' নামক মিথিলার একখানা অমুদ্রিত পদাবলীর পুথি হইতে

সংগৃহীত করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশের পুথিতে বাঙ্গালী লিপিকরদিগের অজ্ঞতাহেতু নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে। এই ধারণায় তিনি 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থের পদাবলীর পাঠ কোথাও মৈথিল পুথির নজিরে, কোথাও বা শুধু নিজের কল্পনার বলে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সে সকল অসংখ্য সংশোধন ও পরিবর্তন কতদূর প্রামাণিক ও সঙ্গত আমরা ক্রমে উহার আলোচনা করিব। নগেন্দ্রবাবুর এই ১ সংখ্যক পদটী এ যাবৎ মৈথিল হস্তলিপির গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা করায় ইহা ও এই জাতীয় অন্যান্য মৈথিল পদগুলি পাঠক বিশেষ মন দিয়া পাঠ করিবেন; কেননা, উহা হইতে বিদ্যাপতির খাঁটি রচনার অনেক নমুনা পাওয়া যাইবে।

নগেন্দ্রবাবু তাই পদের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাটিয়াল বরাড়ী ছন্দ। ২৫ হইতে ২৭ মাত্রা।" "ভাটিয়াল" ও "বরাড়ী" দুইটী প্রসিদ্ধ রাগিণী; উহাদের মিশ্রণে "ভাটিয়াল-বরাড়ী" মিশ্র-রাগিণীর সৃষ্টি হইতে পারে ইহাই আমাদের জানা ছিল; উহা যে একটা ছন্দেরও নাম হইতে পারে আমরা এই প্রথম শুনিলাম। ছন্দটা আবার একরকম স্বাধীন, কেন না উহার মাত্রার কোন ঠিকানা নিশ্চিত নাই; ২৫ মাত্রা হইতে ২৭ মাত্রা পর্যন্ত সবরকমই হইতে পারে। আমাদিগের কিন্তু বিশ্বাস যে, নগেন্দ্রবাবু নিজের জ্ঞান অনুসারে এ তথ্যটা লিখেন নাই। যে সকল মৈথিল পণ্ডিতদিগের ছন্দোজ্ঞানের সাহায্য লইতে যাইয়া স্যার গ্রীয়ারসন মহোদয়কে হতাশ হইয়া স্বাবলম্বনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, ইহা বোধহয় তাঁহাদিগের মত কোন পণ্ডিতের বিদ্যার পরিচয় বটে। যাঁহাদিগের বিদ্যাপতির পদাবলীর ছন্দে একটু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা মৈথিল ভাষার অনুযায়ী অক্ষরের লঘু-গুরু মাত্রা-অনুসারে এই পদের কলিগুলির মাত্রাবিভাগ (scanning) করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ৩ সংখ্যক ধুয়ার কলিটী ছাড়া উহার অন্যান্য সমস্ত অর্ধ কলিতেই

৪+৪+৪+৪

৪+৪+৪ = ২৮ মাত্রা

রহিয়াছে; ইহাকে মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দ বলা হয়; জয়দেবের গীতগোবিন্দের "ললিত-লবঙ্গ-লতা" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিগণের ব্রজবুলি পদে এই ২৮ মাত্রার ত্রিপদী ছন্দের শত শত দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কৃত

২৮ মাত্রার ত্রিপদী হইতে এই ত্রিপদীর পার্থক্য শুধু এই যে, সংস্কৃতে "আ" "ঈ" "ঊ" "এ" "ঐ" প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরগুলি এবং সংযুক্তবর্ণের আগের অক্ষর ও অনুস্বার-বিসর্গ-যুক্ত অক্ষর সর্বদা গুরু গণ্য হয়; কিন্তু মৈথিল ও ব্রজবুলিতে সেগুলি প্রয়োজনমত ক্বচিৎ লঘু গণ্য করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে প্রথম কলিটীই ধরা যাউক। এই কলির প্রথমার্ধের অক্ষরগুলির মধ্যে সংস্কৃত ছন্দোশাস্ত্রের নিয়মমতে "কদম্বেরি" শব্দের "দ" ও "ম্বে" ও "তরে" শব্দের "রে" গুরু অর্থাৎ দুই মাত্রা পরিমিত হইলেও এখানে ঐ সকল অক্ষর এবং ২য় চরণের "রে" "রে" অক্ষর দুইটিকেও লঘু ধরিতে হইবে; সুতরাং ঐ দুই চরণে

২১ ১।২১১।১১১১। ১১১১।

১১১১।১১১১।২২ = ২৮ মাত্রা

ঠিক পাওয়া যাইতেছে। ধুয়ার কলিটী শুধু এ নিয়মের বহির্ভূত বটে, উহাতে—

৪+৪+৪

৪+৪+৪=২৪ মাত্রা

আছে; "সামরী" শব্দের "রী" লঘু ও "লাগি" শব্দের "গি" ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ উচ্চারণ করা আবশ্যক সুতরাং যথাক্রমে "রি" ও "গী" লেখাই উচিত ছিল। লিপিকরের অনভিজ্ঞতায় সেরূপ লিখিত হয় নাই।

এইরূপ ছন্দের ও নামের মাত্রা-পরিমাণ-নির্দেশের ভুল অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে। আমরা যথাস্থলে উহার আলোচনা করিব। তাম্রশাসন বা শিলালেখের সন্দিগ্ধ পাঠের ন্যায় প্রাচীন হস্তলিপি পুথির সন্দিগ্ধ পাঠ-নির্ণয়েও ছন্দের পরিজ্ঞান অনেক স্থলেই যথেষ্ট কাজে লাগিয়া থাকে; এজন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই বিদ্যাপতির ছন্দ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবেই আলোচনা করিতে হইবে।

যদিও আমরা মৈথিল হস্তলিপি পুথি দেখি নাই, কিন্তু পূর্ব-প্রদর্শিত ছন্দের আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি যে উদ্ধৃত পদের "জমুনাক" স্থলে শুদ্ধ পাঠ "যমুনক" বা "জমুনক্" হইবে। শব্দের আদ্যে "য"-কারের উচ্চারণ হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় "জ"-কারের মত, সুতরাং "যমুনক" বা "জমুনক" উভয় শব্দের উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। সেইরূপ ৯ ছত্রের "বিকে" স্থলে "বীকে" শুদ্ধ পাঠ হইবে; "বীকে" চারি মাত্রার শব্দ না ধরিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। "বীকে"—"বিক্রী" শব্দের অপভ্রংশ; সংযুক্ত

"ক্র" অক্ষরের লোপে পূর্ব "বি" অক্ষর গুরু হওয়া ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী বটে। বিদ্যাপতিতে অনেক "বীক" ও "বীকে" পাওয়া যায়; যথা ঃ

কেও দে হাস সুধা সম নীক।
জইসন পরহোঁক তইসন বীক॥

(নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ ১২৯ সং পদ)

নগেন্দ্রবাবু "বীকে" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"বিক্রয় করিতে"। ভাবার্থ হইলেও শব্দার্থ তাহা নহে; সংস্কৃত "বিক্রয়" হইতে অপভ্রংশ "বিক্রী", "বীকি" ও "বীক" শব্দগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। "বীক" বা "বীকি" শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির "এ" যোগে "বীকে" হইয়াছে, উহার অর্থ—বিক্রয়ে বা বিক্রীতে; "বীকে" কৃদন্ত পদ নহে—উহা সুবন্ত পদ।

নগেন্দ্রবাবু "জনি জনি" শব্দের টীকা করিয়াছেন—"জনি জনি"—প্রত্যেক রমণী। (পুং জন—পুরুষ; স্ত্রী জনি—রমণী)। যদিও সংস্কৃত অভিধানে স্ত্রী অর্থে "জান" ও "জনী" শব্দ দেখা যায়, কিন্তু হিন্দী বা বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় ঐ অর্থে "জনি" শব্দের প্রয়োগ নাই। এখানে "জনি জনি" শব্দের অর্থ জনে জনে অর্থাৎ বনমালী জনে জনের কাছে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। "জনি" শব্দের এরূপ একটা অপ্রচলিত অর্থ স্বীকার প্রয়োজন কি?

(২য় সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২ সংখ্যার পদের তৃতীয় কলিটি এইরূপ, যথা—

কত কত লখিমী চরণতলে নেউছয়
রঙ্গিনী হেরি বিভোরি।
করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ
অহোনিশ কোরে অগোরি॥

উহার প্রকৃত পাঠ 'পদকল্পতরু'তে আছে —

কত শত লখমী চরণতলে নীছয়ে
কত সুর-রঙ্গিনি হেরি বিভোরি।
করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ
সেবনি অহনিশ কোরে আগোরি॥

নগেন্দ্রবাবু বোধহয় "নীছয়ে" শব্দটি মৈথিল নহে মনে করিয়াই —উহার একটা কাল্পনিক মৈথিল রূপ "নেউছয়" বসাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ইহা মৈথিল বিদ্যাপতির পদ নহে; বাঙ্গালী কবির ব্রজবুলি পদ বটে। ব্রজবুলিতে "নিছয়ে" বা "নীছয়ে" শব্দের অসংখ্য প্রয়োগ আছে, সুতরাং উহা অশুদ্ধ মনে করার কোন কারণ নাই। তারপরে তিনি যে "কত সুর-রঙ্গিনি" স্থলে শুধু 'রঙ্গিনি' পাঠ ধরিয়াছেন এবং অন্ত্য চরণের "সেবনি" শব্দটি পরিত্যাগ করিয়াছেন—সেরূপ পাঠ 'পদকল্পতরু'র কোন সংস্করণ বা হস্তলিপি পুথিতেই পাওয়া যায় না। সেরূপ পাঠ ভাল অর্থ করা যায় না; কেননা কত শত লক্ষ্মী শ্রীরাধার চরণতলে নির্মঞ্ছন অর্থাৎ নিছনিরূপে থাকে, ইহা বলিয়া, পরে রঙ্গিনী (বিলাসিনী) উহা দেখিয়া বিভোর হয় বলিলে— অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে "পতৎ-প্রকর্ষ" নামক রচনার দোষ ঘটে। "কত সুর-রঙ্গিনি" বাক্যের দ্বারা শচী, শিবানী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সুরনারীগণ ব্যঞ্জিত হওয়ায় ভাবের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে। অন্ত্য চরণে "সেবনি" অর্থাৎ সেবন শব্দটি না থাকিলে বাক্যের শুদ্ধ অন্বয়ই হয় না। নগেন্দ্রবাবু উহার ভাবার্থ লিখিয়াছেন — "মনে অভিলাষ (হয়) পদপঙ্কজ অহর্নিশ কোলে আগলাইয়া রাখি।" উহার প্রকৃত অর্থ — (পূর্বোক্ত সুরাঙ্গনারা) দিবারাত্র ক্রোড়ে আগলাইয়া (শ্রীরাধার) পাদপদ্মের সেবা অভিলাষ করেন!

এই পদের দ্বিতীয় কলিতে ১ সংখ্যক পদের মত ২৮ মাত্রা আছে, কিন্তু তৃতীয় কলিতে তৎস্থলে ৪+৪+৪+৪

৪+৪+৪+৪ = ৩২ মাত্রা

দৃষ্ট হয়; একটি পদেরই বিভিন্ন কলিতে এরূপ মাত্রার বৈষম্য থাকা অসম্ভব বিবেচনায়ই বোধহয় নগেন্দ্রবাবু তৃতীয় কলিটীকে ঐরূপে ছাঁটিয়া দিয়া মাত্রা বজায় রাখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শুধু ইহাই বক্তব্য যে, বিনা-নজিরে এভাবে পাঠ-পরিবর্তন সম্পাদকের পক্ষে অতি গর্হিত কার্য। নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সন্তোষের জন্যে আমরা বৈষ্ণব কবির পদাবলী হইতে এইরূপ ছন্দের বৈষম্য বা বৈচিত্র্যের দুইটি উদাহরণ দেখাইয়াই আমাদের আজিকার বক্তব্য শেষ করিব।

কি হেরিলুঁ নাগর নবিন কিশোর।
শারদ-শশধর বয়ন মনোহর
রঙ্গিনি-নয়নহি লুবধ চকোর॥
নীলেন্দীবর সুন্দর লোচন
অঞ্জন-অরুণ তরুণি-চিত-চোর।

মাণিক অধর মনোহর বংশী
রসের তরঙ্গিম মোহিত মোর ॥
অমিয়া বচন শ্রবণ-অনুরঞ্জন
গঞ্জন-নীরদ-ভাস ॥
এক আর অনুপম জগ-মনমোহন
হাসি যেন বিজুরি প্রকাশ ॥

বসন্ত রায় ('পদকল্পতরু' ২৪৪৬ সংখ্যক)

নব-ঘন-পুঞ্জ-পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা
পীত বসন জনু বিজুরি বিরাজিত
তাহে কুলবতি-চাতক-মন-লোভা ॥

ধরণী ('পদকল্পতরু' ২৪৫৪ সংখ্যক)

বসন্ত রায়ের পদের দ্বিতীয় কলির অর্ধাংশে ৩২ মাত্রা ও তৃতীয় কলির অর্ধাংশে ২৮ মাত্রা আছে। ধরণীর উদ্ধৃত কলিটির প্রথমার্ধে ২৮ মাত্রা ও দ্বিতীয়ার্ধে ৩২ মাত্রা আছে। খুঁজিলে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক মিলিবে। ইহাকে ছন্দোপতন না বলিয়া ছন্দোবৈচিত্র্যের উদাহরণ মনে করাই সঙ্গত। কেননা—ছন্দোপতনে অভিজ্ঞ পাঠকের যেরূপ বৈরস্য জন্মে, ইহাতে সেরূপ হয় না; তথাপি ইহা পরিহার্য বটে; ভাল কবির রচনায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বসন্ত রায় শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও, তিনি ভাবের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখায়ই ছন্দের আদ্যোপান্তের সমতা রক্ষিত হয় নাই, বলিতে হইবে।

(৫ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩য় ও ৪র্থ পদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

তাঁহার ৫ম পদটী 'পদকল্পতরু' হইতে উদ্ধৃত হইলেও উহাতে অনেক পাঠাশুদ্ধি ও তজ্জনিত অর্থের ব্যতিক্রম দেখা যায়; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা প্রামাণিক পাঠানুযায়ী পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত অশুদ্ধ পাঠগুলির বিচার করিব।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥
মদন কি ভাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেখয়ল ভিন অধিকার ॥

কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহ্নকে নেল॥
চয়ন চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥
নব কবিশেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥

(সা-প, 'পদকল্পতরু' ১০৬ সং)

নগেন্দ্রবাবু "মদনকি তাব" স্থলে "মদনক ভাব" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের আলোচিত 'পদকল্পতরু'র ক, খ, গ, ঘ ও চ—এই পাঁচখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি এবং 'পদরত্নাকর' ও 'পদরসসার' পুথির মধ্যে কোথায়ও "মদনক ভাব" পাঠ নাই, ক ও গ পুথিতে "মদনকি তার", খ ও গ পুথিতে "মদনকিতাব" ঘ পুথিতে "পদন কিতাবত", প-র পুথিতে "মদনকি ভাব" এবং প-র-সা পুথিতে "মদনকি রাজ" পাঠ আছে। বস্তুতঃ "মদনের রাজত্ব প্রথম প্রচার হইল" পংক্তিটীর যে ইহাই একমাত্র অর্থ তাহাতে মতভেদ নাই। হিন্দী ও মৈথিলী ভাষায় "রাজত্ব" অর্থে "রাজ" শব্দের বহুলব্যবহার আছে; সুতরাং প-র-সা পুথির পাঠ গ্রহণ করিলে কোনই গোলযোগ থাকে না; কিন্তু 'পদকল্পতরু'র পাঠের প্রামাণিকতার বিচারে 'পদরসসারে'র প্রমাণ অগ্রগণ্য হইতে পারে না। উহার "মদনকি রাজ" পাঠ পরবর্তী সংশোধন মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে; সুতরাং উহার ঐ পাঠ সুন্দর হইলেও আমরা উহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। "রাজ" বলিলে যে সঙ্গত অর্থ হয় "ভাব" বলিলে তাহা হয় না; সুতরাং 'পদরত্নাকর' ও তদনুযায়ী নগেন্দ্রবাবুর পাঠ যে অপ্রামাণিক অধিকন্তু অসঙ্গত তাহা না বলিয়া পারা যায় না। আমাদের আলোচিত খ পুথির "ত" ও "র" অক্ষর যথাক্রমে "ভ" ও "ব" বলিয়া পঠিত হইতে পারে; কেননা, উহাতে অনেক স্থলেই "ভ" ও "ত" অক্ষরে প্রভেদ দুর্লক্ষ্য এবং "র" অক্ষরের পরিবর্তে কেবল পেটকাটা "র" নহে, অনেক স্থলেই শূন্যহীন "র" ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং খ পুথির "মদন কিতাব" পাঠই ক, গ প্রভৃতি পুথিতে পাঠোদ্ধারের ভুলে "মদনকি তার" পঠিত ও লিখিত হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, "মদনকি তার" পাঠের কোনও সঙ্গত অর্থ হয়

না। এখন বাকি রহিল খ, ঘ ও চ পুথির পাঠ-বিচার। আমরা প্রায় দশ বৎসর পূর্বে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণের পাঠ-বিচারে "কিতাব" বা "কিতাবত" পারশী শব্দ ও উহার অর্থ কার্যকাল অর্থাৎ অধিকার (incumbency) মনে করিয়া সেইরূপ অর্থ লিখিয়াছি; কিন্তু এরূপ পাঠ ও অর্থই সুসঙ্গত কিনা সে সম্বন্ধে পরে আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমাদিগের প্রাপ্ত ও আলোচিত সকলগুলি পুথির মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের খ পুথি ও মুরশিদাবাদের ঘ পুথি অধিক প্রাচীন ও শুদ্ধ বটে; যখন খ, ঘ ও চ—তিনখানি পুথিতেই প্রায় একরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে, তখন "মদনকিতাব"ই যে প্রামাণিক ও সঙ্গত পাঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে পদচ্ছেদ কিরূপ হইবে, অর্থাৎ "মদন-কিতাব" অথবা "মদনকি তাব" শুদ্ধ পাঠ, তাহাই চিন্তনীয় বটে; আমাদের মনে হইতেছে যে, "মদনকি তাব"ই অধিকতর সঙ্গত। আরবী "কিতাব" বা "কিতাবত" শব্দ হইতে অধিকার বা রাজত্ব অর্থ করিতে হইলে, একটু টানিয়া করিতে হয়; কেননা কোন কর্মচারীর কিতাবত যেমন বলা যায়, সেভাবে রাজার কিতাবত বা রাজার কিতাব শব্দের ব্যবহার আছে কিংবা ছিল বলিয়া জানা যায় নাই, কিন্তু "মদনকি তাব" পাঠ করিলে অর্থে সেরূপ কোন সন্দেহ থাকে না। আরবী "তাবে" বা "তাব" শব্দের অর্থ অধীনতা, বাঙ্গালায় ও হিন্দিতে "তাবে" "তাবেদার" প্রভৃত শব্দের খুব প্রচলন আছে, যেমন "মহারাজের তাবে আমরা পরম সুখে আছি" "আমি মহারাজের তাবেদার" ইত্যাদি। সুতরাং "মদনকি তাব পাহিল পরচার" এই বাক্যের অর্থ, মদনের অধীনতা প্রথম প্রচারিত হইল। নগেন্দ্র বাবু "দেয়ল" ও "কটিকে" শব্দের স্থলে যথাক্রমে "দেল" ও "কটিক" পাঠ করিয়াছেন। উভয় পাঠেই ছন্দোপতন অনিবার্য।

নগেন্দ্রবাবু "ইন্‌কে" ও "উন্‌হি" স্থলে যথাক্রমে "একক" ও "অওকে" পাঠ ধরিয়াছেন; উভয় পাঠই অপ্রামাণিক ও হিন্দী মৈথিলী ভাষায় অপ্রযুক্ত বটে। মৈথিলীতে "অওকে" অর্থাৎ "অব্‌কে" শব্দ "এখানকার" অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা—

বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥

(সা-প সং ১৩৪ সং)

•এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, "অব্‌কে" স্থলে 'গীত-চিন্তামণি'তে "আজুক" পাঠ আছে; নগেন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে

"আজুক" পাঠই লইয়াছেন। 'পদকল্পতরু'র সকল পুথিতেই "অব্‌কে" পাঠ আছে; উহা স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয়েরও অনুমোদিত। সখী-স্থানীয় বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে অবিলম্বে অভিসারের জন্য অনুরোধ না করিয়া অনিশ্চিত সময়বাচক "আজুক" শব্দ ব্যবহার করিবেন, ইহা তাদৃশ সঙ্গত মনে হয় না; সে যাহা হউক, "অব্‌কে" শব্দের অর্থ "এখানকার" না হইয়া উহার অর্থ — "অপরে (কটি)" হইতে পারে না।

"বরণ" শব্দের স্থলে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত "উরজ" পাঠও আমরা কোন পুথিতে পাই নাই; 'পদরত্নাকর' ও 'কীর্ত্তনানন্দ' পুথিতে "বক্ষক" পাঠ আছে; "বক্ষ" ও "উরজ" এখানে সমানার্থক; নগেন্দ্রবাবু কোন পুথিতে "উরজ" পাঠ পাইয়া থাকিলেও, আমরা ঐ পাঠ এস্থলে সঙ্গত বোধ করি না; 'পদকল্পতরু'র ও 'পদরসসারে'র "বরণ" পাঠই সমীচীন মনে হয়, কেননা নায়িকার বয়ঃসন্ধি অবস্থায় "উরজ" অর্থাৎ স্তন শুধু "মুকুলিত" বা "অঙ্কুরিত" হইতে আরম্ভ করে; বিদ্যাপতিও সেজন্যই "হৃদয়জ মুকুলিত" (সা-প ৯ সং), "উরজ উদয় থল লালিম দেল" (ঐ ৪ সং), "কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল" (ঐ, ৬ সং) ইত্যাদি বর্ণিত করিয়াছেন। আলোচ্য পদে আছে—

প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহ্নকে নেল॥

অর্থাৎ বালিকাসুলভ অট্টহাস্য এখন গুপ্ত হইল আর (নায়িকার) বর্ণ উহার অট্টহাস্যের প্রকটতা গ্রহণ করিল। বালিকারা স্বভাবতঃ অঙ্গ-সংস্কারে উদাসীন সর্বদা ধূলিক্রীড়ার অনুরক্ত বলিয়া, বিশেষতঃ বয়োধর্মে কিঞ্চিৎ মলিনাঙ্গী থাকে, যৌবনের উদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের রঙ্গের বাহার খুলিয়া যায়, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ণিতব্য নায়িকা শ্রীরাধার হাস্যকান্তি ও অঙ্গকান্তি উভয়ই শুভ্র এবং কান্তির হিসাবে এক জাতীয় পদার্থ; সুতরাং একটি গুপ্ত হইয়া অন্যটীতে যাইয়া প্রকট হইল, কিন্তু সেই প্রকটতা তাঁহার বর্ণকে আশ্রয় করিল, ইহা বলিলেই, অর্থ ও ভাব সুসঙ্গত হয়। নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় "উরজ প্রকট" ইত্যাদি পাঠ ধরিয়া "প্রকট হাস্য এখন গুপ্ত হইল, উহার (হাস্যের) প্রকটতা উরজ লইল" অর্থ করিলে নানারূপ অসঙ্গতি ঘটে। প্রথমতঃ বয়ঃসন্ধি-কালে উরজের প্রকটতা অস্বাভাবিক; দ্বিতীয়তঃ উরজ অঙ্কুরিত হইলেও, তাহা কাঁচুলী ও ওড়নী দ্বারা সযত্নে আচ্ছাদিত হয়

বলিয়া "প্রকটিত" শব্দদ্বারা বাচ্য নহে; তৃতীয়তঃ "উরজ" ও হাস্যকান্তি বা হাস্যের প্রকটতা কি উপাদান, কি বর্ণ কোনরূপেই সজাতীয় বস্তু নহে; সুতরাং উহার একতর অন্যতরকে আশ্রয় করা সম্ভব; যদি কেহ বলেন যে, অন্য সাদৃশ্য না থাকিলেও এখানে শুধু "প্রকটত্ব" বিষয়েই সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উহার উত্তরে বলিব যে, কবিতা ন্যায়শাস্ত্র নহে; কবির দৃষ্টি নায়িকার সৌন্দর্যেই আবদ্ধ বটে; সুতরাং তাঁহার পক্ষে শুধু "ঘটত্ব" "পটত্ব" লইয়া বিচার করা সাজে না। বালিকার স্বাভাবিক অহৈতুক অট্টহাস্য ও তরুণীর স্বাভাবিক দেহ-কান্তির প্রকটতার বর্ণন কত সুন্দর ও স্বাভাবিক, তাহা সহৃদয় পাঠকই বিচার করিবেন। বলা বাহুল্য যে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত পাঠ ও অর্থে পূর্ব-প্রদর্শিত কতকগুলি অসঙ্গতি ছাড়া অর্থের কোন চমৎকারিত্ব নাই।

নগেন্দ্রবাবু "কহিতে" ও "ভীন" শব্দে যথাক্রমে "কহইত" ও "ভিন" পাঠ ধরিয়াছেন; উভয় পাঠেই ছন্দোপতন ঘটে।

এই পদটীর সম্বন্ধেও নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"পার্বতীয় বড়ারী ছন্দ"। "বড়ারী" সমতলীয়ই হউক আর পার্বতীয়ই হউক, কোন ছন্দের নাম নহে; উহা একটা রাগিণীর নাম,—আমরা ইতিপূর্বেই তাহা বলিয়াছি, সুতরাং উহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। এখানে আবার বলিতে চাই যে, পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির বিচারের জন্য আমরা বিদ্যাপতির উদ্ধৃত পদগুলির কোন কোন পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলেও, সকল দুরূহ পঙ্‌ক্তি বা শব্দের অর্থ স্থানাভাবে লিখিতে পারি নাই; সুতরাং যে সকল পাঠক কৃপা করিয়া "বিদ্যাপতি-বিচার" পাঠ করিবেন, তাঁহারা সমস্ত পদের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিলে নগেন্দ্রবাবুর সম্পাদিত বিদ্যাপতির সংস্করণ কিংবা উহা এখন বাজারে অপ্রাপ্য হওয়ায় কাব্যবিশারদের সংস্করণ কিংবা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত 'পদকল্পতরু' পাঠ করিবেন। পাঠকদিগের সুবিধার জন্যই উদ্ধৃত আলোচ্য পদাবলীর শেষে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণের পদসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(নব কবিশেখর)

আলোচ্য পদটীর ভণিতায় "নব কবিশেখর" নাম আছে। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার সংস্করণে শুধু "বিদ্যাপতি" ভণিতা-যুক্ত বঙ্গদেশের প্রচলিত পদাবলীই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; তাঁহার হয়ত ধারণা ছিল যে, "কবিশেখর" বা "নব কবিশেখর" বিদ্যাপতি নহেন, অন্য পদকর্তা; সেজন্য তিনি "কবিশেখর"

বা "নব কবিশেখর" ভণিতার কোন পদই তাঁহার সংস্করণে দেন নাই। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে "নব কবিশেখর" ভণিতার মোটে চারিটী পদ আছে; উহাতে "কবিশেখর" ভণিতার পদসংখ্যা ৪২টী; নগেন্দ্রবাবু উহার মধ্য হইতে তাঁহার সংস্করণে কবিশেখরের ৩টী পদ গ্রহণ করিয়াছেন; একটি পদ গ্রহণ করেন নাই; কেন করেন নাই উহারও কারণ নির্দেশ করেন নাই; সুতরাং অনুমান হয় যে উহা তাঁহার অপ্রণিধানেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; কেননা, তিনি আলোচ্য পদটীর টীকায় লিখিয়াছেন, — "কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি। তাঁহার পূর্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য্য নামে মিথিলার সংস্কৃত কবি ছিলেন, এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে নব কবিশেখর কহিত।"

বস্তুতঃ "কবিশেখর" ভণিতাটা নিশ্চয়াত্মক নহে; ইহাদ্বারা "কবিশেখর" উপাধিধারী কোন পদকর্তা অথবা "শেখর" নামক কোন কবি — উভয়ই বুঝা যাইতে পারে। সংস্কৃত "শেখর" শব্দের অর্থ—মস্তক, মস্তকভূষণ ইত্যাদি; সুতরাং "কবিশেখর" শব্দটা কোন পদকর্তার উপাধি না হইতে পারে, এমন নহে। মিথিলায় বিদ্যাপতির পূর্বে অন্য কেহ "কবিশেখর" উপাধিধারী প্রসিদ্ধ কবি থাকিলেও বিদ্যাপতিকে তাঁহার ভূম-দান-পত্রের "অভিনব জয়দেব" শব্দবৎ "নব কবিশেখর" শব্দে বিশেষিত করা খুব সম্ভবপর মনে হয়। নগেন্দ্রবাবুর লিখিত এই বিবরণ কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানিনা; কিন্তু "নব কবিশেখর" নামক পদকর্তা যে বাঙ্গালী কবি নহেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বাঙ্গালায় "রায়শেখর" বা "কবিশেখর" নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ পদকর্তা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার পরে "শেখর" নামে পরিচিত একাধিক পদকর্তা হইয়া থাকিলেও, তাঁহারা কেহই "কবিশেখর" বা "কবি-শেখর" ভণিতা দিয়া পদরচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; সুতরাং বাঙ্গালায় পার্থক্য সূচক "নব কবিশেখর" নামসৃষ্টিরও কোন কারণ ঘটে নাই। এতদ্‌ভিন্ন "নব কবিশেখরভূম" ভণিতার উক্ত চারিটি পদই বিদ্যাপতির রচনার সৌসাদৃশ্য যুক্ত বটে; সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত কিংবদন্তী সত্য হউক বা না হউক, আমরা বর্ণিত উভয় কারণেই "নব শেখর" ভণিতার উক্ত পদচতুষ্টয় বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই স্বীকার করি। "কবিশেখর" ভণিতার সকল পদের সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা বলা যাইতে পারে না। উহার মধ্যে বিদ্যাপতির পদ ও পূর্বোক্ত বঙ্গীয় কবি রায়শেখরের পদ মিশিয়া গিয়াছে; সেগুলিকে বাছিয়া পৃথক করার

উপায় যে না আছে তাহা নহে; কিন্তু যেজন্যই হউক নগেন্দ্রবাবু শুধু ভাষার সাদৃশ্য দর্শনে ভ্রান্ত হইয়া রায়শেখরের "কবি-শেখর" ভণিতার বহু সংখ্যক পদ তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; আমরা যথা স্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব; এখানে "নব কবিশেখর" সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি বাঙ্গালী কবি নহেন; বিদ্যাপতির রচনার সহিত সৌসাদৃশ্য দর্শনে এই পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। নগেন্দ্রবাবুর অপ্রণিধানে নব কবিশেখরের যে পদটী পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমরা পাঠকদিগকে এখানে উহা উপহার দিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। পদটী মাথুর লীলার বটে; দূতী মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার বিরহ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন ঃ

সুহই

(যব) ঋতু পতি (১) নব পরবেশ (২)।
তব্ তুহুঁ ছোড়লি দেশ।।
তাহে যত বিবিধ বিলাপ।
কহইতে হৃদি মাহা (৩) তাপ॥
তব্ ধরি (৪) বাউরি (৫) ভেল।
গিরিষ-সময় বহি গেল॥
বরিষা ভেল চারি মাস।
না ছিল জিবন অভিলাস॥
তাহে যত পাওল দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
শারদে নিরমল চন্দ।
তাক (৬) জিবন লেই (৭) দন্দ (৮)॥
পুরবক (৯) রাস বিলাস।
সোঙরিতে (১০) না বহয়ে শ্বাস॥
হীম (১১) শিশিরে (১২) বহু শীত।
দিনে দিনে উনমত চীত॥
অব ভেল বহুত নিদান (১৩)।
নব কবিশেখর ভাণ (১৪)॥

(সা. প পদকল্পতরু ১৮৩২ সং)

---

(১) ঋতুরাজ বসন্ত (২) প্রবেশ (৩) মধ্যে (৪) "তব ধরি"-সেই সময় হইতে (৫) বাউলী, উন্মত্তা (৬) তাহার (৭) লইয়া (৮) বিবাদ (৯) পূর্বের (১০) স্মরণ করিতে (১১) হেমন্তে (১২) শীত ঋতুতে (১৩) অন্তিম অবস্থা (১৪) ভণে, কহে।

(৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "কিছু কিছু উতপতি" ইত্যাদি ৬ সং পদটী কাব্যবিশারদের বয়ঃসন্ধির ৭ সং পদ বটে। ইহা 'পদকল্পতরু'তে নাই। নগেন্দ্রবাবুর এই পদের পাঠ ও অর্থ প্রায় কাব্যবিশারদের অনুরূপ, তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে; আমরা নিম্নে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব ঃ

(ক) কাব্যবিশারদের পাঠ—

কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।

নগেন্দ্রবাবুর পাঠ "বয়স কি" স্থলে "বয়সক।" ইহাই শুদ্ধ পাঠ বটে; কারণ মৈথিল ভাষায় "ক" বা "কর"ই ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন, আধুনিক হিন্দীর ন্যায় "কা" বা "কী" নহে। আধুনিক হিন্দীতে সম্বন্ধ সূচিত বিশেষ্য পদ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন যথাক্রমে "কা" বা "কী" হইয়া থাকে, যথা "রাজা কা বেটা" "রাজা কী বেটী" ইত্যাদি; মৈথিল বা প্রাচীন হিন্দী ভাষায় এইরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।

(খ) কাব্যবিশারদের পাঠ—

তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥

নগেন্দ্রবাবুর পাঠ—

তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল কয় ঠাম॥

ভূমিকায় উল্লিখিত 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থের পাঠ—

তৈও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোপল ঘট উচল করি ঠাম॥

এই পদটী ষোল বা পনের মাত্রার "মাত্রা চতুষ্পদী" বা "চৌপাই" ছন্দে রচিত, "তইও" বা "তৈও" পাঠে ঐ মাত্রা বজায় থাকে কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর "তইঅও" পাঠে মাত্রা-ভঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। শব্দটী মৈথিল "তৈও" (=তবু) বটে; উহাকে "তইঅও" শব্দের ন্যায় অপ্রচলিত ও দুরুচ্চার্য একটা কল্পিত রূপ প্রদান করিয়া ছন্দোভঙ্গ করার কোনই কারণ দেখা যায় না। সার গ্রীয়ারসনের বিদ্যাপতিতে "তইও" শব্দেরই প্রয়োগ আছে, যথা—"তইও চলসি

ধনি" ইত্যাদি (Maithili Chrestomathy, ৪৪ পৃষ্ঠা)। কাব্যবিশারদ ও নগেন্দ্রবাবুর "রোয়ল" পাঠ স্পষ্টই অশুদ্ধ প্রতীতি হয়। "রোয়ল" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ "রোদন করিল"; উহার অর্থ "রোপন করিল" হয় না; আধুনিক বাঙ্গালায় "রুইল" শব্দের অর্থ "রোপণ করিল" হয় বটে, কিন্তু প্রাচীন পদাবলীতে বা মৈথিল-ভাষায় সর্বত্র "রোপল" শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। কাব্যবিশারদ ও নগেন্দ্রবাবুর "উচল" পাঠও ছন্দোদুষ্ট; "উচল" পাঠই সমীচীন বটে। বিদ্যাপতির পদে বহু স্থলেই "করি" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—

জীবন যৌবন সফল করি মানল।
(নগেন্দ্রবাবুর ৮২১ সং)

কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জল-ধারা॥
(নগেন্দ্রবাবুর ৭৫৬ সং)

এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥
(নগেন্দ্রবাবুর ৭৩৩ সং)

চলু চলু সুন্দরি শুভ করি আজ।
(গ্রীয়ারসনের বিদ্যাপতি ৫৩ পৃষ্ঠা।)

'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি'-সম্পাদক বিহারের আরা জেলানিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় "উচল করি ঠাম" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। মৈথিলভাষার বিশেষজ্ঞ মনীষী সার গ্রীয়ারসন মহোদয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Maithili Chrestomathy গ্রন্থের শব্দকোষে (Vocabulary) "কর" ধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়ার পদে করি, করী, করিএ, কৈ, কয়, কঁ, কৈকঁ ইত্যাদি রূপগুলি প্রদর্শিত করিয়াছেন। এই পদটী মৈথিল কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় সকল পুথিতেই "করি" পাঠ আছে; দেখা যাইতেছে যে "করি" রূপটীই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অথচ মৈথিল ব্যাকরণ-সিদ্ধ বটে; সুতরাং উহার পরিবর্তে তদপেক্ষা আধুনিক "কৈ" বা "কয়" পাঠ কল্পনা করা কোনমতেই সমীচীন নহে।

নগেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন — "তথাপি (বন্দী হইয়াও) কন্দর্প (কিশোরীর) হৃদয়ে উচ্চ স্থান দেখিয়া (উচল করি) অনুপম

ঘট রোপণ করিল।" এইরূপ অর্থও সংলগ্ন হয় না; কেননা, "উচল করি ঠাম" বাক্যের অর্থ কোনমতেই "উচ্চ স্থান দেখিয়া" করা যাইতে পারে না। কাব্যবিশারদ মহাশয় "ঠাম" শব্দের অর্থ "গঠন" ধরিয়া টীকা করিয়াছেন "গঠন উন্নতি করিয়া ঘট স্থাপন করিয়াছেন"। আমাদিগের বিবেচনায় কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বটে। যৌবনারম্ভে কিশোরীর স্তনোদ্গমের বর্ণন করিতে যাইয়া কবি স্তনের অনুল্লেখ ও তৎপরিবর্তে মাঙ্গলিক সুবর্ণ-ঘট স্থাপনের উল্লেখরূপ অতিশয়োক্তিমূলক প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের সাহায্যে বলিয়াছেন যে বোধ হয় যেন, কিশোরীর বক্ষঃস্থলে সেই স্থলটীকে উন্নত করিয়া কন্দর্পনৃপতি কিশোরীর অঙ্গ রাজ্যের অধিকাররূপ শুভ কার্যের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ সুবর্ণ ঘট স্থাপন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার অনুবর্তী 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি'-সম্পাদকের ব্যাখ্যার প্রথম অসঙ্গতি শব্দার্থে; দ্বিতীয় অসঙ্গতি ভাবে। শব্দার্থের অসঙ্গতি এই যে, "উচল করি ঠাম" বাক্যের দ্বারা—"উচ্চ স্থান দেখিয়া" অর্থ পাওয়া যায় না। তারপর কথা হইতেছে এই যে, কন্দর্প কর্তৃক কুচরূপ স্বর্ণঘট-স্থাপনের পূর্বে কিশোরীর বক্ষঃ উচ্চ হইবে কি প্রকারে? বক্ষের উচ্চতার কারণ কুচোদ্গম; সুতরাং কুচ-রূপ ঘট-স্থাপন দ্বারা বক্ষঃস্থলকে কন্দর্প উন্নত করিলেন এরূপ না বলিয়া, বক্ষঃ উন্নত দেখিয়া কুচ-রূপ ঘট স্থাপিত করিলেন,—এরূপ বলিলে অর্থের নিতান্ত অসঙ্গতি ঘটে। যদি বলেন যে, কন্দর্পের ঘট-স্থাপন কার্য হইল কবির কল্পিত একটা উৎপ্রেক্ষা; প্রকৃতপক্ষে বক্ষের উচ্চতা-বিধান কার্যে কন্দর্পের কোনও কর্তৃত্ব নাই,—সুতরাং "কন্দর্প বক্ষঃস্থল উচ্চ করিয়া কুচ-ঘট স্থাপন করিল"—না বলিয়া "কুচ-ঘট স্থাপন করিয়া বক্ষ উচ্চ করিল" এরূপ বলাই সঙ্গত ছিল; সেরূপ না বলায় দোষের কারণ হইয়াছে। আমরা এই আপত্তির উত্তরে বলিব যে, প্রকৃত ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিলে শুধু তাহা লইয়া কবিতা হয় না; প্রকৃত ঘটনার ও চমৎকারিত্বপূর্ণ কাল্পনিক কারণ নির্দেশ দ্বারাই কবিরা রচনার চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। স্তনোদ্গম দ্বারা কিশোরীর বক্ষের উচ্চতা-বিধান যদিও প্রকৃত পক্ষে যৌবনারম্ভেরই কার্য বটে, উহাতে কন্দর্পের বাস্তবিক কোনও কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু বিদ্যাপতি তরুণীর অঙ্গ-রাজ্যে কন্দর্পের নব অধিকার ও তাঁহার রাজকার্যের বর্ণনা করিতে যাইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি-রূপ কার্যগুলিও যৌবনের অধিপতি কন্দর্পের উপরই আরোপ করিয়াছেন; যথা,—

মদন কি তাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥
কটিক গোরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে খীন উনহি অবলম্ব ॥
ইত্যাদি ৫ সং পদ।

সুতরাং কবিতার হিসাবে কন্দর্প কুচ-রূপ ঘট স্থাপন করিলেন, বলিলে যেমন দোষের কারণ হয় না, তেমনি যৌবন লক্ষণ স্তনোদ্‌গমের দ্বারা বক্ষঃ উন্নত করিলেন, বলিলেও কোন দোষ হয় না; প্রকৃতপক্ষে স্তনোদগমে কন্দর্পের কোনও কর্তৃত্ব না থাকিলেও কবি এ স্থলে "অসম্বন্ধে সম্বন্ধ"-রূপ অন্যতম অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে বক্ষের উচ্চতা বিধান কার্যটিও কন্দর্পেরই কর্তৃত্বের একটা অপূর্ব কার্য বলিয়াই বর্ণিত করিয়াছেন। কন্দর্প (স্তনোদ্‌গম দ্বারা) কিশোর বক্ষঃ উচ্চ করিয়াছেন, ইহা আগে না বলিলে উহার সহিত ঘট-স্থাপন কার্য উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ স্তনোস্থাপন ও ঘট-স্থাপন উভয় কার্য কবির কল্পনায় অভিন্ন ও কন্দর্পের অপূর্ব কৃতিত্ব বলিয়া, কবি বলিয়াছেন যে, কন্দর্প (কিশোরীর) বক্ষঃস্থলকে উচ্চ করিয়া (যেমন) ঘট স্থাপন করিলেন।

(৭ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "দিনে দিনে উন্নত" ইত্যাদি ৭ সং পদটী কাব্যবিশারদের বয়ঃসন্ধির ২ সং পদ বটে। কিন্তু উভয় পদে গুরুতর পাঠবৈষম্য দেখা যায়। নগেন্দ্রবাবু ঐ পাঠবৈষম্যের কোনও উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু করা উচিত ছিল। কাব্যবিশারদের টীকায় এই পদের 'পদামৃত-সমুদ্র' অনুযায়ী যে রূপান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে উহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কাব্যবিশারদের সংস্করণে "দিনে দিনে উন্নত" ইত্যাদি চারিটি পংক্তির পরেই নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত "শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ" ইত্যাদি বাকি পংক্তিগুলির পবিবর্তে নগেন্দ্রবাবুর ৮ সংখ্যক "পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ" ইত্যাদি সম্পূর্ণ পদটা উক্ত পদের শেষাংশ-রূপে লিখিত হইয়াছে। কাব্য-বিশারদ কোন পুথিতে এরূপ পাঠ-বিন্যাস পাইয়াছেন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ 'পদামৃত সমুদ্রে'র প্রমাণের বিরুদ্ধে সেইরূপ পাঠবিন্যাস গ্রহণ করার কি বিশিষ্ট কারণ আছে, সে সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। অপর কোন অপ্রসিদ্ধ পুথিতে সেরূপ

পদবিন্যাস থাকিলেও আমরা এস্থলে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত 'পদামৃতসমুদ্রে'র পাঠই সমীচীন মনে করি।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার এই পদের ৩য় ছত্রে যে "আবে" পাঠ আছে, উহার স্থলে 'পদামৃতসমুদ্রে' "অবকে" পাঠ দেখা যায়। "আবে" ও "অব" অভিন্নার্থক; হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় ছন্দের অনুরোধে দুইটি লঘু মাত্রাবিশিষ্ট "অব" শব্দ দুইটি গুরুমাত্রাত্মক "আবে" রূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এখানে "অবকে" পাঠ করিলে যদিও অর্থ একটু টানিয়া করিতে হয়, তথাপি অগত্যা সেরূপই করিতে হইবে। কাব্যবিশারদের গৃহীত "অবহি" পাঠ অপ্রামাণিক ও ছন্দোদুষ্ট। এখানে চারি মাত্রার প্রয়োজন; "অবহি" তিন মাত্রাত্মক বটে, চারি মাত্রা পূরণের জন্যই নগেন্দ্রবাবুর ঐ অপ্রামাণিক "আবে" পাঠের কল্পনা। যাহা হউক, "অবকে" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ "এখানকার" অর্থাৎ "এ সময়ের"; এ সময়ের অর্থাৎ এই বয়ঃসন্ধিকালের মদন কিনা এই যৌবন-উদ্‌গম কালের অধিপতি মদন।

নগেন্দ্রবাবুর ১১—১২ পংক্তিদ্বয়ের পাঠ ঃ

তকর আগে তোহর পরসঙ্গ।
বুঝি করব জে নহ কাজ ভঙ্গ॥

'পদামৃতসমুদ্রে' "তকর" "তোহর" "জে" স্থলে যথাক্রমে "তাকর" "তুয়া" ও "যৈছে" পাঠ আছে; আমরা উহাই সঙ্গত মনে করি; কেননা, "তকর" প্রভৃতি পাঠ অপ্রামাণিক ও উহাতে ছন্দোভঙ্গ ও অর্থহানি ঘটে। "তোহর" স্থলে "তুহর" পাঠ কল্পনা করিলেও মাত্রা ও যতি রক্ষিত হয় না; পক্ষান্তরে "তুয়া" (উচ্চারণ—"তুঅ") পাঠ মৈথিল "তুঅ" শব্দের পরিবর্তে বাঙ্গালা পদাবলীতে প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। "জে" পাঠে ছন্দোভঙ্গ না হইলেও অর্থহানি ঘটে; কেননা "যৈছে" অর্থে "জে" (যে) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এখানে "যৈছে" শব্দের গুরু অক্ষর "যৈ" অন্যান্য বহু স্থলের গুরু অক্ষরের ন্যায় লঘু পড়িতে হইবে; সুতরাং অপ্রামাণিক "জে" পাঠ কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। গুরু অক্ষরের লঘু প্রয়োগ যথা ঃ

হরি বড় গরবী গোপ মাঝে বসই।
ঐসে করব যৈসে বৈরি না হসই॥

(নগেন্দ্রবাবুর ৪৬২ সংখ্যক পদ)

এখানে "ঐসে" শব্দের "ঐ" অক্ষর গুরু ও "যৈসে" শব্দের দুইটি অক্ষরই লঘু বটে।

কেবল যে বঙ্গীয় পুথিতে এরূপ তাহা নহে; নগেন্দ্রবাবুর পরম সমাদৃত মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও এরূপ বহু প্রয়োগ আছে, যথা—

সুন্দরি বচনে করহ সমধানে।
তোহ সনি নারি দিবস দস অছলিহু
ঐছন উগজু মোহি ভানে॥

(নগেন্দ্রবাবুর ৯১ সংখ্যক পদ)

এখানে "তোহ", "ঐসন" ও "মোহি" শব্দের "তো", "ঐ" ও "মা গুরু অক্ষরগুলি এক মাত্রা পরিমিত লঘু অক্ষররূপে পাঠ না করিয়া গত্যন্তর নাই; সুতরাং পূর্বোক্ত "যৈছে" পাঠের "যৈ" অক্ষর ও শব্দের অন্তস্থিত অধিকাংশ "এ" কারের ন্যায় "যৈছে" শব্দের "ছে" অক্ষর লঘু গণ্য করিয়া "যৈছে" শব্দটীকে দুইটী লঘু মাত্রাত্মকরূপে পড়িবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। সুতরাং ছন্দোভঙ্গের অমূলক আশঙ্কায় নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির—

তুহু যৈছে নাগরি কানু রসবন্ত।

(কাব্যবিশারদ ৪৯ পৃঃ)

ইত্যাদি স্থলে যে "তুহু সে নাগরি" ইত্যাদি পাঠ কল্পিত করিয়াছেন, তাহাও এরূপই অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু পূর্বোদ্ধৃত "তকর আগে" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন— "তাহার সাক্ষাতে তোমারই কথা (প্রসঙ্গ) হয় (যাহাতে তোমার প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে); বিবেচনা করিয়া (এরূপ) করিব যাহাতে কাজ না ভঙ্গ হয়।" এরূপভাবে টানিয়া অর্থ করিতে যাইয়া নগেন্দ্রবাবুকে "পরসঙ্গ এই কর্তৃপদের ক্রিয়াপদ "হয়" এবং "করব" ক্রিয়ার কর্ম "এরূপ" (?) শব্দ দুইটীর অধ্যাহার করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। "পরসঙ্গ" (প্রসঙ্গ) শব্দকে "করব ক্রিয়ার কর্মপদ ধরিলেই সহজে এরূপ অর্থ হয় যে— "তাহার সাক্ষাতে বিবেচনা করিয়া তোমার প্রসঙ্গ করিব— যাহাতে কার্য ভঙ্গ না হয়।" নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত অর্থে প্রথমতঃ তাহার সাক্ষাতে তোমার প্রসঙ্গ করিব, এই অর্থ না বুঝাইয়া সর্বদাই প্রসঙ্গ হয় এই অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত অর্থের প্রতীতি হয়; দ্বিতীয়তঃ "করব"

ক্রিয়ার কর্মপদ ধরিলে অন্বয়ে বা অর্থের এরূপ কোন অসঙ্গতি ঘটে না; সুতরাং আমরা সেইরূপ অর্থ করাই সমীচীন মনে করি। পণ্ডিত সমাজে "শিরোবেষ্টনপূর্বক নাসিকাস্পর্শ" বলিয়া যে ব্যর্থ প্রযত্নের একটা উদাহরণ শোনা যায়, এরূপ ব্যাখ্যাও উহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত নহে কি?

(৮ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৮ সংখ্যক পদের ৪র্থ কলি—

তনু শুক বসন হিরদয় লাগি।
যে পুরুষ দেখব তাকর ভাগি।

নগেন্দ্রবাবু "শুক" শব্দের অর্থ সুকুমার লিখিয়াছেন; কিন্তু এরূপ অর্থ কোনমতেই সিদ্ধ হয় না। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের "তনু—সূক্ষ্ম। শুক—বস্ত্রাঞ্চল, অঁাচল" সমর্থনযোগ্য নহে। 'পদরত্নাকর' পুথিতে পাঠ আছে—"তনসুখ বসন তনু হিয় লাগি" ইত্যাদি। 'আইন আকবরী' গ্রন্থে "তন্‌সুক" নামক অতিসূক্ষ্ম এক-প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এখানে কবি সেই সূক্ষ্ম বসন অর্থেই "তন্‌সুখ" বা "তনসুক" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। তন্‌সুক শব্দের ঠিক ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত "তনু সুখ" বা "তনু (সূক্ষ্ম) অংশুক" শব্দ হইতে সম্ভবতঃ উহার উৎপত্তি হইয়াছে।

(৯ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৯ সংখ্যক "খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরই" ইত্যাদি পদের পাঠে ও ব্যাখ্যায় কতকগুলি ভুল আছে; সে সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য 'পদকল্পতরু'র অনুযায়ী সম্পূর্ণ পদটি এখানে অর্থসহ উদ্ধৃত করিব ঃ

"খনে খনে নয়ন-কোণে অনুসরই (১)।
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরই (২)॥
খনে খনে দশন ছটাছটি (৩) হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি (৪) চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ (৬)।
মনমথ-পাট পহিল অনুবন্ধ (৭)॥
হৃদয়জ (৮) মকুলিত (৯) হেরি হেরি থোর (১০)।
খনে অঁাচর (১১) দেই খনে হোই ভোর (১২)॥

বালা শৈশবে তারুণ ভেট (১৩)।
লখই না পরিয়ে জেঠ কনেঠ (১৪)॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান (১)॥

(১) ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-প্রান্ত দ্বারা অনুসরণ করে অর্থাৎ দর্শনীয় ব্যক্তির প্রতি সোজাভাবে না চাহিয়া, সেই ব্যক্তি সম্মুখ হইতে একটু দূরে গেলে পশ্চাদভাগ হইতে তাহার প্রতি বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে। (২) ভরে। (৩) ছড়াছড়ি। (৪) বস্ত্র। (৫) সচকিত ভাবে। (৬) ধীরে। (৭) মন্মথের পাঠ অর্থাৎ শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হইল। (৮) স্তন। (৯) মুকুলিত, অঙ্কুরিত। (১০) (হিন্দী 'থোড়া') অল্প। (১১) অঞ্চল। (১২) হোই ভোর—ভুল হয়। (১৩) বালিকা (শ্রীরাধা) শৈশবে তারুণ্য অর্থাৎ যৌবনের সাক্ষাত পাইল। (১৪) (শৈশব ও যৌবনের মধ্যে) জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লক্ষ্য।

আমরা "বিদ্যাপতি-বিচারের" ভূমিকায় বলিতে ভুলিয়াছি যে, দারভাঙ্গার লাহোরিয়া সরাইর "হিন্দী-পুস্তক-ভাণ্ডার" হইতে কিছুদিন আগে বিদ্যাপতির পদাবলীর একখানা সচিত্র ও সটীক সংক্ষিপ্ত হিন্দী সংস্করণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ শর্মা বেনীপুরী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বেনীপুরী মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় একস্থলে লিখিয়াছেন—

> বিদ্যাপতি কী ভাষা কী দুর্দশা ভী খুব হুঈ হৈ। বংগালিয়োঁ নে উসে ঠেঠ্ বঁগলা রূপ দিয়া হৈ, মোরঁগ বালোঁ নে মোরঁগ কা রং চঢ়ায়া হৈ, বাবু ব্রজনন্দন সহায় জী নে উস্ পর ভোজপুরী কলঈ কী হৈ ঔর আজকল কে মৈথিল উস্ পর মৈথিলী কা রোঁগন্ চঢ়া রহে হৈ! ভগবান্ বিদ্যাপতি কী কোমলকান্ত পদাবলী কী রক্ষা করেঁ।

বেনীপুরী মহাশয়ের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গীয় সংস্করণগুলিতে, এমন কি আমাদিগের ভূমিকার উল্লিখিত 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থের সম্পাদক বাবু ব্রজনন্দন সহায় মহাশয়ের হিন্দী সংস্করণেও বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাচীন মৈথিল ভাষার যে দুর্দশা অর্থাৎ বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা তিনি সাধ্য অনুসারে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেনীপুরী মহাশয় নিজে বিদ্যাপতির একজন বিশেষজ্ঞ মিথিলাবাসী এবং তাঁহার এই সংস্করণটাও সর্বাপেক্ষা পরবর্তী; সুতরাং বিদ্যাপতির শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ বিচারের প্রসঙ্গে তাঁহার মতামতসমূহেরও বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক। তবে কথা এই

যে, বেনীপুরী মহাশয় তাঁহার সংস্করণের প্রারম্ভেই "ধন্যবাদ" হেডিং দিয়া লিখিয়াছেন—

> ইন্ পুস্তক কে পদোঁ কে সংকলন মেঁ মুঝে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্বারা সম্পাদিত ঔর জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র দ্বারা প্রকাশিত বঁগ্লা "বিদ্যাপতির পদাবলী" সে অধিক সহায়তা মিলি হৈ, অতঃ ইন সজ্জনোঁ কা মৈঁ অত্যন্ত অনুগ্রহীত হুঁ।

বস্তুতঃ, বেনীপুরী মহাশয় তাঁহার সংস্করণে অধিকাংশ স্থলেই নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ ও অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এরূপ স্থলে তাঁহার স্বীকৃত পাঠাদির স্বতন্ত্র উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া, যেখানে তাহার ধৃত পাঠাদির কোন বিশেষত্ব আছে, কেবল সেখানেই তাহার উল্লেখ করা যাইবে। বেনীপুরী মহাশয়ের সংস্করণে কেবল বিদ্যাপতির ২৯৫টা পদ গৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতির পদসংখ্যা নয় শতের উপরে; সুতরাং বেনীপুরী মহাশয়ের এই সংস্করণ দ্বারা বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থাদির মীমাংসার যে বিশেষ সাহায্যের প্রত্যাশা করা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। নগেন্দ্রবাবু ও বেনীপুরীজী —উভয়েই "খনে খনে" স্থলে পাঠ ধরিয়াছেন—"খনে খন"; ব্রজনন্দনবাবুর 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থে আছে—"ছন ছন"। সংস্কৃত "ক্ষ" অক্ষরের অপভ্রংশ হিন্দীতে "ছ" বা "খ" উভয়ই হইতে পারে। সংস্কৃত "লক্ষ্মণ" শব্দের "লছমন" বা "লখন" উভয় রূপান্তরই হিন্দীতে দেখা যায়। "ক্ষণ ক্ষণ" শব্দের "খন খন" বা "ছন ছন" উভয়রূপই সমান শুদ্ধ বটে; সুতরাং বাঙ্গালার প্রাচীন পুথির "খন খন" পাঠ অশুদ্ধ মনে করিয়া "ছন ছন" লিখার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। মৈথিল ভাষায় অনেক স্থলেই "এ"কার হ্রস্বস্বর গণ্য হয়; সুতরাং "খনে খনে" "খেনে খেনে" পাঠ করিলেও "খে" বা "নে" অক্ষর দ্বিমাত্রাত্মক দীর্ঘস্বর না হইয়া, একমাত্রাত্মক হ্রস্বস্বর গণ্য হওয়ায় ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা নাই; সেরূপ আশঙ্কা নিবারণের জন্য পাঠ পরিবর্তন করিতে হইলে, "খনে খন" পাঠ না লিখিয়া, ব্রজনন্দন বাবুর অনুকরণে "খন খন"ই লিখা উচিত ছিল। বস্তুতঃ কালবাচক "বৎসর" "মাস" "দিন" "ক্ষণ" প্রভৃতির বীপ্সা বা বহুত্ব বুঝাইতে অনেক সময়েই বক্তার ইচ্ছা অনুসারে অধিকরণ কারকের বিভক্তির চিহ্ন উহ্য অর্থাৎ অনুক্ত থাকে।

এজন্য "বৎসরে বৎসরে" "দিনে দিনে" "ক্ষণে ক্ষণে" ইত্যাদির পরিবর্তে, "বৎসর বৎসর" "মাস মাস" "দিন দিন" "ক্ষণ ক্ষণ" প্রভৃতির ন্যায় প্রয়োগ সর্বদাই দৃষ্ট হয়। "খনে খন"—এইরূপ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নূতন ও অসঙ্গত বটে। হয় "খনে খনে" না হয় "খন খন" লিখুন; কিন্তু মুরারির তৃতীয় পন্থার মত—একটা "খনে খন" রূপান্তরের সৃষ্টি করিয়া কোন ফল দেখা যায় না। "এ"কার যদি হ্রস্বস্বর হইতে পারে, তবে চারিটী হ্রস্বমাত্রাযুক্ত "খেনে খেনে" বা "খনে খনে" পাঠ অশুদ্ধ নহে; আর যদি "এ"কার হ্রস্ব হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে "খনে খন" পাঠেও "নে" দীর্ঘ বলিয়া "খনে খন" ১+২+১+১=৫ মাত্রাবিশিষ্ট হওয়ায় ছন্দোভঙ্গ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কাল্পনিক ছন্দোভঙ্গ নিবারণের জন্য এরূপ ব্যর্থ ও অনাবশ্যক প্রয়াসের অসংখ্য উদাহরণ নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে বিদ্যমান; আমরা এখানে ইহার আর একটা বিশেষ প্রসিদ্ধ উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। সকল উদাহরণ দেখাইতে হইলে, কেবল উহাতেই এক একটা বড় প্রবন্ধ পূর্ণ করা যাইতে পারে।

মহাকবি বিদ্যাপতির রচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটা বিখ্যাত পদ

যাহাঁ যাহাঁ পদ-যুগ ধরই।
তহিঁ তহিঁ সরুরুহ ভরই।। ইত্যাদি

সংস্কৃত "যত্র" ও "তত্র" শব্দের রূপ প্রাকৃত ভাষায় "যৎথ" ও "তৎথ" হইয়া থাকে; উহা হইতেই হিন্দী ও মৈথিল ভাষার "জহাঁ" ও "তহাঁ" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। "জহাঁ" ও "তহাঁ" ১+২+৩ মাত্রাবিশিষ্ট বটে; কিন্তু বিদ্যাপতির এই পদে ও অন্যান্য পদে "যাহাঁ" (জাহাঁ) ও "তাহাঁ"—শব্দ দুইটি লঘুমাত্রাবিশিষ্ট গণ্য না করিলে ছন্দ বজায় থাকে না। বাঙ্গালা "অ"কারের উচ্চারণ হিন্দী ও মৈথিলীর "অ"কারের মত নহে। হিন্দী ও মৈথিলী ভাষায় "জহ" ও "তহ" অনেকটা বাঙ্গালা "জাহা" "তাহা" শব্দের মতই শুনায়; কেননা, বাঙ্গালায় "আ" স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায় সর্বত্রই হ্রস্ববর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে বাঙ্গালায় "জহ" ও "তহ" লিখিলে, কতকটা ইংরেজী Joho ও Toho শব্দের মতই পঠিত হয়। এজন্য হিন্দী ও মৈথিলীর "জহঁ" ও "তহঁ" শব্দের কাছাকাছি ঠিক উচ্চারণটা বুঝাইতে হইলে বাঙ্গালায় "জাহাঁ" ও "তাহাঁ" না লিখিয়া গত্যন্তর নাই। তাই বাঙ্গালার সকল প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেই এ স্থলে—

যাহাঁ যাহাঁ পদ-যুগ ধরই।
তাহাঁ তাহাঁ সররুহ ভরই ।।

ইত্যাদি পাঠ গৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু অথবা তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত কিন্তু এস্থলে মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানেন যে, "জাহাঁ" "তাহাঁ" শব্দ দুইটী বিশুদ্ধ হিন্দী বা মৈথিল শব্দ নহে,—"যহাঁ" ও "তহাঁ"ই শুদ্ধ বটে; সুতরাং তাঁহারা ছন্দের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, পাঠ ধরিয়াছেন —

যহাঁ যহাঁ পদযুগ ধরই।
তহিঁ তহিঁ সররুহ ভরই ।। ইত্যাদি

বলা বাহুল্য হিন্দীর রীতি অনুসারে লিখিত হইলে, এখানে লিখিতে হইবে "জহঁ জহঁ পদযুগ ধরই" ইত্যাদি; আর বাঙ্গালার রীতি অনুসারে লিখিত হইবে— "যাহাঁ যাহাঁ (কিম্বা "জাহাঁ জাহাঁ") পদযুগ ধরই"; কিন্তু মুরারির তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়া, "যহাঁ যহাঁ" ইত্যাদি পাঠ গ্রহণ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, সেরূপ করিলে অভীষ্ট চারি মাত্রার স্থলে "যহাঁ যহাঁ" শব্দ দুইটি ছয় মাত্রাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। সুখের বিষয় যে, ব্রজনন্দনবাবু এখানে "জহঁ জহঁ পদযুগ ধরই" ইত্যাদি পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক প্রয়োগের অনুরোধে "জহাঁ তহাঁ" লিখিয়া ছন্দোভঙ্গ ঘটান নাই।

"খনে খনে দশন ছটাছটি হাস"—'পদকল্পতরু'র এই পাঠের পরিবর্তে 'পদরসসার' পুথিতে "খনে খনে দশন ছুটি অটহাস" পাঠ আছে; 'পদামৃত সমুদ্রে'র মুদ্রিত গ্রন্থে "দশন ছটাছট হাস" পাঠ থাকিলেও আমাদের অনুমান হয় যে, "খনে খনে দশন ছুটী অটহাস" পাঠই ঐ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বীকৃত; কেননা, তিনি "খনে খনে" ইত্যাদি পংক্তি দুইটীর অর্থ লিখিয়াছেন "দ্বিতীয় শ্লোকস্য প্রথমত অট্টহাসাদিনা বাল্যস্য প্রাবল্যং পরার্দ্ধে বস্ত্রেণ মুখাবরণেন কৈশোরস্য প্রাবল্যং সূচিতং।" অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে "অট্টহাস" ইত্যাদি দ্বারা বাল্যভাবের প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে বস্ত্রে মুখাবরণদ্বারা কৈশোরভাবের প্রবলতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কাব্যবিশারদ মহাশয় 'পদকল্পতরু'র পাঠ গ্রহণ করিয়া "দশন ছটাছট" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন— "দশন ছটার (সমূহের) ছটা (দীপ্তি) আছে" যাহাতে নগেন্দ্রবাবু

খনে খন দশন ছটা ছুট হাস।
খনে খন অধর আগে গহ বাস ॥

এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া উহার টীকায় লিখিয়াছেন — "৩। ছুট—ছোটে, যুক্ত হয় (প্রকাশ পায়)। বঙ্গদেশের বিকৃত পাঠ — ছটাছট। ।৪। গহু-গ্রহণ করে। অধরের আগে (সম্মুখে) বাস গ্রহণ করে (মুখে কাপড় দেয়)।" বেনীপুরী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু টীকায় যে জন্যই হউক "গহু" এই দুর্বোধ্য ও সন্দিগ্ধ শব্দটার অর্থ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ব্রজনন্দনবাবুর "দশন ছটাছুট হাস" পাঠ ধরিলেও "গহু" স্থলে 'পদকল্পতরু'র "করু" পাঠের অনুযায়ী "কর" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় টীকায় লিখিয়াছেন—"আচা করু বাস", "আগে গহু বাস" এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে, গহু—গেল; আচা—আচ্ছাদন, বাস—বস্ত্র।"

এই সকল পাঠভেদ ও উহাদের পূর্বোক্ত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত "দশন ছটাছুট হাস" পাঠ অমূলক ও কল্পিত বটে। ঐরূপ পাঠ বঙ্গীয় কোন পুথিতেই দেখা যায় না। মিথিলার কোন পুথিতে এই পদটী পাওয়া যায় নাই; সুতরাং বঙ্গীয় পুথির পাঠই এখানে মান্য করিতে হইবে। আমরা স্বীকার করি যে, কাব্য বিশারদের প্রতিপাদিত অর্থ কষ্টকল্পিত বটে—কিন্তু 'পদরসসার' ও 'পদামৃত-সমুদ্রের' "দশন ছুটী (অথবা "ছুটে") অটহাস" পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দ কিংবা অর্থের কোন অসঙ্গতি ঘটে না; সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় যদি 'পদ-কল্পতরু'র পাঠ বিকৃত বলিয়াও তর্কস্থলে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও আচার্য রাধামোহন ঠাকুরের সমাদৃত পূর্বোক্ত পাঠ ও অর্থ তুচ্ছ করা যায় না। 'পদকল্পতরুর "খনে খনে দশন ছটাছটি হাস" পাঠের সোজা অর্থ—ক্ষণে ক্ষণে (শ্রীরাধার) দন্তরাজিতে ছড়াছড়ি হাসি (দেখা যায়)। সংস্কৃত "অট্টহাস্য" বা উহার অপভ্রংশ "অটহাস" শব্দের ব্যবহার চলিত হিন্দী, মৈথিলী বা বাঙ্গালায় আছে বলিয়া জানা যায় না; কিন্তু হাসির ছড়াছড়ি কথাটা বাঙ্গালায় অতি প্রসিদ্ধ বটে। এই পদটা আদৌ বিদ্যাপতির রচিত কিনা, সে বিষয়েও আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। রাধামোহন ঠাকুরের অপেক্ষাও বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে পদকর্তা হরিবল্লভ মহোদয়ের সঙ্কলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত পদটীর ভণিতার কলির পরিবর্তে নিম্নলিখিত কলিগুলি দৃষ্ট হয়, যথা—

দূতি সেয়ানি করহ সোই ঠাট।
পণ্ডিত হাম পঢ়ায়ব পাঠ ।।
চেতন মঝু ঋষ-কেতন-তন্ত্র ।
অবগহি লেঙ শিখাঙ রস-মন্ত্র ।।
আপন তন-কাঞ্চন হমে দেই ।
যতনহি প্রেমরতন ভরি লেই ।।
বিদ্যাবল্লভ ইহ আজীব ।
ইহ বিনু দুহুক জীউ ন জীব ।।

"বিদ্যাবল্লভ" ভণিতার অন্য কোন পদ পাওয়া যায় নাই। এই বিদ্যা-বল্লভ আর যিনিই হউন না কেন, তিনি যে বিদ্যাপতি নহেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে সংস্কৃত শব্দের ও অলঙ্কারের বাহুল্য হরিবল্লভ অর্থাৎ চক্রবর্তীপাদের রচনার সহিত সৌসাদৃশ্যযুক্ত; আমাদের অনুমান হয় যে হরিবল্লভ পাঠে ছন্দোপতন অনিবার্য বলিয়া এবং বক্ষ্যমাণ বিশেষ কারণবশতঃ পদকর্তা এখানে "হরিবল্লভ" বা "বল্লভ" নামের পরিবর্তে "বিদ্যা-বল্লভ" নাম প্রয়োগ করিয়াছেন; "হরিবল্লভ" যিনি হইবেন, তিনি "অবিদ্যা-বিদ্বেষী" এবং "বিদ্যাবল্লভ" না হইয়া পারেন না; সুতরাং এই হিসাবে "হরিবল্লভ" নামের পরিবর্তে "বিদ্যাবল্লভ" নাম অপ্রযোজ্য নহে; তদ্‌ভিন্ন "ঋষ-কেতন-তন্ত্র" ইত্যাদি দ্বারা পদকর্তা যে কামশাস্ত্রবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সখীস্থানীয় পদকর্তার যে "আজীব" অর্থাৎ জীবন উপায় সে বিষয়েও একটা প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক; পদকর্তা নিজকে "বিদ্যাবল্লভ" নামে অভিহিত করিয়া "কাব্যলিঙ্গ"-অলঙ্কারের সাহায্যেই বুঝাইতেছেন যে, যেহেতু তিনি বিদ্যাবল্লভ সেই জন্য নিতান্ত প্রীতিজনক বর্ণিত কামশাস্ত্রবিদ্যা তাঁহার প্রিয় উপজীব্য অর্থাৎ জীবনাবলম্বন বটে; কেননা ইহা ব্যতীত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের জীবনরক্ষা হয় না, সুতরাং ঐ বিদ্যার অভ্যাস না করিলে সখীস্থানীয় পদকর্তা এই বিদ্যাবল্লভের ও তাহার প্রিয় কর্তব্য যুগলের সেবাকার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এখন বিচার্য এই যে এই কলিগুলি "খনে খনে" ইত্যাদি পদের রচয়িতারই রচিত কিনা অথবা অন্য কাহারও দ্বারা পরে সংযোজিত হইয়াছে? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, কি ভাষা, কি ভাব, কোন দিক দিয়া দেখিলেই এই পংক্তিগুলির সহিত পূর্বোদ্ধৃত পদের সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

পূর্বোদ্ধৃত পদ শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতীর উক্তি ; কিন্তু এই শেষোক্ত পংক্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে, অর্থের সুসঙ্গতি হয় না। দেবকী-নন্দন যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' গ্রন্থের সটীক সুবৃহৎ সংস্করণের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় এই পংক্তিগুলি দূতীরই সপরিহাস বাক্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু "দূতী সেয়ানি করহ সোই ঠাট। পণ্ডিত হাম পঢ়ায়ব পাঠ॥" অর্থাৎ হে চতুরে দূতি! সেই আয়োজন কর, পণ্ডিত আমি (শ্রীরাধাকে) মীনকেতনতন্ত্র অর্থাৎ কামশাস্ত্রের পাঠ পড়াইব, এই উক্তির অক্ষর কিংবা অর্থ. কিছুতেই ইহা দূতীর বাক্য বলিয়া মনে করা যায় না। উক্ত সম্পাদক মহাশয় এই পদের মন্তব্যে লিখিয়াছেন—"কোন লিপিকারকের অনবধানতা কি অন্য কোন কারণে দুইটা স্বতন্ত্র পদ একত্র হইয়া গিয়াছে কিনা বিবেচ্য।" আমরা তাঁহার এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আমাদেরও অনুমান হয়, "খনে খনে" ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র পদে পূর্বে কোন ভণিতা না থাকায় "বিদ্যাবল্লভ" বা "হরিবল্লভ" যিনিই হউন শেষোক্ত পংক্তিগুলির যোগ করিয়া এই পদটা সম্পূর্ণ করিয়া থাকিবেন। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কলিটা কোন পুথিতে পাইলে, তাহা লুপ্ত করিয়া এভাবে স্বীয় নামাঙ্কিত ভণিতার সংযোগ পরস্বাপহরণেরই প্রকারান্তর বটে। কোন বৈষ্ণব পদকর্তাই সেরূপ অপকার্য করিতে পারেন না। সুতরাং 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' গ্রন্থের সঙ্কলন সময়ে অর্থাৎ 'পদকল্পতরু'রও প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই পদে যে বিদ্যাপতির ভণিতা ছিল না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভণিতা না পাওয়া গেলেও পদটা যে অন্যের রচিত, তাহাতে তো সন্দেহ নাই ; এরূপ অবস্থায় বিদ্যাপতির পদের লুপ্ত অংশের পূরণ করিতে যাইয়া গোবিন্দদাস স্বরচিত ভণিতায় বিদ্যাপতির নামের পরে নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। এই পদটা বিদ্যাপতির বলিয়া জানিতে পারিলে 'গীতচিন্তামণি'র পদকর্তাও বোধ হয় সেরূপ করিতেন, কিন্তু পদের রচয়িতার স্থিরতা না থাকায়, তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই ; অথচ স্বরচিত পংক্তিগুলি অপরের রচিত পদের সহিত মিশাইয়া দিয়া শেষে নিজের নাম যোগ করিলে, তাহাও পরস্বগ্রহণ বলিয়া গর্হিত কার্য হইবে বিবেচনায়, নিজের প্রকৃত নাম "হরিবল্লভ" "রাধাবল্লভ" যাহাই থাকুক না কেন, উহা না লিখিয়া, পূর্ব-ব্যাখ্যাত তাৎপর্য বুঝাইবার ও নিজকে পরস্বাপহরণ পাপ হইতে রক্ষা করার অভিপ্রায়েই ভণিতায় এই

কল্পিত ধ্বনিগর্ভ নামের ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ প্রতীতি হয়। সে যাহা হউক, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা চক্রবর্তীপাদ যে পদটাকে বিদ্যাপতির ভণিতাহীন অবস্থায় পাইয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষেই বিদ্যাপতির রচনা কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

নগেন্দ্রবাবু পদটীকায় 'গীতচিন্তামণি'র উক্ত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতে যাইয়া, "ঋষকেতন তন্ত্র", "লেং" ও "শিখাং" স্থলে যথাক্রমে "ঋষকেতন মন্দ" "লেই" ও "শিখাও"—এই অর্থহীন অপ্রামাণিক পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং "আজীব"—এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"আজীব-কহে।" তিনি একখানা ভাল অভিধান দেখিলেই জানিতে পারিতেন যে, "আজীব" শব্দ কোন ক্রিয়াপদ নহে; ইহা একটী সংজ্ঞা; ইহার অর্থ—জীবনোপায় বা জীবনের অবলম্বন।

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে "চৌংকি" ও "হৃদয়জ মকুলিত" স্থলে যথাক্রমে "চউকি" ও "হৃদয় মুকুলি" পাঠ গৃহীত হইয়াছে। "চউকি" পাঠ অপ্রামাণিক ও অর্থশূন্য। "চেঁংকি" বা "চৌঁকি" শুদ্ধ পাঠ বটে।

"হৃদয় মুকুলি" পাঠ ছন্দোভঙ্গদুষ্ট ও অর্থশূন্য। নগেন্দ্রবাবু উহার কাল্পনিক অর্থ লিখিয়াছেন—"হৃদয়জাত মুকুল (পয়োধর)।" বস্তুতঃ "হৃদয়জ" "উরোজ" "বক্ষোজ" প্রভৃতি শব্দ স্তন অর্থে প্রসিদ্ধ। "মকুলিত" বা "মুকুলিত" শব্দের অর্থ—"অঙ্কুরিত"। সুতরাং "হৃদয়জ মুকুলিত" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বক্ষে স্তন অঙ্কুরিত দেখিয়া কখনও উহা অঞ্চল দ্বারা আবৃত করেন, আর কখনও (উহাতে) ভুল হয় অর্থাৎ স্তন আবৃত করিতে ভুলিয়া যান।

নগেন্দ্রবাবু "বালা শৈশব তারুণ ভেট" পাঠ ধরিয়া অর্থ লিখিয়াছেন—"বালিকায় শৈশব (ও) যৌবনের সাক্ষাৎ হইয়াছে।" এরূপ অর্থ করিলে "বাল" শব্দের পরে অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন, "ও" শব্দ এবং "হইয়াছে" ক্রিয়াপদ এই তিনটী উহ্য করিতে হয়। আমাদের উদ্ধৃত পাঠে কোন উহ্য না করিলেও চলে। "ভেট" শব্দটা সাক্ষাৎ করা অর্থে ক্রিয়াপদ রূপেও ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা—"ভেটিল" "ভেটিলাম" ইত্যাদি। সুতরাং "শৈশবে" বা "শৈশব" যাহাই পাঠ হউক না কেন, এই বাক্যের সহজ ও সরল অর্থ—বালা (শ্রীরাধা) শৈশব অবস্থায় যৌবনের সাক্ষাৎ পাইলেন। বলা বাহুল্য যে "শৈশবে" পাঠই অপেক্ষাকৃত সমীচীন বটে; কেননা বালা শ্রীরাধার শৈশব অবস্থা তো পূর্ব হইতেই চলিতেছে; সুতরাং যৌবনের সঙ্গে

সঙ্গে শৈশবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, একথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না ; এজন্য 'পদকল্পতরু'র পাঁচখানা হস্তলিখিত পুথিতে "শৈশব" পাঠ থাকিলেও আমরা 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর' পুথি অনুসারে আমাদিগের সম্পাদিত সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে "শৈশবে" পাঠই গ্রহণ করিয়াছি ; উহাই নির্দোষ মনে হয় ।

(১০ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবু "না রহে গুরুজন মাঝে" ইত্যাদি পদটীর যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতেও অনেক ভুল আছে ; সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে আমরা ঐ পদটীর শুদ্ধ পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করিব। এই পদটী 'পদামৃত-সমুদ্র' ও 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' উভয় গ্রন্থেই আছে। মুদ্রিত 'পদামৃতসমুদ্রে'র মূলের ধৃত পাঠের সহিত স্থানে স্থানে রাধামোহন ঠাকুর মহোদয়ের সংস্কৃত টীকার অনৈক্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, এরূপ স্থলে টীকানুযায়ী পাঠই নির্ভরযোগ্য বটে। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র পাঠও প্রায় 'পদামৃতসমুদ্রে'র অনুরূপ ; যেখানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, আমরা পরে উহার উল্লেখ করিব। এখানে 'পদামৃতসমুদ্রে'র সমাদৃত পাঠই উদ্ধৃত হইল।

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত (১) অঙ্গ ন ছাপাওই (২) লাজে ॥
বালিক (৩) সঙ্গে যব রহই (৪)।
তরুণি (৫) পাই পরিহাস তহিঁ (৬) করই ॥
মাধব !—তুঅ লাগি (৭) ভেটলুঁ (৮) রমণী।
কো কহু (৯) বালা কো কহু তরুণী ॥ ধ্রু ॥
কেসি রভস যব শুনে।
আনত (১০) হেরি ততহিঁ (১১) দেই কাণে ॥
ইথে কোই ভরু (১২) পরচারি (১৩)।
কাঁদন মাখি (১৪) হাসি দেই গারি (১৫) ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে (১৬)।
বালা-চরিত রসিক পুন জানে ॥

---

(১) ব্যক্ত, অনাচ্ছাদিত। (২) অনাচ্ছাদিত করে। (৩) বালিকা। (৪) রহে। (৫) তরুণী, যুবতী। (৬) সেখানে। (৭) তোমার লাগিয়া। (৮) সাক্ষাৎ করিলাম। (৯) কহে। (১০) অন্যত্র। (১১) সেই স্থানে। (১২) করে। (১৩) প্রচার, প্রকাশ। (১৪) মিশাইয়া। (১৫) গালি। (১৬) কহে।

'গীতচিন্তামণি'তে "বালিক সঙ্গে" ইত্যাদি কলির পরিবর্তে পাঠ আছে—

বালা-জন সঞে বাসে।
তরুণী পাই তাহি পরিহাসে॥

"রহই" বা "বসই" ক্রিয়াপদের অর্থে "বাসে" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ পদাবলী-সাহিত্যে দেখা যায় না; সুতরাং "বাসে" পাঠ লইলে, উহার অর্থ "গৃহে" ধরিয়া "রহই" ক্রিয়াপদটি উহ্য করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদপেক্ষা 'পদামৃতসমুদ্রে'র পাঠই ভাল মনে হয়। যাহা হউক, প্রথমেই পদটির ছন্দ লক্ষ্য করার যোগ্য, কেননা ইহার অযুগ্ম চরণগুলি (কেবল ধ্রুব-কলি ব্যতীত) বারো মাত্রায় এবং যুগ্ম চরণগুলি ষোল মাত্রায় গঠিত বটে। ধ্রুব-কলির উভয় চরণেই ষোল মাত্রা আছে। নগেন্দ্রবাবুর কেবল ভণিতার কলিতে এই মাত্রা-বিভাগ বজায় আছে, কিন্তু অন্যান্য কলিতে জানি না কি জন্য তিনি ষোল মাত্রার পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—

খন ভরি নহি রহ গুরুজন মাঝ। (১ম চরণ)
বালা জন সঙ্গে সব রহই। (৩য় চরণ)
কেলিক রভস যব শুনে আনে। (৭ম চরণ)
ইথে যদি কেও করএ পরচারী। (৯ম চরণ)

অধিকাংশ পদেই ধ্রুব-কলির গঠনে অন্যান্য কলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা দেখা যায়; সুতরাং আলোচ্য পদেরও ৫ম চরণে "মাধব"—এই প্রয়োজনী সম্বোধন-পদটী থাকায় বারো মাত্রা স্থলে ষোল মাত্রা হইয়াছে বলিয়া কোন দোষের কারণ হয় নাই; কিন্তু এই পদের ভণিতার কলির প্রথম চরণটী সর্ববাদিসম্মত রূপে বারো মাত্রাবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বে অযুগ্ম ১ম, ৩য়, ৭ম ও ৯ম চরণগুলি ষোল মাত্রাত্মক হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না; সুতরাং নগেন্দ্রবাবু যে জন্যই উক্ত অযুগ্ম চরণগুলিতে ষোল মাত্রার পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন না কেন ঐরূপ পাঠ যে অশুদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থের বিচার দ্বারাও নগেন্দ্রবাবুর ঐ পাঠ সমীচীন মনে হয় না। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার "খন ভরি নহি রহ" ইত্যাদি চরণের টীকায় লিখিয়াছেন—"ক্ষণকালও গুরুজনের মধ্যে থাকেনা (তাঁহাদিগের সাক্ষাতে অধিক সম্ভ্রম করিতে হয়)।" বস্তুতঃ যৌবনের প্রারম্ভে বালক ও বালিকাদের সম্ভ্রমবোধ জন্মিলে উহারা গুরুজনের সাক্ষাতে কতকটা সঙ্কুচিতভাবে থাকা অপেক্ষা সমবয়সীদিগের সঙ্গেই যে থাকিতে অধিক ভালবাসে ইহা সত্য কথা। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কবি প্রথমেই যৌবনোদয়ের এই বিচিত্র

স্বভাবের বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, শ্রীরাধার চরিত্রে তখন পর্যন্ত বালিকাস্বভাব বর্তমান থাকিলেও যৌবনধর্ম লজ্জা ও সঙ্কোচেরই কিঞ্চিৎ প্রাবল্য ঘটিয়াছে। শ্রীরাধা এখন পার্যমাণে অধিক সময় গুরুজনের নিকট থাকিতে চাহেন না; ফাঁক পাইলেই সমবয়সী সখীদের সহিত যাইয়া মিলিত হন—ইহা বলাই কবির অভিপ্রেত বটে; তাই তিনি "না রহে গুরুজন মাঝে"—এই সাধারণ উক্তি দ্বারা সেই কথাটা বুঝাইয়াছেন। "খন ভরি নহি রহ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এ সাধারণ উক্তিটার উপর জোর দিয়া, শ্রীরাধা ক্ষণকালও গুরুজনের নিকটে থাকেন না বলিলে, উহা দ্বারা গুরুজনের প্রতি শ্রীরাধার অনাদর ও কর্তব্যনিষ্ঠার অভাবই বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং রমণীরত্ন শ্রীরাধার সম্বন্ধে তাদৃশ উক্তি কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার "কেলিক রভস" ইত্যাদি চরণের "আনে" শব্দটীর টীকা করিয়াছেন—"আনে—অপরের নিকট।" "আনে" শব্দের এরূপ অর্থও সমীচীন মনে হয় না। কেলি-রহস্যের কথা যখন শোনে—ইহা বলিলেই অন্যের নিকট হইতে শোনা বুঝা যায়। এরূপ স্থলে—"আখ্যাতোপযোগে" এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে, যাহার নিকট হইতে কিছু শোনা যায়, তাহার পরে অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি না হইয়া অধিকরণ কারকে "এ" বিভক্তি প্রয়োগ সঙ্গত হইতে পারে না। পদাবলী-সাহিত্যে কর্তৃকারকে, কর্মকারকে বা অধিকরণ কারকেই "আনে" পদটীর প্রয়োগ দেখা যায়; অপাদান কারকে "অন্যের নিকট হইতে" অর্থ বুঝাইতে "আনে" পদের প্রয়োগ দেখা যায় না; এবং সেরূপ প্রয়োগ কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু "বালাজন" ইত্যাদি কলিটীর অর্থ কাব্যবিশারদের অনুকরণে লিখিয়াছেন "৪। তহিঁ—সেইজন্য অতএব। ৩-৪ যখন বালিকাদিগের সঙ্গে থাকে তাহারা (তাহাকে) তরুণী পাইয়া (মনে করিয়া) সেই কারণে পরিহাস করে।" এরূপ অর্থও সমীচীন নহে। বালিকারা তাহাদের ক্রীড়ার সাথী শ্রীরাধাকে তরুণী বলিয়া মনে করার বিশেষতঃ সেজন্য তাঁহার প্রতি অধিক সম্ভ্রম না দেখাইয়া, বেয়াদবিসূচক ঠাট্টা-পরিহাস করার কোন কারণ নাই। মহাকবি বিদ্যাপতি যে এরূপ একটা অস্বাভাবিক বর্ণনা করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর মনে হয় না। বৈষ্ণব মহাজন প্রসিদ্ধ রাধামোহন ঠাকুর মহোদয় তাঁহার সংস্কৃত টীকায় এই কলিটীর তাৎপর্যব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "বালিকা সঙ্গেন বাল্যং সূচিতং। তরুণ্যা সহ পরিহাসঃ বাল্যোপমর্দ্দকঃ।"

ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য কলির ন্যায় এই কলিটীতেও কবি যুগপৎ শ্রীরাধার বাল্য ও যৌবনের স্বভাব বর্ণন করিতেছেন। বালিকাদের সঙ্গে অবস্থান দ্বারা তাঁহার বালিকাস্বভাব এবং দৈবাৎ কোন যুবতীকে পাইয়া তাঁহার সহিত পরিহাস-আলাপ দ্বারা তাঁহার বাল্যভাবের বিরোধী (উপমর্দক) যৌবনস্বভাব জানা যাইতেছে। সুতরাং "পরিহাস করে" ক্রিয়ার কর্ত্রী বালিকাগণ নহে কিন্তু শ্রীরাধা বটে। তিনি যখন বালিকাদের মধ্যে থাকেন, তখনও দৈবাৎ কোন তরুণীকে নিকটে পাইলে রসালাপের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সেখানে পরিহাস করিয়া থাকেন ইহাই এই বাক্যের সঙ্গত ও স্বাভাবিক অর্থ বটে। সার গ্রীয়ারসন্ সাহেব মহোদয়ের Maithili Chrestomathy গ্রন্থের শব্দকোষে "তহিঁ" শব্দের অর্থ therefore লিখিত হইয়াছে। এখানে "তহিঁ" নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে ("তহি") পাঠ আছে "তহি" নহে; সুতরাং, উহার অর্থ "সেইজন্য, অতএব" সঙ্গত মনে হয় না। "তহাঁ" "তাহাঁ" ও "তহিঁ" শব্দের প্রয়োগ পদাবলীতে সর্বত্রই পাওয়া যায়। উহাদের অর্থ সেখানে, তথায়। সংস্কৃত "তত্র" (প্রাকৃত তৎথ) শব্দের অপভ্রংশ হইতে "তহাঁ" ইত্যাদি শব্দগুলির উদ্ভব হইয়াছে। গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের লিখিত "তহি" শব্দটীর সহিত বাঙ্গালা তাই (সেজন্য) তুলনীয়। বোধহয় সংস্কৃত "তৎ-হি" হইতেই অপভ্রংশ "তা-হি" "তা-ই" "তহি" শব্দগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। "তহি" ও "তহিঁ" শব্দদ্বয়ের রূপ প্রায় এক প্রকার; সুতরাং শব্দ দুইটীর মধ্যে গোলযোগ হওয়া খুব স্বাভাবিক বটে।

রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সংস্কৃত টীকায় এই পদটীর তাৎপর্য যেমন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্য কোন টীকায়ই সেরূপ দেখা যায় না। আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগের প্রীতির জন্য রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যাত আভাষ ও শেষ তিনটী অপূর্ব কলির টীকা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। রাধামোহন ঠাকুর আপ্ত-দূতীর উক্তি "শৈশব যৌব দরশন ভেল। দুহুঁ দলবলে ধনি দ্বন্দ্ব পরি গেল॥" ইত্যাদি পদে শ্রীরাধার শৈশব ও যৌবনের মধ্যে বাল্যেরই প্রাবল্য প্রদর্শিত করিয়া তৎপরে উদ্ধৃত "না রহে গুরুজন মাঝে" ইত্যাদি পদটির তাৎপর্য বুঝাইতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

> ইতি শ্রুত্বা ত্বয়া তস্যা বাল্যাধিক্যং কথিতং তদা কথং তন্নামশ্রবণং কারয়িত্বা মাং পীড়য়সীতি দৃগ্‌ভঙ্গ্যা স্ববৈবশ্যমুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং জ্ঞাত্বা তত্তারুণ্যপ্রাধান্যং ত্বৎকৃতে দৌত্যে গতাহমিতি চ "না রহ গুরুজন মাঝ" ইত্যাদিনাহ।

কেলিরহসশ্রবণং তারুণ্যপ্রাধান্যং তত্রাপি বাল্যস্য বলনালুজ্জয়ান্য-বস্তুনিরীক্ষণছদ্মাদিকং প্রাপ্তং। তৎপ্রচারে বাল্যভাবস্য রোদনমিশ্রতারুণ্যজনিত হাস্যমিলিত-কটুক্ত্যা তৎপ্রাধান্য-মিত্যাদি বাক্‌কৌশলং রসিকস্য বেদ্যং নান্যস্যেত্যনেন পরমরসিকস্য তব সঙ্গমকালঃ সংবৃত্তঃ নত্ববিদগ্ধস্য তৎপতেঃ স্বভাবিকোভয়নিষ্ঠাকর্ষকগুণাজ্ঞনবস্থানাদিতি ভাবঃ।

অর্থাৎ দূতীর কথিত "শৈশব যৌবন' ইত্যাদি বর্ণন শ্রবণ করিয়া, তুমি দূতী শ্রীরাধার বাল্যাবস্থার প্রাধান্য বর্ণিত করিলা,তবে (নিরর্থক) তাহার নাম আমি শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ, নয়ন-ভঙ্গী দ্বারা দূতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ এরূপে নিজের বিবশতা প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া, (শ্রীরাধার শৈশব-প্রাবল্য প্রকৃত নহে, উহা তোমার মন বুঝিবার জন্যই বলা হইয়াছে) প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধার দেহে এখন যৌবনেরই প্রাবল্য ঘটিয়াছে এবং তোমার জন্যই আমি শ্রীরাধার নিকট দৌত্যকার্যে গিয়াছিলাম, দূতী "না রহ" ইত্যাদি পদের দ্বারা তাহাই বলিতেছেন।

কেলি-রহস্যের শ্রবণ দ্বারা যৌবনের প্রাধান্য, আবার তাহাতে বাল্যের প্রভাব লজ্জাবশতঃ অন্যত্র নিরীক্ষণরূপ ছল বুঝা যাইতেছে। সেই ছলের কথা প্রকাশ পাইলে বাল্যসূচক রোদন ও যৌবনসূচক হাস্যমিশ্রিত গালি দ্বারা যৌবনেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। দূতীর উক্তির এই গূঢ় রহস্য কেবল রসিক ব্যক্তিরই বোধগম্য ; অন্যের নহে। সুতরাং উহাদ্বারা পরম রসিক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনের শুভকাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই দূতীর উক্তির সারমর্ম্ম বটে। অরসিক পতির সহিত কিন্তু শ্রীরাধার সম্মিলন ঘটিতে পারে নাই ; কেননা, নায়ক ও নায়িকার উভয়গত যে সকল স্বাভাবিক গুণে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে শ্রীরাধা ও তৎপতির মধ্যে সে সকল গুণের অবস্থান ছিল না। পরবর্তী বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীরাধার অনন্যপরতা রক্ষা করার জন্য তাঁহার পতিস্মন্য আয়ানের নপুংসকতা বর্ণিত হইয়াছে, বিদ্যাপতির সময়ে এই তত্ত্বটী প্রচারিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। বিদ্যাপতির কোন পদেই আমরা এ বিষয়ের কোন ইঙ্গিত পাই নাই। রাধামোহন ঠাকুর "বালা-চরিত রসিক পুন জানে" এই বাক্যের ধ্বনি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আয়ানের অজ্ঞতা ও অরসজ্ঞতাই সূচিত হইয়াছে। অন্তিম চরণের "পুন" অর্থাৎ "কিন্তু" শব্দটীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রসজ্ঞতা ও অন্যের অরসজ্ঞতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে ; সুতরাং নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যে, "পুন" স্থলে "জন" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, উহাও এখানে সঙ্গত মনে হয় না।

(১১ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ১১ সংখ্যক পদটী নেপালের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; উহা অন্য কোন সংস্করণে নাই। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণও এখন অপ্রাপ্য হওয়ায় আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ পদটী নগেন্দ্রবাবুর টীকাসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

(দূতীর উক্তি)

ভোঁহ ভাঙ্গি লোচন ভেল আড়।
তৈঅও ন শৈশব সীমা ছাড়॥ ২।
আবে হসি হৃদয় চীর লএ থোএ।
কুচ কঞ্চন অঙ্কুরএ গোএ॥ ৪।
হেরি হল মাধব কএ অবধান।
যৌবন পরসে সুমুখি আবে আন॥ ৬।
সখী পুছইতে আবে দরশএ লাজ।
সঁীচি সুধাএ অধ বোলিঅ বাজ॥ ৮।
এত দিন শৈশবে লাওল সাঠ।
আবে সবে মদনে পঢ়াউলি পাঠ॥ ১০।
(নেপালের পুথি।)

পাদাকুলক ছন্দ।

১—২। ভ্রূ ভাঙ্গিয়া (ভ্রূভঙ্গ করিতে শিখিয়াছে), লোচন আড় হইল (আড় দৃষ্টি হইল), তথাপি শৈশব সীমা ছাড়ে না (শৈশব তাহার দেহকে ত্যাগ করিতে চাহে না)।
৩—৪। এখন হাসিয়া বসন লইয়া হৃদয়ে রাখে (বক্ষে কাপড় দেয়), কাঞ্চন (বর্ণ) কুচাঙ্কুর গোপন করে।
৫। হল (এই শব্দ নানা অর্থব্যঞ্জক, অপর ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হয়)—চল।
৬। আন—অন্য।
৫—৬। মাধব, অবধানপূর্বক দেখিয়া চল (লও), যৌবনের স্পর্শে সুমুখী এখন অন্য (রূপ) হইয়াছে।
৭। দরশএ—দেখায়। ৮। সঁীচি—সিঞ্চন করিয়া। অধ—অর্দ্ধ। বোলী—কথা। বাজ—কহে।

৭—৮। সখী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জা দেখায়, অমৃত সিঞ্চন করিয়া অর্দ্ধ (লজ্জাবশতঃ অসম্পূর্ণ) কথা কহে।

৯। সাঠ—সাথ, সঙ্গে।

৯—১০। এতদিন শৈশব সঙ্গে আনিয়াছিল, এখন মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল।

এই পদের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, নেপালের একখানা মাত্র পুথিতে এই পদটী পাওয়া গিয়াছে। এই পদের অন্য কোন রূপান্তর মৈথিল বা বাঙ্গালা পুথিতে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পদের যেরূপ পাঠ ঐ পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, বোধহয়, সেইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

মিথিলার সংলগ্ন নেপালের প্রদেশ-বিশেষের নাম মোরঙ্গ; বেণীপুরী মহাশয় বলেন যে, মোরঙ্গ-ওয়ালা অর্থাৎ নেপালবাসী লোকেরা বিদ্যাপতির পদে নেপালী রং চড়াইয়াছেন। বস্তুতঃ একথা খুব সত্য। ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ একটু অভিনিবেশ সহকারে নেপালী পুথির এই সকল পদ মৈথিল-পুথির পদাবলীর সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী অনেক স্থলে বাঙ্গালার নিজস্ব "ব্রজবুলী" ভাষার রূপ এবং কোন কোন স্থলে এমন কি খাঁটি বাঙ্গালার রূপ ধারণ করিয়াছে, নেপালেও এই স্বাভাবিক রূপান্তর না ঘটিয়া যায় নাই; সুতরাং নেপালী পুথির পাঠই বিদ্যাপতির পদের মৌলিক (Original) পাঠ কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। তর্কস্থলে যদি নেপালী পুথির পাঠ মৌলিক বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও অন্ততঃ লিপিকরদিগের ভ্রম-প্রমাদ ও লেখার কায়দার গতিকে মৈথিল ও বাঙ্গালা পুথির মত নেপালী-পুথিখানিতেও যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে, সুতরাং অবিচারে উহার সমস্ত পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে না; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে উদ্ধৃত পদটীতে "আবে" শব্দটী চারিবার প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই উহাকে দ্বিমাত্রাত্মক "অব" শব্দের মত পড়িতে হইবে, নতুবা ছন্দ বজায় থাকিবে না। মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও অনেক স্থলে "অব" শব্দের পরিবর্তে "আব" বা "আবে" ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ স্থলে "আবে" না লিখিয়া "অব" লিখাই সঙ্গত ছিল। সেরূপ না লিখিয়া "অব" স্থলে "আবে" লিখা যে লিপিকরের ভুল হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নগেন্দ্রবাবু লিপিকরের এই ভুল পাঠ তাঁহার সংস্করণে

অবিচারে মুদ্রিত করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। তদ্রূপ "তৈঅও" শব্দটীও ত্রিমাত্রাত্মক রূপে পাঠ না করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে; অথচ প্রকৃতপক্ষে উহা ২+১+২=৫ মাত্রাত্মক বটে; উহাকে ত্রিমাত্রাত্মক গণ্য করিতে হইলে "তৈ" ও "ও" অক্ষর দুইটীকে লঘুরূপে পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু এখানে প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে প্রথম গুরু অক্ষরটীর মর্যাদা-রক্ষা ও সুশ্রাব্যতার জন্য "তৈ" অক্ষরটীর দীর্ঘ উচ্চারণই আবশ্যক বটে; সুতরাং "তৈঅও" শব্দ না লিখিয়া "তৈও" লিখা এবং উহার "তৈ" অক্ষর গুরু ও "ও" অক্ষর হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া তিন মাত্রা পূরণ করাই কর্তব্য বটে। মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও অনেক স্থলেই ত্রিমাত্রাত্মক "তৈও" পাঠের ব্যবহার দেখা যায়; সুতরাং এখানেও সেরূপ পাঠ গ্রহণ না করা সঙ্গত হয় নাই।

এখন এই পদের কতকগুলি শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

নগেন্দ্রবাবু "ভাঙ্গি" শব্দের অর্থ "ভাঙ্গিয়া" লিখিয়াছেন; কিন্তু উহাতে সঙ্গত অর্থ হইয়াছে কি? নায়িকার যৌবনসুলভ বিভ্রম-বিলাসের প্রকাশার্থে কিরূপ ভ্রূভঙ্গী করে, কিরূপ আড় অর্থাৎ বক্রদৃষ্টি করে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু ভ্রূভঙ্গীর সহিত বক্রদৃষ্টির কার্যকারণ সম্বন্ধে আছে কি? ভ্রূভঙ্গী না করিয়া বক্রদৃষ্টি কিংবা বক্রদৃষ্টি না করিয়া ভ্রূভঙ্গী করা যাইতে পারা যায় না কি? অবশ্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে চোখে একটু টান পড়ে, কিন্তু তাহাকেই কি বক্রদৃষ্টি বলা যায়? আমাদের বিবেচনায় এখানে "ভাঙ্গি" শব্দের "ভাঙ্গিয়া" অর্থ সঙ্গত নহে। এখানে "ভাঙ্গি" শব্দের অর্থ "ভঙ্গী" করিলে অন্বয় বা অর্থের কোন অসঙ্গতি থাকে না; "ভৌহ ভাঙ্গি" ইত্যাদি বাক্যের সরল ও সঙ্গত অর্থ এই যে, শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গী ও লোচন বক্র হইল অর্থাৎ শ্রীরাধা ভুরু বাঁকাইয়া বক্রভাবে দৃষ্টি করিতে শিখিলেন। "অব" শব্দ যেমন লিপিকরের লেখার ভুলে অথবা লেখার কায়দায় "আবে" হইয়াছে, এখানেও তেমনি "ভঙ্গি" "ভাঙ্গি" পাঠে পরিণত হইয়াছে। 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় "ভৌঁহ ভাঙ্গি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন — "ভ্রূভঙ্গ করনে লগী ঔর ছিপ্ কর কটাক্ষ করনে লগী", তাঁহার লেখার ভাবে মনে হয় যে, তিনিও "ভৌঁহ-ভাঙ্গি" অর্থে "ভ্রূভঙ্গী" অর্থই বুঝিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু "তথাপি শৈশবসীমা ছাড়ে না" বাক্যের তাৎপর্য লিখিয়াছেন, "শৈশব তাহার দেহকে ত্যাগ করিতে চাহে না"। এ কথায় সীমা ছাড়ে না—বাক্যের ধ্বনি ঠিক প্রকাশ পায় নাই। "সীমা" শব্দের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ অর্থ "মর্যাদা" এবং "মর্যাদা" শব্দের অর্থ "ন্যায্য পথে স্থিতি"। যাহার পক্ষে যাহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম বা আচরণ উহাই উহার "মর্যাদা" বটে। শৈশবের স্বাভাবিক ধর্ম বা আচরণই শৈশবের সীমা বা মর্যাদা বটে; নতুবা নায়িকার সঙ্গে শৈশবের কোন সীমারেখা (boundary line) থাকিতে পারে না এবং তাহার প্রসঙ্গও কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। শৈশব তাহার সীমা বা মর্যাদা ছাড়ে না এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, ভ্রূভঙ্গী ও কটাক্ষদৃষ্টিরূপ যৌবনকার্য আরম্ভ হইলেও শৈশব অর্থাৎ বালভাব উহার স্বাভাবিক আচরণ পরিত্যাগ করিল না অর্থাৎ যৌবনের আরম্ভেও শ্রীরাধার আচরণে বাল্যভাবেরই প্রাবল্য প্রকাশ পাইতেছে।

নগেন্দ্রবাবুর "কাঞ্চন (বর্ণ) কুচাঙ্কুর গোপন করে"—এই অর্থও আমাদের প্রীতিকর মনে হয় না। শ্রীরাধার বর্ণ সর্বাঙ্গেই কাঞ্চনতুল্য থাকা সত্ত্বে কবি বিশেষ করিয়া "কুচাঙ্কুর"কে কাঞ্চনবর্ণ বলিবেন কেন? বরং বিদ্যাপতি নব যৌবনার কুচাঙ্কুরকে আরক্তিম বলিয়াই অন্যত্র বর্ণিত করিয়াছেন, যথা—

উরজ-উদয় থল লালিম দেল

(৪-সংখ্যক পদ)

সুতরাং পূর্বোক্ত উভয় কারণেই "কাঞ্চন" শব্দের প্রসিদ্ধ "স্বর্ণ" অর্থ ত্যাগ করিয়া "স্বর্ণবর্ণ" অর্থ করার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। আমাদের মনে হয় যে এখানে "কাঞ্চন" শব্দের প্রসিদ্ধ "স্বর্ণ" অর্থ করিলে সঙ্গতি হইতে পারে। "কুচ কাঞ্চন" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ তাহা হইলে এই হইবে যে, শ্রীরাধা কুচরূপ স্বর্ণ গোলককে (উহার) অঙ্কুর অবস্থায়ই গোপন করিতেছেন। স্বর্ণগোলক লোভনীয় বস্তু; আবার যদি ঐ স্বর্ণগোলক ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হয়, তাহা হইলে এরূপ অপূর্ব স্বর্ণগোলক হস্তগত করার জন্য কাহার না লোভ হয়? সজ্জন ব্যক্তি নিজে যে পরের ধনে লোভ করেন না, কেবল ইহা নহে,—তিনি অন্যকে প্রলোভিত করাও অসঙ্গত কার্য মনে করেন; সুতরাং সুচরিত্রা শ্রীরাধা তাঁহার পরম লোভনীয় ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল স্বর্ণগোলকরূপ স্তনযুগলকে উহাদের অঙ্কুর-অবস্থায়ই আচ্ছাদিত করিতেছেন, "কুচ কাঞ্চন" ইত্যাদি অপূর্ব ধ্বনিপূর্ণ বাক্যদ্বারা এই সমস্ত ভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে। বলা

বাহুল্য যে "কাঞ্চন" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ "স্বর্ণবর্ণ" করিলে এই বিচিত্র "ধ্বনি" সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। মহাকবি বিদ্যাপতির অনেক কথাই এরূপ বিচিত্র ব্যঞ্জনাপূর্ণ; দুঃখের বিষয় যে টীকাকারদিগের অপ্রণিধানে ঐ সকল বাক্যে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা দূরে থাকুক, অর্থের সহজ সঙ্গতিই পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু "হল" শব্দটী "নানা অর্থব্যঞ্জক" বিবেচনা করিয়া, এখানে উহার অর্থ লিখিয়াছেন— "চল"; আবার "দেখিয়া চল" এই অদ্ভুত বাক্যটীর সঙ্গত অর্থ হয় না বলিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন — "(দেখিয়া) লও"। বস্তুতঃ যদি "হল" শব্দটী কল্পতরুর মত নানা অর্থের প্রদায়ক হয়, তাহা হইলে এরূপ ব্যর্থ পরিশ্রম না করিয়া একবারেই "হল" হইতে "লও" অর্থের নিষ্কাশন করিলেই তো কার্যসিদ্ধি হইতে পারিত; সেরূপ না করার কি কি কারণ আছে? বস্তুতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর অনেকার্থ স্বীকৃত হইলেও বিনা কারণে ও বিনা যুক্তিতে অপভ্রংশ ভাষায় ধাতুসকলের যাহা ইচ্ছা তাহাই অর্থ করা যাইতে পারে না। সংস্কৃত কোন্ ধাতু হইতে অপভ্রংশ কোন্ ধাতুটীর উৎপত্তি হইয়াছে, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) নিয়মানুসারে উহার বিশেষ আলোচনা করিয়াই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবু সংস্কৃত, হিন্দী, মৈথিলি প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও বিদ্যাপতির ব্যবহৃত সন্দিগ্ধ সুবন্ত পদ ও তিঙন্ত পদ সকলের অর্থ লিখিতে যাইয়া কুত্রাপি ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আলোচ্য শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। অধিকাংশ অনভিজ্ঞ সম্পাদকের ন্যায় তিনিও শুধু প্রকরণ (context) দেখিয়া আন্দাজে অর্থ লিখিয়া দিয়াই দায়িত্ব এড়াইয়াছেন। এজন্য এরূপ বহুসংখ্যক স্থলেই তাঁহার প্রতিপাদিত অর্থ অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত প্রায়ই অভীষ্টস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই। যাহা হউক "হল" শব্দটার প্রকৃত অর্থ কি বিচার করিতে হইলে প্রথমে উহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় আবশ্যক। আমাদের মনে হয় যে, সংস্কৃত "লভ" ধাতু হইতে অপভ্রংশ "লহ" বা "লঅ" এবং "লহ" হইতেই ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে অক্ষর বিপর্যাস দ্বারা "হল" ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ধাতুর অনেক অর্থ হয় বলিয়া শুধু আন্দাজে নহে, প্রাকৃত ব্যাকরণের যে সূত্র অনুসারে সংস্কৃত "ভ" স্থলে প্রাকৃতে "হ" হইয়া থাকে এবং ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী যে উচ্চারণের বৈচিত্র্য অনুসারে 'বাতাস' 'বাকস'

প্রভৃতি শব্দ অক্ষর বিপর্যাস দ্বারা 'বাসাত্' 'বাস্ক' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইয়া থাকে, উহা দ্বারাই সংস্কৃত 'লভ' ধাতুর 'হল' অপভ্রংশ রূপটী সিদ্ধ হইতেছে।* 'হল' ধাতুর উৎপত্তি সংস্কৃত 'চল' ধাতু হইতে কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং উহার 'চল' অর্থও অসম্ভব বটে। আর যদি কোনমতে উহার 'চল' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেই বা দেখিয়া 'চল' ইহাতে দেখিয়া 'লও' অর্থ কিরূপে সিদ্ধ হইবে, তাহাও বুঝা যায় না। বস্তুতঃ প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র ও ভাষাতত্ত্বের নিয়মের প্রতি উপেক্ষা হইতেই বিদ্যাপতির ব্যবহৃত বহু অপভ্রংশ শব্দের এরূপ কল্পিত অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু "আবে সবে" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন — এখন "মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল।" এইপদেই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন "তৈও ন শৈশব সীমা ছাড়া" অর্থাৎ তথাপি শৈশব তাহার স্বাভাবিক ধর্ম ছাড়িল না। এই অবস্থায় বিদ্যাপতির পক্ষে সেই একই পদে—যৌবনের অধিপতি মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল ইহা বলা সম্ভবপর বা সঙ্গত হইতে পারে কি? আমাদের বিবেচনায় এখানে 'সবে' শব্দের 'সাকল্যে' বা 'মোটে' অর্থ করাই সঙ্গত বটে; তাহা হইলে বাক্যের অর্থ হইবে (যৌবনের অধিপতি) মদন সবেমাত্র পাঠ পড়াইয়াছেন অর্থাৎ নব যৌবনা শ্রীরাধা এখনও কামকলায় প্রবীণতা লাভ করেন নাই, কেবল কামকলার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। 'সবে' শব্দের 'সাকল্যে বা 'মোটে' অর্থ হইতে অর্থের স্বাভাবিক পরিবর্তন-ক্রম অনুসারে সকলের মধ্যে 'কেবল' অর্থ আসিয়াছে। ঐ অর্থ কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব বা বিশেষত্ব নহে। বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় ঐরূপ প্রয়োগ না হইতে পারার কোন কারণ নাই। এরূপ আরও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এখন আমাদের মনে পড়িতেছে না; আমাদের বিশ্বাস যে অতঃপর এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইবে।

(১২ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১২ সংখ্যক 'পীন পয়োধর দূবরি গতা' ইত্যাদি পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এই পুথিখানি '৩০০ বৎসর পূর্বের লিখিত

*সংস্কৃত 'রভস', প্রাকৃত 'রহস'; সংস্কৃত 'প্রভু', প্রাকৃত 'পহু',; সংস্কৃত 'ভবতি' প্রাকৃত 'হোতি' ইত্যাদি।

অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না।' স্থানান্তরে লিখিয়াছেন — 'প্রবাদ আছে যে এই তালপত্রের পুথি বিদ্যাপতির প্রপৌত্রের লিখিত। এই পুথিখানি যে তাঁহার বংশে ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।' সে যাহা হউক; নগেন্দ্রবাবু এই পুথিখানি খুব প্রামাণিক ও শুদ্ধ মনে করিয়া উহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছেন এবং প্রায় সকল স্থলেই কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া, উহার পদগুলি যথাযথভাবেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি পাঁচশত বৎসরের অপেক্ষাও কিছু অধিক প্রাচীন কবি। উক্ত পুথিখানির বয়স তিনশত বৎসর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে বিদ্যাপতির অপ্রকটের দুইশত বৎসর পরে উহা লিখিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতগণ কাল গণনা করিতে যাইয়া, এক শতাব্দীতে তিন পুরুষ করিয়া ধরিয়া থাকেন। এ অবস্থায় দুই শত বৎসরে বিদ্যাপতির পরে আরও ছয় পুরুষ অতীত হওয়ার কথা বটে; সুতরাং এই হিসাবে পুথিখানা তাঁহার প্রপৌত্রের হস্তলিখিত না হইয়া, তাঁহার প্রপৌত্রের প্রপৌত্র বা অন্ততঃ পৌত্রের লিখিত হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। তর্কস্থলে যদি উহা বিদ্যাপতির প্রপৌত্রের লিখিত বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও লেখক সুপণ্ডিত না হইলে এবং তিনি বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথি দেখিয়া নকল না করিয়া থাকিলে উহাতেও অনেক ভুল প্রবেশ করিতে পারে। বস্তুতঃ এই পুথিখানার গৃহীত পাঠের যে কোন স্থলেই সম্পূর্ণ আস্থা করা যাইতে পারে না, আমরা ক্রমে তাহা দেখিতে পাইব। নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় পাঠকবর্গ এই পুথিখানার উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া ভ্রমে পতিত না হন, এজন্য আমরা প্রথমেই এ কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। "পীন পয়োধর দূবরি গতা" ইত্যাদি আলোচ্য পদটী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ও 'পদরত্নাকর' গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়; কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত মৈথিল পাঠের সহিত উক্ত দুইখানা বঙ্গীয় পুথির পাঠে পার্থক্য আছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা প্রথমে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ হইতে এই পদটীর মৈথিল রূপান্তর ও উহার টীকা উদ্ধৃত করিয়া, পরে উহার সহিত বঙ্গীয় পুথির পাঠের তুলনা করিব এবং আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

(দূতীর উক্তি)

পীন পয়োধর দূবরি গতা।
মেরু উপজন কনক-লতা॥ ২।

এ কাহ্নু এ কাহ্নু তোরি দোহাই।
অতি অপরুব দেখলি সাই॥ ৪।
মুখ মনোহর আধর রঙ্গে।
ফুললি মধুরি কমল সঙ্গে॥ ৬।
লোচন যুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়য়ে না পারে॥ ৮।
ভঁউহোঁরি কথা পুছহ জনু।
মদনে জোড়লি কাজর ধনূ॥ ১০।
ভনে বিদ্যাপতি দুতি বচনে।
এত শুনি কাহ্নু করু গমনে॥ ১২।

দেশরাজবিজয় ছন্দ। ১২ হইতে ১৪ মাত্রা।

১। দুবরি— দুর্বল শব্দ হইতে, তন্বী। গতা— গাত্র।
২। কনকলতায় (দেহে) যেমন মেরু (পয়োধর) উৎপন্ন হইল।
৩। সাই— তাহাকে। ৬। বধুরি— বান্ধুলী।
৫। মধুক মাতল— মধুপানে মত্ত।
৬—৭। ভ্রূর কথা জিজ্ঞাসা করিও না, মদন (যেন ভ্রূধনুতে) কজ্জলের গুণ জুড়িয়াছে।

'গীতচিন্তামণি'র পাঠও প্রায় এইরূপ। ভণিতা অন্যরূপ—

ভনই বিদ্যাপতি দুতি বচনে।
কিসলয় অঙ্গ ন হোয় পহু ধরনে॥

'গীতচিন্তামণি' ও 'পদরত্নাকর' পুথির পাঠ তুলনার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

এ ভনু এ কানু তোহরি দোহাই।
অতি অপরুব আজু পেখলু রাই॥
পীন পয়োধর দুবরি গতা।
মেরু উপজন কনক লতা॥
মুখ মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল মাধুরি কমলক সঙ্গ॥
নয়ন-যুগল ভেল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মদে মাতল উড়য়ে* ন পার॥

*"মধু মদে মাতল" স্থলে "মধুক মাতল কিয়ে"—পদরত্নাকর।

ভাঙকি ভঙ্গিম না পুছসি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥
ভণে বিদ্যাপতি দূতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ না হয় পহু ধরণে॥

নগেন্দ্রবাবু প্রথমেই মৈথিল পদটীর ছন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"দেশ রাজবিজয় ছন্দ। ১২ হইতে ১৪ মাত্রা।" দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। দেশ ও রাজবিজয় কোন ছন্দের নাম নহে; উহা দুইটী প্রসিদ্ধ রাগিনীর নাম বটে। মৈথিল পদটী প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উহার প্রত্যেক চরণে লঘুগুরুর বিচার না করিয়া, বাঙ্গালার একাবলী ছন্দের মত ৬+৫=১১টি অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পদটী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত না হইয়া, অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই রচিত হইয়াছে; সুতরাং উহার মাত্রা গণিতে যাওয়া এবং মাত্রার নিশ্চিত ঠিকানা করিতে না পারিয়া ১২ হইতে ১৪ মাত্রা — এরূপ একটা অনিশ্চিত মাত্রার হিসাব দেওয়া হাস্য-জনক ব্যাপার মনে না করিয়া পারা যায় না। মাত্রাবৃত্তের অপরিহার্য নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক গুরু-অক্ষর ও লঘু-অক্ষর যথাক্রমে দুই মাত্রা ও এক মাত্রা ধরিলে, নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের উক্ত পদের বারোটা চরণে যথাক্রমে ১৫, ১৩, ১৮, ১৩ ইত্যাদি নানা অসমান মাত্রা দেখা যায়; মৈথিল ব্যাকরণ ও ছন্দের রীতি অনুসারে একার-ওকার প্রভৃতি কোন কোন গুরু অক্ষরকে লঘু গণ্য করিলেও কোনরূপেই এই পদে মাত্রার একটা সমতা রক্ষা করা যায় না; পক্ষান্তরে বাঙ্গালা একাবলী ছন্দের মত অক্ষরের লঘুগুরুর দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক চরণের ষষ্ঠ অক্ষরের পরে যতি রাখিয়া পড়িয়া গেলে, উহার কোথাও ছন্দের অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পক্ষে হিন্দী ও মৈথিল কবিতার স্বভাবসিদ্ধ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিয়ম লংঘন করিয়া এরূপ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদ রচনা করা আপাততঃ কিছু অসম্ভব মনে হইলেও, এখানে বলা আবশ্যক যে, আমরা মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও এরূপ কয়েকটা মৈথিল পদ পাইয়াছি যে উহাতেও অক্ষরের লঘুত্ব বা গুরুত্ব সম্পূর্ণ অনাদৃত হইয়াছে বলিয়া মাত্রার কোন ঠিকানা নাই; কিন্তু অক্ষর গণনায় সমতাহেতু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঠিক রহিয়াছে। আলোচ্য পদের ঠিক পরবর্তী "জেহে অবয়ব পুরুব সময়" ইত্যাদি ১৩ সংখ্যক নেপালের পুথির পদটীতেই ইহার সুন্দর উদাহরণ

পাওয়া যায়। এখানে উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া কেবল প্রথম ও শেষ কলিটী উদ্ধৃত করিতেছি।

জেহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচয় বিন্থ বিকার।
সে আবে জাহ তা- হু দেখি ঝাপএ
চিহ্নিমি ন ব্যবহার॥
* * *
যৌবন সৈসব খেদএ লাগল
ছাড়ি দেহে মোর ঠাম।
এত দিন রস তোহে বিসরল
অবহু নহি বিরাম॥

একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে যে, এখানেও মাত্রা ছন্দের অনুযায়ী অক্ষরের লঘু-গুরুর কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই; কিন্তু বাঙ্গালা লঘু ত্রিপদী ছন্দ অনুসারে প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে ৬+৬+৮=২০ অক্ষর ঠিক রাখা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবু অথবা তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত মহাশয় ছন্দের এই বিশেষত্বটা বুঝিতে না পারিয়া, ইহার সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন—"কোড়ার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা"।* বস্তুতঃ উহার মধ্যে যে কুত্রাপি ১৩ হইতে ২৭ মাত্রার ইচ্ছাধীন প্রয়োগ নাই, সর্বত্রই লঘু ত্রিপদীর নিয়মানুসারে প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে কুড়িটী অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা ঐ পদের আলোচনায় দেখাইব। কেবল নেপালের পুথিতে নহে, মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও এরূপ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পদ অনেক আছে; যথাস্থানে উহার আলোচনা করিব।

আমরা আলোচ্য পদের ছন্দের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, উহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, নগেন্দ্রবাবু উক্ত পদের যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সর্বত্র তাহা সুসঙ্গত হয় নাই। কেননা, এই পদে যদিও অক্ষরের লঘুত্ব-গুরুত্ব সমাদৃত হয় নাই, কেবল প্রত্যেক চরণে ৬+৫=১১ অক্ষর ঠিক রাখা হইয়াছে; তথাপি অনাবশ্যকরূপে পদের পাঠে কতকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার করিয়া পাঠকদিগের মনে ধোঁকা জন্মাইবার সুযোগ দেওয়া সুবিবেচনার কার্য নহে।

*সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বোধহয় 'ধ্রুব' বা ধুয়ার কলির অর্থে 'প্রত্যন্তর' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

ছন্দের অনুরোধে বিদ্যাপতির পদে প্রায়শই 'পীন', 'দূবরি' ইত্যাদি শব্দ 'পিন', 'দুবরি' ইত্যাদি রূপে লিখিত হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় এখানেও তদনুসারে 'পিন পঅধর দুবরি গতা' ইত্যাদির মত যথাসাধ্য গুরুবর্ণবর্জিত করিয়া শব্দাবলীর বর্ণবিন্যাস করা উচিত ছিল, কেননা, কেহ মৈথিল পদের প্রচলিত নিয়মানুসারে লঘু গুরু বর্ণের পার্থক্য রক্ষা করিয়া পদটীকে পড়িতে গেলেই ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। বলা বাহুল্য যে, নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত মহাশয়ও সেই ধোঁকায়ই পড়িয়াছেন এবং পদের ছন্দ ঠিক করিতে না পারিয়া, মাত্রার সম্বন্ধে অনিশ্চিত ও অশুদ্ধ উক্তি দ্বারাই তাঁহাদিগের ভ্রমের স্পষ্ট পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন।

'গীতচিন্তামণি' ও 'পদরত্নাকর' পুথির যে রূপান্তর উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, বঙ্গীয় পুথির লিপিকরগণ এই পদটী পনর বা ষোল মাত্রার মাত্রা-চতুষ্পদী ছন্দে রচিত মনে করিয়া প্রত্যেক চরণেই সেই পনর বা ষোল মাত্রার* পূরণের জন্য এক আধটী শব্দ যোজনা করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ গোঁজামিল দিয়াও সর্বত্র মাত্রা-চতুষ্পদী বা চৌপাই ছন্দ বজায় রাখিতে পারেন নাই; ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম ও ১০ম চরণে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে; আমূল পরিবর্তন ব্যতীত উক্ত চরণগুলির শব্দ বজায় রাখিয়া সেই ছন্দের দোষ সংশোধন করা সম্ভবপর হয় নাই; অতএব অগত্যা পদটী ছন্দোদুষ্টই রহিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির অনেক মৈথিল পদ বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া গায়ক ও লিপিকরগণের অপ্রণিধান ও অনভিজ্ঞতার জন্যে যে কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটা সুন্দর উদাহরণ বটে। সাধারণতঃ নগেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় সংস্করণের অনেক পাঠান্তর ও রূপান্তরের প্রতি অনেক সময়ে অসঙ্গত দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু তিনি এই পদের বঙ্গীয় পাঠের সম্বন্ধে কোন দোষারোপ না করিয়া কেন যে "গীতচিন্তামণির পাঠও প্রায় এইরূপ" এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, উহার একমাত্র কারণ ইহাই বিবেচনা হয় যে, এই পদটী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বলিয়া তাঁহারও ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, এবং মৈথিল পদটী হইতে উহার বাঙ্গালা রূপান্তরে মাত্রাবৃত্তের

*চরণের শেষ অক্ষর লঘু বা গুরু গণ্য করা ইচ্ছাধীন বটে; সুতরাং 'চৌপাই' ছন্দ পনর মাত্রার বা ষোল মাত্রার দুই কথাই বলা যাইতে পারে। হিন্দীর ছন্দোগ্রন্থে উভয় প্রকার উক্তিই পাওয়া যায়।

হিসাবে অনেক অল্প ত্রুটি থাকায় তিনি প্রকৃত কথাটা চাপিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন ; নতুবা তাঁহাকে স্পষ্ট বলিতে হইত যে, তাঁহার মতে একান্ত প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ মৈথিল তালপত্রের পুথির পাঠ হইতে আলোচ্য পদে বঙ্গীয় 'গীতচিন্তামণি' পুথির পাঠই অধিক শুদ্ধ। বস্তুতঃ কিন্তু এখানে মৈথিল তালপত্রের পুথির পাঠান্তরই প্রাচীন, প্রামাণিক ও শুদ্ধ বটে। বঙ্গীয় পুথির পরবর্তী রূপান্তরে মৈথিল পদের অর্থ প্রায় ঠিক থাকিলেও উহাতে ছন্দের ব্যতিক্রম ও মাত্রা ছন্দের হিসাবে ছন্দোদোষ ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় পুথিগুলির গৃহীত পাঠের সম্বন্ধে মোটামুটি আমাদের মন্তব্য বলা হইয়াছে,— কেবল একটি বলা হয় নাই ; উহা বলিয়াই আমরা আলোচ্য মৈথিল পদের পাঠ ও অর্থের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। মৈথিল পুথির অন্তিম চরণ—

এত বলি কাহ্নু করু গমনে ॥

এই পাঠ যদি মৈথিল তালপত্রের পুথিতে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা প্রামাণিক পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই দূতী শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত দূতী বা রাধার আপ্ত দূতী যিনিই হউন না কেন, তাঁহার নিকট হইতে অভিসারে গমনের জন্যে কোন অনুরোধ বা ইঙ্গিত না পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে অভিসারে যাইবেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও রসবিরুদ্ধ মনে হয়। এখানে "গমন" শব্দের অর্থ "অভিসারে গমন" না হইয়া "নিজের গৃহে গমন" বা "কর্মান্তরে গমন" হইলে, তাহাতেও অর্থের কোন পুষ্টি না হইয়া বরং তদ্দ্বারা দূতীর বাক্যশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহের অভাব বা অল্পতাই প্রতীত হয় ; সুতরাং এই পাঠ যে মহাকবি বিদ্যাপতির অভিপ্রেত ও মৌলিক পাঠ নহে, তাহা আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি। নগেন্দ্রবাবু বোধহয় বটতলার কোন অশুদ্ধ 'গীতচিন্তামণি' হইতে বঙ্গীয় পুথির উক্ত পদের অন্তিম চরণের "বিকসল অঙ্গ না হয় পহু ধরণে ॥" এই সুন্দর ও ধ্বনিপূর্ণ পাঠের পরিবর্তে অশুদ্ধ ও অর্থশূন্য, "কিসলয় অঙ্গ না হয় পহু ধরণে ॥" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিরা শিরিষ প্রভৃতি কোমল কুসুমের সঙ্গেই নায়িকার অঙ্গের উপমা দিয়া থাকেন— পল্লবের সঙ্গে নহে ; সুতরাং এখানে "কিসলয় অঙ্গ" সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অর্থশূন্য বটে। "বিকসল অঙ্গ" ইত্যাদি প্রামাণিক পাঠের অর্থ— বিদ্যাপতি দূতীর কথায় বলিতেছেন যে, হে প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ! নায়িকার বিকাশপ্রাপ্ত স্তন, নিতম্ব প্রভৃতি ধরিয়া রাখিতে অর্থাৎ গুপ্ত রাখিতে পারা যায় না অর্থাৎ নায়িকা বাল্যভাবের

প্রকাশ দ্বারা তাঁহার যৌবন গোপনের যত চেষ্টাই করুন না কেন, তাঁহার বিকাশপ্রাপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিই তাঁহার যৌবন ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈষ্ণব গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু আন্দাজ পাঁচশত বৎসর বিদ্যাপতির জীবদ্দশায়ই তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে মিথিলার বিস্‌ফী গ্রামে যাইয়া বিদ্যাপতির রচিত বহু পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় বঙ্গীয় পুথির অনেক পাঠই খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক মনে করা অসঙ্গত নহে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পরবর্তী সময়ে বঙ্গীয় পুথির এই পদটীতে অনেক অসঙ্গত পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলেও উহার ভণিতার অন্তিম চরণের "বিকসল" ইত্যাদি পাঠ মূলতঃ সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও শুদ্ধ বটে। মিথিলার আন্দাজ তিনশত বৎসরের প্রাচীন গায়ক ও লিপিকরদিগের ভ্রমহেতু অনেক পাঠেই বোধহয় এইরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়াছে। এই অন্তিম চরণে "পহু" শব্দের প্রয়োগ তাদৃশ প্রয়োজনীয় বা সুসঙ্গত মনে হয় না। উহা ছাড়িয়া দিয়া "বিকসল অঙ্গ নহে ধরনে॥" এইরূপ পাঠ কল্পনা করিলেই মৈথিল পদটীর এগার অক্ষরী একাবলী ছন্দ ঠিক থাকে। বোধহয় মূল মৈথিল পদে ঐরূপই পাঠ ছিল, — পরে অন্যান্য চরণের সহিত বঙ্গীয় সংস্করণের সম্পূর্ণ পদটীই পরিবর্তিত হইয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলিয়া যদিও এই পদে অক্ষরসমূহের লঘুত্ব বা গুরুত্ব ধর্তব্য নহে, কিন্তু তথাপি পাঠকদিগের ধোঁকা নিবারণের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব লঘু অক্ষরের ব্যবহার করাই সঙ্গত বটে। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'দোহাই', 'রঙ্গে', 'সঙ্গে' ও 'মনোহর' শব্দগুলি 'দুহাই', 'রঙে', 'সঙে' ও 'মন্‌হর' রূপেই লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। এখানেও ঐ শব্দগুলির 'দো', 'র', 'স' ও 'নো' অক্ষরগুলি গুরুস্বরযুক্ত ও সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী বলিয়া মাত্রাছন্দের নিয়মানুসারে গুরু উচ্চারিত না হইয়া লঘুরূপেই উচ্চারিত হইবে। সুতরাং তিনশত বৎসরের প্রাচীন কালের লিপিকর তাঁহার খামখেয়ালি হইতে যেরূপ বর্ণবিন্যাসই বলিয়া থাকুক না কেন, এখন উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস প্রদর্শিত করাই সমীচীন বটে। নগেন্দ্রবাবু অনেকস্থলেই তাহা করিয়াছেন, এখানে যে ভ্রমপ্রযুক্তই সেরূপ করেন নাই, তাহাও বলা হইয়াছে; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর আর অধিক কথা না বলিয়া, কেবল ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই পদের অন্তর্গত 'দোহাই',

'রঙ্গে', 'সঙ্গে', 'মনোহর' শব্দগুলির স্থলেও ব্যবহার ও উচ্চারণ অনুযায়ী 'হুহাই', 'রঙে' বা 'রংএ', 'সঙে' বা 'সংএ' ও 'মন্‌হর' পাঠই গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নগেন্দ্রবাবু চতুর্থ চরণে 'সাই' পাঠ গ্রহণ করিয়া, উহার অর্থ 'তাহাকে' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ অর্থে 'সাই' শব্দের প্রয়োগ, কি প্রাচীন, কি আধুনিক মৈথিল ভাষায় দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে, এখানেও বঙ্গীয় পুথির 'রাই' পাঠই প্রামাণিক ও সমীচীন বটে। বোধহয় লিপিকরের ভুলেই এই অর্থপ্রযুক্ত ও অর্থশূন্য পাঠের উৎপত্তি হইয়াছে।

'ভঁউহেরি' পাঠও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই পাঠ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিল ভাষার সর্বত্র ষষ্ঠ বিভক্তিতে 'ক' বা 'কি' ব্যবহৃত না হইয়া, বাঙ্গালার মত কোন কোন স্থলে 'এর' বা 'এরি' ও ব্যবহৃত হইত, যথা—

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তরে

(নগেন্দ্রবাবুর ১ সংখ্যক)

নগেন্দ্রবাবুর নিজের সংগৃহীত মৈথিল পদে এরূপ প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে বঙ্গীয় সংস্করণের অনেক পদে কি জন্য অনাবশ্যকরূপে ষষ্ঠী বিভক্তির 'এর' প্রত্যয়ের স্থলে 'ক' প্রত্যয় করিয়া দিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা যথাস্থলে এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিব; এখানে কেবল প্রসঙ্গ করিয়া রাখিলাম।

পদের অর্থ সরল, ইহাতে দুর্বোধ্য কিছু নাই বলিলেই হয়; তথাপি দুঃখের বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবু "ভঁউহেরি কথা" ইত্যাদি কলির যে অর্থ করিয়াছেন, উহা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রবাবু 'কাজর' শব্দ হইতে 'কজ্জলের গুণ' কোথায় পাইলেন? এরূপ অর্থ কি কষ্টকল্পনা নহে? এরূপ অর্থ করিলেও 'কজ্জলের গুণ' যে এখানে কি তাহা বলা আবশ্যক। যদি বলেন যে, কবি এখানে ভুরুর সহিত বঙ্কিম ধনুর উপমা দিয়া, নয়নের কজ্জল রেখাকে ধনুর কালো গুণের সহিত উপমিত করিয়াছেন; কিন্তু ইহা তাদৃশ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কেননা কবি আগেই কৃষ্ণ তারকবিশিষ্ট কজ্জলাঙ্কিত নয়নযুগলকে মধুমত্ত ভৃঙ্গের সহিত উপমিত করিয়াছেন, এখানে আবার

নয়নের কজ্জলের উল্লেখ অনাবশ্যক। 'ভঁউহেরি কথা পুছসি জনু' বাক্যদ্বারা কবি এখানে নায়িকার ভ্রূ-ধনুর উপরই প্রাধান্য দিয়া বলিতেছেন যে, নায়িকার ভুরু দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন কন্দর্প কজ্জলরঞ্জিত ধনু জুড়িল অর্থাৎ উহাতে গুণ চড়াইল। অবশ্য এখানেও নয়নের কজ্জল-রেখাকেই উক্ত ভ্রূধনুর গুণরূপে বুঝিতে হইবে; কিন্তু উহা ধ্বনিগম্য অর্থ। 'কাজর ধনু' লিখায় এখানে অন্বয় ঠিক রাখিয়া কোনমতেই কাজলকে ধনুর সহিত সংযুক্ত করা সম্ভবপর নহে। এজন্য বিদ্যাপতির আধুনিক মৈথিল সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় 'মদনে জোড়লি কাজর ধনু' পাঠ ধরিয়া উহার অর্থ সহজবোধ্য বলিয়া, উহার কোন টীকা করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। আমাদিগের নিকটও এইরূপ পাঠ ও পূর্বোক্ত অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। আধুনিক কালের বিলাসিনীগণ যেমন মুখে পাউডার বা রূজ মাখিয়া ভ্রূ যুগলকে কৃষ্ণতর করার জন্য মসীশলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া থাকেন, প্রাচীন সময়েও ভ্রূ যুগলে সেরূপ কাজল পরার রীতি ছিল; সুতরাং কজ্জলরঞ্জিত ভুরু ধনু কেবল কবির কল্পনা নহে, উহা প্রাচীন কালের একটা সাধারণ বিলাসসজ্জাও বটে। কবি কাজর ধনু এই সমাসযুক্ত পদের দ্বারা উহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সঙ্গত অন্বয় রক্ষা করিয়া উহার অর্থ আর কিছুই করা যাইতে পারে না।

(১৩ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ১৩ সংখ্যক পদটী নেপালের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদ অন্য কোন বঙ্গীয় সংস্করণে না থাকায় এবং নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণও এখন অপ্রাপ্য হওয়ায়, আমরা পাঠকদিগের সুবিধার জন্যে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ হইতে টীকাসহ সম্পূর্ণ পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, পরে উহার সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

(দূতীর উক্তি)

জেহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচয় বিণু বিকার।
সে আবে জাহ তাহ দেখি ঝাপএ
চিহ্নিমি না বেবহার ॥২'

কন্‌হা তুরিত শুনসি আএ।
রূপ দেখতে নয়ন ভুলল
সরণ তোরী দোহাএ ॥৪॥
সৈস্‌ব বাপু বহীরি ফেদাএল
জৌবনে গহল পাস।
জেও কিছু ধনি বিরুহ বোলএ
সে সেও সুধাসম ভাস ॥৬॥
জৌবন সৈসব খেদএ লাগস
ছাড়ি দেহে মোর ঠাম।
এত দিন রস তোহে বিরসল
অবহু নহি বিরাম ॥৮॥

কোড়ার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা।

১। জেহে — যে। পুরুব সম্ম — পূর্বকালে, পূর্বে। নিচল — নিশ্চল, স্থির। বিণু বিকার — বিকার শূন্য।

২। আবে — এখন। জাহ তাহ — যাহাকে তাহাকে। ঝাপএ — ঢাকা দেয়। চিহ্নিম — চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি। ন — না। বেবহার — ব্যবহার।

১—২। যে শরীর পূর্বে বিকারশূন্য ও স্থির (ছিল) (যে দেহে শৈশবসুলভ নিশ্চিন্ততায় কোনরূপ লজ্জার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত না), সে দেহ এখন যাহাকে তাহাকে দেখিয়া আবরণ করে (গায়ে কাপড় দেয়); (এরূপ) ব্যবহার বুঝিতে পারি না।

৩। কন্‌হা — কানাই। তুরিত — ত্বরিত।

৪। দেখতে — দেখিতে, দেখিয়া। ভুলল — ভুলিল। সরূপ — স্বরূপ, সত্য। তোরি — তোর। দোহাএ — দোহাই।

৩—৪। কানাই, শীঘ্র আসিয়া শোন্। তোর দোহাই, সত্য বলিতেছি রূপ দেখিয়া আমার নয়ন ভুলিল।

৫। বাপু (মৈথিল) — বেচারা; পাঠান্তর — বান্ধব। বহীরি — বাহিরে। ফেদাএল — খেদাইল, তাড়াইয়া দিল; গহল — গ্রহণ করিল, লইল। পাস — পাশ, নিকটে।

৬। জেও — যাহাও। বিরুহ — বিরোধ, কটু। বোলএ — কহে। সে সেও — তাহা তাহাও, সে সকলও। সুধাসম ভাস — অমৃততুল্য প্রতীয়মান।

৫—৬। শৈশব বেচারাকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল, যৌবনকে নিকটে লইল (পাশে লইল); ধনী যাহা কিছু কটু (কথাও) বলে, তাহাও অমৃততুল্য প্রতীয়মান হয়।

৭। খেদএ লাগল—তাড়াইতে লাগিল। দেহে—দে। মোর ঠাম—আমার স্থান। ৮। তোহে—তোকে। বিরসল—রস প্রদান করাইল ভোগ করাইল। অবহু—এখনও। বিরাম—নিবৃত্তি, বিরতি।

৭—৮। যৌবন শৈশবকে তাড়াইতে লাগিল, কহিল আমার স্থান ছাড়িয়া দে (এখন ইহার দেহে আমার অধিকার হইয়াছে, অতএব তুই ইহাকে ত্যাগ কর); এতদিন তোকে রস ভোগ করাইল (এতদিন তুই ইহার দেহ অধিকার করিয়াছিলি), এখনও নিবৃত্তি নাই (এখনও তোর আশা মেটে নাই)?

এই পদের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই, নগেন্দ্রবাবু টীকায় ইহার যে 'কোডার' ছন্দ নাম দিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পিঙ্গলের ছন্দোসূত্র অথবা পরবর্তী কোন ছন্দোগ্রন্থে আজ পর্যন্ত সেই নাম পাই নাই। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, কোন ছন্দই এরূপ উচ্ছৃংখল নহে যে, উহা ইচ্ছানুসারে কখনও কম মাত্রার কখনও বেশী মাত্রার হইতে পারে। সুতরাং টীকার ২০ হইতে ২৭ মাত্রা কথাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে। কোডার (?) ছন্দের এই অদ্ভুত মাত্রাবিবরণ নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সে মৈথিল উপদেষ্টার নিকট হইতেই পাইয়া থাকুন, উহা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। এই পদের কুত্রাপি ২০ হইতে ২৭ মাত্রা নাই। ইহা মাত্রাছন্দের পদও নহে। ইহা ৬+৬+৮=২০ অর্থাৎ কুড়ি অক্ষরী সাধারণ লঘু ত্রিপদীর পদ বটে; তবে বিদ্যাপতি ইহার দুইটী স্থলে দুইটি লঘু অক্ষরের পরিবর্তে একটা গুরু অক্ষর ব্যবহার করায় দুটী ছয়-অক্ষরী মধ্যবর্তী চরণে ছয় অক্ষরের স্থলে পাঁচ অক্ষর পাওয়া যাইতেছে।

যেমন

রূপ দেখতে নয়ন ভুলল
চিহ্নিমি ন বেবহার॥

এবং

সৈসব বাপু বহীরি (বৈরী) ফেদাএল
জৌবনে গহল পাশ॥

পংক্তিগুলির 'রূপ' ও 'সৈসব' শব্দ দুইটির 'রূ' ও 'সৈ' অক্ষর গুরু বলিয়া দীর্ঘ উচ্চারিত হওয়ায় ঐ চরণ দুইটির ছয়ের স্থলে পাঁচ অক্ষরেও ছন্দ ঠিক আছে। যে সকল চরণে ছয় অক্ষর ঠিক আছে, সেখানে বাঙ্গালা ছন্দের মত গুরু অক্ষরগুলিও লঘুরূপে পঠিত হইবে। এইভাবে পদটি পড়িলে ও লঘু ত্রিপদীর মত ত্রিপদীর তিনটী চরণ ফাঁক দিয়া লিখিলে, কোনই

গোলযোগ ঘটিত না ; কিন্তু বর্তমান সময়ে মৈথিল ভাষায় বিশুদ্ধ মাত্রা ত্রিপদী ব্যতীত এরূপ কুড়ি অক্ষরী লঘুত্রিপদী ছন্দের প্রচলন না থাকায় নগেন্দ্রবাবুর উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত মহাশয় ভ্রান্ত হইয়া, ইহাকে মাত্রা ত্রিপদী মনে করিয়া মাত্রার সমতা খুঁজিয়া না পাইয়া, অগত্যা ঐরূপ একটা অদ্ভুত ও অসম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণ এই পদের অক্ষরগুলিকে ৬+৬+৮=২০ অক্ষরী লঘু ত্রিপদীর ধরণে সাজাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে কোনই গোলযোগ নাই ; কেবল 'রূপ' ইত্যাদি ও 'সৈসব' ইত্যাদি চরণে এক-একটী অক্ষর কম এবং 'তাহু দেখি ঝাপএ', 'বহীরি ফেদাএল' ও 'সে সেও' ইত্যাদি চরণ তিনটিতে ৬, ৬ ও ৮ অক্ষরের স্থলে পুথি লেখকের ভুলে যথাক্রমে ৭, ৭ ও ৯টী অক্ষর আছে। 'রূ' ও 'সৈ' অক্ষর গুরু, সুতরাং প্রত্যেকে দুইটী লঘু অক্ষরের সমান বটে ; এজন্যে সেই চরণ দুইটীতে পাঁচ অক্ষরই ছয় অক্ষর ধরিতে হইবে। 'তাহু' ইত্যাদি চরণগুলিতে পুথি লেখকের ভুলে একটি করিয়া অক্ষর বেশী দেওয়ায় লঘুত্রিপদীর ছন্দ ভঙ্গ হইয়াছে ; তাহা অভিজ্ঞ পাঠক পড়িলেই কানে বাজিবে। উহা যে রচয়িতা মহাকবি বিদ্যাপতির ভুল নহে অথবা ঐ পদের প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ নহে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

১। 'ঝাপএ' স্থলে 'ঝাপ' বা 'ঝাপে' শব্দও মৈথিল ভাষা অনুসারে সমান শুদ্ধ বটে। দৃষ্টান্তস্থলে নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দেখুন ঃ

অমিঅক লহরী বস অরবিন্দ (নগেন্দ্রবাবুর ৩০নং পদ)
রস বুঝ রসমন্ত (ঐ ৩২নং পদ)
ভনই বিদ্যাপতি গাবে (ঐ ৩৭নং পদ)

'বসই' বা 'বসএ' স্থলে 'বস', 'বুঝই' বা 'বুঝয়ে' স্থলে 'বুঝ' ও 'গাবই' স্থলে 'গাব' বা 'গাবে' যেমন প্রযুক্ত হইয়াছে, এখানেও সেরূপ 'ঝাপ' বা 'ঝাপে' পাঠ গ্রহণ করিলেই ছন্দোভঙ্গ নিবারিত হয়। পুথি লেখকেরা অনেক সময়ে এরূপ বা ইহা অপেক্ষাও অনেক মারাত্মক ভুল করিয়া থাকেন ; এরূপ ভ্রম লেখক মাত্রেরই স্বাভাবিক, অভিজ্ঞ পাঠকদিগকে ইহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

২। 'বহীরি ফেদাএল' স্থলে 'বৈরি ফেদাএল' লিখিলে ও পড়িলেই ছন্দ ও অর্থ উভয় দিক্ রক্ষা হইতে পারে। 'বাহিরে' শব্দটা সচরাচর 'বাইরে' রূপে লিখিত বা উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'হী' স্থলে 'ই' উচ্চারণ নিতান্ত

স্বাভাবিক। সংস্কৃত 'বহি' শব্দের স্থলে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে 'বহি' ও আধুনিক বাঙ্গালায় 'বই' শব্দের (যেমন— "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ পতি, জীবনে মরণে গতি, ইহা বহি অন্য নাহি মনে।"—নরোত্তম) ব্যবহার দেখা যায়। সেই রূপেই সংস্কৃত 'বহিঃ' হইতে মৈথিল 'বহির' 'বহিরি' 'বইরি' 'বৈরি' শব্দগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং বৈরি লিখিয়া এখানে ছন্দ ও অর্থ উভয় দিক্ রক্ষা করাই যে সঙ্গত, ইহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

(৩) 'সে সেও' ইত্যাদি স্থলে প্রথম 'সে'টা কেবল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নহে, উহার প্রয়োগ অসঙ্গতও বটে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'যৎ' শব্দ ও 'তৎ' শব্দের সম্বন্ধ নিত্য। কোন বাক্যে আগে 'যৎ' বা যে শব্দের প্রয়োগ করিলে পরে আবার 'তৎ' বা সে শব্দেরও প্রয়োগ করিতে হয়; নতুবা অর্থসঙ্গতি থাকে না। এই নিয়মের 'তেহি নো দিবসো গতাঃ' ইত্যাদির মত কয়েকটী ব্যতিক্রমস্থলও আছে। এখানে সেই ব্যতিক্রমও খাটে না বলিয়া, বিদ্যাপতি 'জেও কিছু ধনি' ইত্যাদি বাক্যে 'জেও' শব্দের প্রয়োগ করায়, পরে তাঁহাকে সেও শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এখানে আগে 'জেও' (যাহাও) থাকায় পরে 'সেও' (তাহাও) থাকাই সঙ্গত বটে। আগে 'জে জেও' থাকিলেও পরেও 'সে সেও' রাখা আবশ্যক, আগে শুধু 'জেও' থাকায় পরে 'সে সেও' লিখা কেবল অনাবশ্যক নহে, উহা ভুলও বটে। নগেন্দ্রবাবু 'সে সেও' শব্দের অর্থ বাধ্য হইয়া 'তাহা তাহাও' লিখিয়া, পরে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ করার সময়ে শুধু 'তাহাও' লিখিয়া বাক্যটার সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন সুতরাং সে শব্দটা যে এখানে নিরর্থক, উহা তাঁহারও স্বীকার্য বটে। এরূপ অবস্থায় উহা পরিত্যাগ করিয়া ছন্দ ও অর্থের শুদ্ধতা রক্ষা করাই কর্তব্য ছিল। এখানে বলা আবশ্যক বিদ্যাপতির পদের এরূপ বিশ-অক্ষরী লঘু-ত্রিপদী বিরল নহে। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৫৪, ৫৯, ৬২ প্রভৃতি পদেও এরূপ ছন্দ দেখিতে পাওয়া যাইবে। মৈথিল পণ্ডিতের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন হইলেও, নগেন্দ্রবাবুর পক্ষে এরূপ ভ্রম আশ্চর্যের বিষয় বটে।

এখন অর্থের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নগেন্দ্রবাবু সাধারণ পাঠকের পক্ষে পদের অর্থ সুগম করার জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় যে, স্থানাভাবে অনেক বৈষ্ণব-পদাবলীর টীকাকারই এত বিস্তৃতভাবে পদের শব্দ ও বাক্যের অর্থ লিখিতে পারেন না।

সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবু টীকায় এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও উহাতে দুই একটা গুরুতর ভুল রহিয়াছে দেখিয়া, আমরা বিনীতভাবে সত্যের অনুরোধে উহা এখানে প্রদর্শিত করিতে বাধ্য হইতেছি।

নগেন্দ্রবাবুর 'বিরুহ' শব্দের অর্থ 'বিরোধ, কটু' লিখিয়াছেন। 'বিরোধ' একটা বিশেষ্য শব্দ; উহার অর্থ বিশেষণ 'কটু' হইবে কি প্রকারে? বোধ হয়, তিনি 'বিরুদ্ধ' শব্দের স্থলেই ভুলে বিরোধ লিখিয়াছেন, অথবা ছাপাখানার ভুলেই 'বিরুদ্ধ' শব্দের স্থলে 'বিরোধ' ছাপা হইয়াছে। যাহা হউক, 'বিরুহ' শব্দটা সংস্কৃত 'বিরুদ্ধ' শব্দেরই অপভ্রংশ। উহার অর্থ 'বিরুদ্ধ' অর্থাৎ 'প্রতিকূল'। উহার সহিত 'কটু' শব্দের অর্থের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কেহ কোন কথা বলিলে এবং অন্যে সেই কথার প্রতিবাদ করিলে, সেই প্রতিবাদকে বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল কথা বলা যায়। সত্যের অনুরোধে গুরুজনদিগের কথার বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল কথাও অনেক সময়েই বলা আবশ্যক হয়। কিন্তু 'কটু' কথা কখনই বলা সঙ্গত নহে। রমণী-রত্ন শ্রীরাধা কি 'কটু বাক্য কহা অনুচিত' আমাদের শৈশবশ্রুত এই সাধারণ নীতিটা জানিতেন না, তিনি এতই কোপনা ও অরসিকা ছিলেন যে, প্রিয়তমের বার্তা-বাহিনী দূতীর প্রতিও কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে 'বিরুহ' শব্দের অর্থ এখানে 'কটু-কথা' কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। এখানে ইহার একমাত্র সঙ্গত অর্থ 'প্রতিকূল কথা'। দূতীর কথার আভাসে বেশ বুঝা যায় যে, দূতী শ্রীরাধার নিকট কৌশলে অভীষ্ট কার্যের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, চতুরা শ্রীরাধা দূতীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, যে জন্যই হউক উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঐ প্রতিবাদের বা বিরুদ্ধ-উক্তির বলিবার ভঙ্গী এত সুন্দর যে, সেই বিরুদ্ধ উক্তিও দূতীর কাছে অমৃততুল্য প্রতীয়মান হইয়াছিল। বস্তুতঃ সুন্দর ও প্রেমবতী নায়িকাদিগের অসম্মতিসূচক বাক্যেও এমন একটা আকর্ষিণী শক্তি আছে, যে তাহাতে কেহই মোহিত না হইয়া পারে না! প্রেমাসক্ত নায়কদিগের পক্ষেও প্রণয়িনীর এরূপ সবিলাস নিষেধ উক্তি অমৃততুল্যই বটে। সুচতুরা দূতী শ্রীকৃষ্ণকে সমধিক প্রলোভিত করিবার উদ্দেশ্যেই এখানে এ প্রসঙ্গটা এ ভাবে করিয়াছেন। 'কটু কথা' অর্থ করিলে দূতীর কথার কোন চমৎকারিত্বই থাকে না; বরং উহা দ্বারা রমণীরত্ন শ্রীরাধার চরিত্রের নিন্দনীয়তা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত দূতীর প্রতি কটূক্তি করা হেতু শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের

বিরক্তির সঙ্গত কারণ আশঙ্কিত হইতে পারে। মহাকবি বিদ্যাপতির কবিতার কি এরূপ রসবিরুদ্ধ অর্থ করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ এই পদের 'জেও কিছু ধনি' ইত্যাদি ধ্বনিপূর্ণ অপূর্ব বাক্যটীতে কবি রসজ্ঞতার যে কিরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব; বেশী কথা বলিলেও ধ্বনির মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং আমরা রসজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগকেই ইহার অনির্বচনীয় মাধুর্য কল্পনায় আস্বাদন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

নগেন্দ্রবাবু শেষ পংক্তি দুইটীর যে অর্থ করিয়াছেন, উহাও কোনরূপেই সঙ্গত মনে হয় না।

'বিরসল' শব্দের অর্থ কোনরূপেই 'ভোগ' করাইল করা যাইতে পারে না। 'বি' বা 'নি' উপসর্গ যোগ করিলে 'রস' ধাতুর অর্থ আস্বাদন না বুঝাইয়া আস্বাদনের অভাবই বুঝাইয়া থাকে। 'বিরসল' শব্দের এক মাত্র অর্থ করা যাইতে পারে, 'বিরস' বা 'রস-হীন' হইল। উহা হইতে কোনরূপেই টানিয়া 'ভোগ করাইল' অর্থ করা যাইতে পারে না; সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর এই ব্যাখ্যাও সঙ্গত হয় না। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এখানেও লিপিকরের ভুলে একটা পাঠ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বোধহয় বিরসল শব্দের স্থলে 'বিসরল' (অর্থাৎ বিস্মৃত হইল) প্রকৃত পাঠ ছিল, কিন্তু 'বাতাস', 'বাসক', 'বাক্স' ইত্যাদি শব্দের স্থলে অনেক সময়েই ভুলে উচ্চারিত 'বাসাত', 'বাকস', 'বাস্ক' ইত্যাদির ন্যায় পদের গায়ক বা লেখকের ভুলে 'বিরসল' পাঠে পরিণত হইয়াছে। 'বিসরল' পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে 'এতদিনে (নায়িকা শ্রীরাধা) তোমাতে অর্থাৎ তোমার উপর রস অর্থাৎ অনুরাগ বিস্মৃত হইল, (তথাপি) এখন পর্যন্ত তোমার বিরাম নাই অর্থাৎ এখন পর্যন্তও তুমি তাঁহার দেহেই আছ।'

যদি কেহ আমাদের অনুমিত 'বিসরল' পাঠ গ্রহণ না করিয়া 'বিরসল' পাঠই ঠিক রাখিতে চাহেন, তাহা হইলেও নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় কাল্পনিক অর্থ করা চলিবে না; উহার জন্য সঙ্গত অর্থ খুঁজিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় 'বিরসল' পাঠ ঠিক ধরিলে অগত্যা এরূপ অর্থ করিতে হইবে—এত দিনে (শ্রীরাধার) অনুরাগ তোমার উপরে রস-হীন হইল। কিংবা 'বিরসল' শব্দটীকে ক্রিয়াপদ না ধরিয়া, 'বিরস' শব্দের উত্তর যুক্ত অর্থে বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় 'ল' যোগে 'বিরসল' (অর্থাৎ বিরসযুক্ত) পদটী সিদ্ধ করিয়া অর্থ করা যাইতে পারে—তোমার উপরের শ্রীরাধার যে রস বা অনুরাগ

ছিল, এত দিনে তাহা বিরস-যুক্ত অর্থাৎ বিরাগযুক্ত হইল। এরূপ অর্থ করিলে না করা যাইতে পারে এমত নহে। তথাপি আমাদের বিবেচনা হয় যে, এই অর্থ অপেক্ষা 'বিসরল' পাঠের অর্থই অধিক সঙ্গত এবং খুব সম্ভবতঃ "বিসরল"ই মৌলিক পাঠ ছিল, কিন্তু গায়ক বা লেখকদিগের ভ্রমেই উহা "বিরসল" পাঠে পরিণত হইয়াছে।

"বিরসল" পাঠ যে প্রকৃত নহে, এরূপ অনুমান করার ইহাও একটা কারণ বটে যে, আমরা বিস্মৃত হইল অর্থে বিসরল শব্দের বহু প্রয়োগ বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব পদাবলীতে পাইয়াছি, কিন্তু রসহীন হইল বা 'রসহীন' অর্থে নিরসল শব্দ ব্যতীত 'বিরসল' এই 'তিঙন্ত' ক্রিয়াপদ বা 'তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত' বিশেষণ পদের প্রয়োগ পদাবলী সাহিত্যে কুত্রাপি পাই নাই; বিদ্যাপতির মৈথিল পদেও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। "নিরসল রসিক মুরারি" ইত্যাদির মত রসহীন হইল অর্থে "নিরসল" শব্দের প্রয়োগ বহু দেখা গিয়াছে। 'বি' উপসর্গের অর্থ 'বিশেষরূপে' ধরিয়া 'বিরসল' রূপ একটী নূতন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করা হইয়াছে, যদি তর্কস্থলে এরূপও স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার "বিশেষরূপে রসযুক্ত হইল" অর্থ না হইয়া, "বিশেষরূপে রস ভোগ করাইল"—এরূপ অদ্ভুত অর্থ কোন ব্যাকরণ বা ভাষা-তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় নগেন্দ্রবাবুর 'বিরসল' পাঠের যে অর্থ করিয়াছেন, উহা কোনরূপেই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

(১৪ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ১৪ সংখ্যক "কি আরে নব জৌবন অভিরামা" ইত্যাদি পদটা শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ শর্মা বেণীপুরী মহাশয়ের সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি কী পদাবলী' নামক গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ দরভঙ্গা, লহেরিয়া সরায় ঠিকানায় হিন্দী পুস্তক ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ইহা হিন্দী সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য গ্রন্থ। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ যাঁহাদিগের নাই তাঁহারা উক্ত সংস্করণ এখন অপ্রাপ্য বলিয়া, সম্পূর্ণ পদটী দেখিতে ইচ্ছা করিলে বেণীপুরী মহাশয়ের সংস্করণের ১১ সংখ্যক পদ দেখিবেন। আলোচনার সংক্ষেপের জন্য আমরা অতঃপর নগেন্দ্রবাবুর যে পদগুলি বঙ্গীয় অন্যান্য সংস্করণে না থাকিলেও বেণীপুরী

মহাশয়ের সংস্করণে বা পূর্বোক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয়ের 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া ঐ দুইটী সংস্করণের উপরই বরাত দিব।

অন্যান্য অধিকাংশ পদের ন্যায় এই পদটীর ছন্দ ও মাত্রার বিবরণেও নগেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। নগেন্দ্রবাবুর লিখিত 'আহিরাণী ভীমপলাশী ছন্দ' নামে কোন ছন্দ নাই। "আহিরী" ও "ভীমপলাশী" দুইটি রাগিণী (হিন্দী ভাষায়—'রাগ') বটে। নগেন্দ্রবাবু বা তাঁহার মৈথিল উপদেষ্টা এখানেও ভুলে রাগিণীর নামে একটা নূতন ছন্দ বুঝিয়াছেন। সে যাহা হউক যদি মাত্রার পরিচয়টা ঠিক থাকিত, তাহা হইলে এই নামের ভুলে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু নগেন্দ্রবাবু উহার মাত্রার বিবরণে—"২৬ হইতে ৩০ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা" লিখিয়া পদটীর মাত্রা সম্বন্ধেও নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন। "কি আরে" ইত্যাদি ধ্রুব-কলির প্রথম চরণ নগেন্দ্রবাবুর প্রত্যন্তর ছাড়া এই মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের পদটীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে (Half stanza) গীতগোবিন্দের "ললিত লবঙ্গ লতা" ইত্যাদি পদের মত ২৮ মাত্রা আছে। নগেন্দ্রবাবু পদটীর ছন্দ ধরিতে না পারায়, তাঁহার উদ্ধৃত পাঠে স্থানে স্থানে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে, যথা "হরিণ ইন্দু অরবিন্দ করিনি হিম পিক বুঝ অনুমানী।"

'বুঝ' পাঠে এক মাত্রা কম পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটে। বেণীপুরী মহাশয় 'বুঝ' হলে সমানার্থ বুঝল পাঠ ধরিয়া ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু অবলম্বিত তালপত্রের পুথির উপরে তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকিলেও ঐ পুথিও নির্ভরযোগ্য নহে, ইহা এবং ইহার মত আরও বহু উদাহরণ হইতেই উহা বেশ বুঝা গিয়াছে। পদের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দেখুন—

কুচযুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহুন সব তারা॥

নগেন্দ্রবাবুর এই পাঠে "কুচযুগ" ইত্যাদি চরণে এক মাত্রা কম ও "জনি সুমেরু" ইত্যাদি চরণে তিন মাত্রা কম আছে। বেণীপুরী মহাশয় যে জন্য নিম্নলিখিত পাঠ ধরিয়াছেন, যথা —

কুচজুগ পরসি চিকুর ফুজি পরসল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহিন্থ সব তারা॥

'পর' স্থলে 'পরসি' পাঠ ধরায়, ছন্দের এক মাত্রার পূরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থের ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে। উদ্ধৃত কলির অর্থ এই যে শ্রীরাধার চিকুর কেশ ফুজি অর্থাৎ খুলিয়া যাইয়া কুচযুগের উপরে প্রসারিত হইল, তাহাতে মুক্তার হার জড়াইয়া গেল। দেখিয়া মনে হইল যেন স্বর্ণময় সুমেরুর চন্দ্রবিহীন তারা সমূহ উদিত হইল।

এখানে 'পরসি' পাঠ কল্পনা করিলে, অর্থ হইবে যে, শ্রীরাধার কেশ খুলিয়া যাইয়া, তাঁহার কুচযুগলকে স্পর্শ করিয়া প্রসারিত হইল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, এখানে 'পরসি' অপেক্ষা 'পর' বা উপর পাঠেই সঙ্গত অন্বয় ও উপমার সৌন্দর্য অধিক রক্ষিত হয়। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় পরসি পাঠ কল্পনা না করিয়া এখানেও শেষার্দ্ধের ন্যায় 'পর' স্থলে সমার্থক 'উপর' পাঠ গ্রহণ করিয়া ছন্দ ও অর্থ রক্ষা করাই সঙ্গত। 'জনি সুমেরু' ইত্যাদির স্থলে বেণীপুরী মহাশয় যে পাঠ কল্পনা করিয়াছেন, উহাতে মাত্রাগণনায় ২৮ মাত্রা পাওয়া গেলেও, উহার "জনি সুমেরু উপর" ইত্যাদি অংশে মাত্রাবিভাগের সাধারণ ও সহজ রীতির ব্যতিক্রম হেতু পড়িতে কানে বাজে, সুতরাং উহার মাত্রাবিভাগ নির্দোষ বলা যায় না। কিন্তু এরূপ মাত্রাবিভাগের ব্যতিক্রম ছন্দোভঙ্গ হইতে বহুগুণে শ্রেয়ঃ বলিয়া, এখানে অগত্যা বেণীপুরী মহাশয়ের পাঠই স্বীকার্য বটে।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত আর একটী অর্দ্ধ কলি, যথা —

লোল কপোল ললিত মাল কুণ্ডল
অধর বিম্ব অধ জাই।

এখানে 'মাল' শব্দে একমাত্রা অধিক আছে; তাই বেণীপুরী মহাশয় 'মাল' স্থলে 'মণি' পাঠ ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে মাল শব্দের দ্বারা ছন্দ বা অর্থ কোনটাই রক্ষিত হয় না; সুতরাং 'মণিকুণ্ডল' পাঠই সঙ্গত বোধ হয়। সম্ভবতঃ আদর্শ পুথির 'মণি' শব্দটী পাঠোদ্ধারের ভুলে 'মাল' হইয়াছে। প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথির পাঠোদ্ধার অতি কঠিন কার্য। একটু অসতর্কতা ঘটিলেই উহার ফলে এরূপ পাঠবিভ্রাট অনিবার্য হইয়া পড়ে। পাঠোদ্ধারের এরূপ ভ্রম পরেও

অনেক দেখা যাইবে। আমরা নগেন্দ্রবাবুর তালপত্রের পুথি দেখি নাই; সুতরাং ইহা লিপিকরের ভুল কিনা ইহাও নিশ্চিত বলিতে পারি না। বস্তুতঃ আদর্শ পুথিতে "মাল" পাঠ থাকিলেও উহাতে যে ছন্দ বা অর্থ রক্ষিত হয় না, ইহা সম্পাদক মহাশয়ের বুঝা উচিত ছিল। বেণীপুরী মহাশয় এখানে প্রশংসনীয় নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন।

পদের অর্থের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই; তবে 'হরিণ ইন্দু' ইত্যাদি চরণের 'হিম' (বেণীপুরী মহাশয়ের সংস্করণের 'হেম') শব্দের সম্বন্ধে একটা কৌতুকজনক বিষয় আছে, উহা বলিয়াই আজ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। 'হরিণ ইন্দু' ইত্যাদি অর্দ্ধ কলির বাকি অর্দ্ধ, যথা —

নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনুরুচি
অও অতি সুললিত বাণী॥

সম্পূর্ণ কলির অর্থ— হরিণ, চন্দ্র, পদ্ম, হস্তিনী, স্বর্ণ ও পিক, — অনুমান করিয়া বুঝিলাম (উহারা যথাক্রমে শ্রীরাধার) নয়ন, বদন, পরিমল অর্থাৎ অঙ্গসৌরভ, গতি, অঙ্গকান্তি ও অত্যন্ত সুললিত বাণী।

নগেন্দ্রবাবু বোধহয় আদর্শ পুথির অনুযায়ী 'হিম' পাঠ ও বেণীপুরী মহাশয় ঐ পাঠ অসঙ্গত মনে করিয়া 'হেম' পাঠ ধরিয়াছেন এবং উহার অর্থ একজনে 'তুষার' ও অন্যজনে 'সোনা' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতীচ্য খণ্ডের তুষার-ধবলা সুন্দরীদিগের শুভ্র তুষারকান্তি অত্রত্য নাগরদিগের মনোহরণ করিলেও আমাদের দেশে সুন্দরীদিগের স্বর্ণকান্তি বা চাঁপা ফুলের রংই বিশেষ প্রশংসিত বটে। এখানে তুষারধবল বর্ণ যে অস্বাভাবিক বলিয়া কেবল কবির বর্ণনায় অচল, তাহা নহে; এরূপ বর্ণ কুৎসিত রোগবিশেষের স্মৃতিজনক বলিয়া নিন্দনীয়ও বটে। যেখানে ভারতীয় কবিগণ 'গৌরী' বা 'গৌরাঙ্গী' নায়িকার গৌরকান্তির প্রশংসা করেন, সেখানেই সেই 'গৌর' বর্ণকে দুগ্ধ বা তুষারের ন্যায় শ্বেত না বুঝিয়া আমাদের 'সোনার গৌরাঙ্গে'র অঙ্গকান্তির দৃষ্টান্তে স্বর্ণবর্ণ বা চম্পক-বর্ণই বুঝিতে হইবে। 'শব্দকল্পদ্রুমে' 'গৌর' শব্দের শুধু 'পীতবর্ণ' অর্থই দৃষ্ট হয়। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু 'হিম' শব্দে 'হেম' না বুঝিয়া, যে তুষার বুঝিয়াছেন,— ইহা তাঁহার নিতান্তই ভ্রম হইয়াছে। মৈথিলীতে একার বিকল্পে হ্রস্ব উচ্চারিত হয় বলিয়া 'হেম' অনেকটা 'হিম'বৎ

শোনা যায়। আদর্শ পুথির লিপিকর এখানে উচ্চারণানুযায়ী বানান দিতে যাইয়াই এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে 'হেম' পাঠ ও উহার 'স্বর্ণ' অর্থই সঙ্গত বটে।

(১৫ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১৫ সংখ্যক "লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ" ইত্যাদি পদটী আমাদের ভূমিকায় উল্লিখিত 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহাদের নিকট নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতি নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উক্ত গ্রন্থেও দেখিতে পারিবেন। তাই বাহুল্যভয়ে আমরা সম্পূর্ণ পদটী এখানে উদ্ধৃত না করিয়া কেবল আপত্তিজনক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

(১) পদের প্রথম কলি—

লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ।
দুঅও নয়ন লহ এক হোক লাখ॥

নগেন্দ্রবাবু টীকা করিয়াছেন—

২। লহ—অনুমান হয়। ১—২। কুটিল কটাক্ষ লঘু লঘু সঞ্চরণ করে, দুই নয়ন এক লক্ষ অনুমান হয় (যেন লক্ষ নয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে)।

'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় পংক্তির 'দুঅও' স্থলে 'দুঅউ' ও 'একহোক' স্থলে 'য়ক হোক' পাঠ কল্পনা করিয়া অর্থ লিখিয়াছেন— 'দোনোঁ আঁখেঁ এক্ হো কর্ (সাথ্ হী সাথ্) কটাক্ষ কর্তী হৈঁ'। তাঁহার মতে 'হোক' একটা শব্দ নহে ; উহা 'হো কর্' শব্দদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। হিন্দীতে 'হো কর্' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে অনেক সময়ে সংক্ষিপ্ত 'হোকে' রূপটী পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিল ভাষায় 'হো কর' বা 'হোকে' — ইহার কোন রূপেরই প্রয়োগ দেখা যায় না। 'হো কর' অর্থাৎ 'হইয়া' অর্থে বিদ্যাপতিতে সর্বত্রই 'হোয়' বা 'হোই' প্রয়োগ পাওয়া যায় ; সুতরাং ব্রজনন্দনবাবুর 'হো কর্' অর্থ সমীচীন নহে। তিনি 'লহ' ও 'লাখ' শব্দদ্বয়ের অর্থও ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার অর্থে ঐ শব্দ দুইটীর কোন প্রয়োজন বা অবকাশ ঘটে না ; সুতরাং তাঁহার উক্ত পাঠ বা অর্থ— কিছুই সঙ্গত মনে হয় না। নগেন্দ্রবাবু যে তাৎপর্য অর্থ লিখিয়াছেন, উহাই যে একমাত্র

সঙ্গত ও সুন্দর অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তিনি যে 'লহ' শব্দের অর্থ 'অনুমান হয়' এবং 'এক হোক' শব্দের অর্থ 'এক' ধরিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ আলোচ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি (Derivation) স্থির না করিতে পারিলে, শুধু প্রক্রম (Context) দেখিয়া আন্দাজে অর্থ করিতে গেলে পদে পদেই এরূপ অর্থবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় এখানেও সেরূপ বিভ্রাটই ঘটিয়াছে। 'লহ' শব্দের 'অনুমান হয়' অর্থ হিন্দী মৈথিল প্রভৃতি সংস্কৃতের অপভ্রংশ কোন ভাষায়ই সিদ্ধ হয় না। সংস্কৃত শব্দের মধ্য বা অন্ত্যস্থিত 'ভ' অপভ্রংশ ভাষায় 'হ' হইয়া যায়। সংস্কৃত 'লভ' হইতে এই রূপেই 'লহ' ও পরে 'লঅ' বা 'লয়' হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটা সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—'সর্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাশ্চ সমানাঃ।' অর্থাৎ সকল গতি অর্থবিশিষ্ট, প্রাপ্তি অর্থবিশিষ্ট ও জ্ঞান অর্থবিশিষ্ট ধাতুই সমান অর্থাৎ উহাদিগের একতম ধাতুর দ্বারা অন্যতম ধাতুর অর্থ প্রকাশ পায়। প্রাপ্তি অর্থক 'লভ' বা 'লহ' ধাতুর অর্থ লাভ করা, উহা দ্বারা 'গমন করা' বা 'বোধ করা' অর্থও প্রকাশিত হইতে পারে। প্রাপ্তি-অর্থক মৈথিল 'লহ' ধাতুর বর্তমান কালের প্রথম পুরুষে 'লহই' 'লহে' 'লহ'—তিন প্রকার রূপই প্রসিদ্ধ বটে। এখানে 'লহ' বা 'লাভ করে' অর্থ দ্বারাই 'বোধ করে' অর্থ পাওয়া যাইতেছে। 'এক হোক' শব্দ সংস্কৃত 'একৈক' শব্দের অপভ্রংশ বটে। 'একৈক'—'একইক'—'একহিক'—'একহুক' ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী। এখানে ছন্দের জন্য 'একহোক' শব্দের 'হো' 'হু' অক্ষরের মতই লঘু উচ্চারিত হইবে। সুতরাং আলোচ্য পংক্তিটীর প্রকৃত অর্থ—(দর্শক) দুইটী নয়নকেই এক এক লক্ষ বোধ করে। অর্থাৎ নায়িকার দুইটী নয়নের কটাক্ষই রসজ্ঞ দর্শকের উপর লক্ষ কটাক্ষের কার্য করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্জিত করিয়া ফেলে।

(২) কাহাই নয়না হলিঅ নিবারি।
যে অণুপম উপভোগ ন আবএ
কী ফল তাহি নিহারি॥

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন—

৫। হলিঅ—যাও, চল। উপভোগ—উপভোগ জন্য। আবয়—আসে। তাহি—তাহাকে। ৫-৬। কানাই, নয়ন নিবারিয়া চল (দেখিও না), (যে সামগ্রী) উপভোগে আসে না, তাহাকে দেখিয়া কি ফল ?

এখানেও নগেন্দ্রবাবু তাৎপর্য অর্থ ঠিকই লিখিয়াছেন, কিন্তু 'হলিও' শব্দের অর্থে গোলযোগ করিয়াছেন। 'হলিঅ' শব্দের 'যাও' বা 'চল' অর্থ হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় পাওয়া যায় না। আমাদিগের মতে 'হলিঅ' 'লহিঅ' শব্দেরই রূপান্তর বটে। সংস্কৃত 'লভ' হইতে পূর্ব প্রদর্শিত 'লহ' এবং 'লহ' শব্দের অক্ষর বিপর্যাস দ্বারা 'হল' হওয়া ভাষাতত্ত্ব অনুসারে নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং 'হলিঅ' বা 'লহিঅ' শব্দের একমাত্র সঙ্গত অর্থ 'লইও'। দূতী বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ! নয়ন নিবারণ করিয়া লইও; (কেননা) যে অনুপম (দ্রব্য) উপভোগে আসে না, তাহা দেখিয়া কি ফল?

ব্রজনন্দনবাবু নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'হলিএ' পাঠের কোন সঙ্গত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তৎস্থলে 'চলিএ' পাঠ কল্পনা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে স্থানান্তরে বলিয়াছি, এখনও বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে প্রাচীন সাহিত্যের কোন দুরূহ শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারা সম্পাদকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, সেজন্য তাঁহাকে অপরাধী করা যাইতে পারে না, কিন্তু অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সম্পাদক যদি কিছু না বলিয়া এরূপ কল্পিত পাঠ সন্নিবেশিত করেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চিতই সম্পাদকের একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সুবৃহৎ সংস্করণের প্রায় কোন স্থলেই কোন সন্দিগ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই; সেজন্য বহু স্থলেই তাঁহার আনুমানিক শব্দার্থে এরূপ অসঙ্গতি রহিয়াছে; কিন্তু প্রশংসার বিষয় যে, তিনি 'জনু' ও 'জনি' শব্দের মত দুই চারিটী ব্যাপক শব্দের ভ্রান্তিজনিত রূপ পরিবর্তন ব্যতীত 'হলিঅ' স্থলে 'চলিএ' শব্দের মত পাঠ পরিবর্তন বড় একটা করেন নাই। সেজন্যই তাঁহার অবলম্বিত মৈথিল তালপত্রের পুথির এই সন্দিগ্ধ দুরূহ পাঠগুলি আমরা যথাযথরূপে দেখিতে পাইতেছি। যদি তিনিও ব্রজনন্দনবাবুর মত 'হলিঅ' স্থলে 'চলিঅ' বা 'চলিএ' পাঠই লিখিতেন, তাহা হইলে 'লহিঅ' স্থলে 'হলিঅ'—এই বৈকল্পিক রূপটী আমরা দেখিতে পাইতাম না।

কেহ বলিতে পারেন 'লহিঅ' স্থলে 'হলিঅ' রূপটী যে লিপিকরের প্রমাদজনিত নহে সে সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে? যদি আমরা বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে 'হলিঅ' শব্দের আরও দুই চারিটা এরূপ প্রয়োগ দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা লিপিকরের ভ্রম নহে, ইহা জোর করিয়া বলা

যাইতে পারে! কিন্তু আমরা এরূপ প্রয়োগ আর পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; সুতরাং ইহা লিপিকরের ভ্রম হইলেও হইতে পারে। বস্তুতঃ 'হলিঅ' কিংবা 'লহিঅ' যাহাই প্রকৃত পাঠ হউক না কেন, উহার অর্থ 'লইও' ব্যতীত 'যাও' বা 'চল' নহে, ইহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। অপভ্রংশ ভাষায় অক্ষর বিপর্যাসের অনেক দৃষ্টান্তই দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং 'লহিঅ' স্থলে 'হলিঅ' হওয়াও ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে অসম্ভব নহে, ইহাই আমাদের বক্তব্য বটে। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১৩ সংখ্যক "জেহে অবয়ব" ইত্যাদি পদের 'বিরসল' শব্দটীর সম্বন্ধে আমরা (৮) সংখ্যক প্রবন্ধে যে বিচার করিয়াছি, পাঠক উহাতেই লিপিকর কর্তৃক ভুলে শব্দের অক্ষর বিপর্যাসের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত তালপত্রের পুথির বিশুদ্ধির উপর তাঁহার একান্ত বিশ্বাস থাকিলেও, উহাতেও যে লিপিকরের ভ্রম না ঘটিয়াছে এরূপ মনে করার কারণ নাই। আমরা তালপত্রের পুথির পাঠেও স্থানে স্থানে অনেক ত্রুটী ও ভুল লক্ষ্য করিয়াছি, যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের "কণকলতা অরবিন্দা" ইত্যাদি ১৬ সংখ্যক পদটীর সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। ঐ পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 'রাগতরঙ্গিণী' নামক মৈথিল পদসংগ্রহ পুথি হইতে ঐ পদের যে রূপান্তর নগেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার পঞ্চম কলিতে পাঠ আছে—

কবিরতনাই ভানে।
সঙ্ক কলঙ্ক দুঅও অসমানে॥

নগেন্দ্রবাবু এই 'কবিরতনাই' বা 'কবি রতন' শব্দ বঙ্গদেশের পদাবলীর 'কবিরঞ্জন' শব্দের ন্যায় বিদ্যাপতিরই অন্যতম উপাধি বলিয়া অনুমান করেন। নগেন্দ্রবাবু যে পদটীর ছন্দের সম্বন্ধে টীকায় লিখিয়াছেন "প্রথম চরণ ১২ মাত্রা। দ্বিতীয় ১৬।", ইহা সত্য বটে। এইরূপ ছন্দের আরও দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির পদে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে নগেন্দ্রবাবু পদটীর শুদ্ধ মাত্রাবিবরণ দিয়াও টীকার প্রারম্ভেই

'রাগতরঙ্গিণী' পুথি হইতে "চতুষ্কল চতুষ্ক্রান্তা রুদ্রসংখ্যকলাদিকাঃ। কলা অনিয়তা যত্র পদার্দ্ধে সা তু ভোগিনী।" লক্ষণ-শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া, এই ছন্দের নাম দিয়াছেন "ভোগিন্যাসাবরী ছন্দ।" উদ্ধৃত শ্লোকের "চতুষ্ক্রান্তা" শব্দটী বোধহয় 'চতুষ্কান্তা' শব্দের স্থলে লিপিকরের ভুল। শ্লোকের একমাত্র সঙ্গত অর্থ এই যে, যে পদার্দ্ধে (পয়ারে) কলা (মাত্রা) অসমান, অন্ত্য চরণ চতুষ্কল (চতুর্মাত্রিক) অর্থাৎ চারিটী অংশযুক্ত এবং আদ্য চরণ দ্বাদশ মাত্রা যুক্ত উহাকে 'ভোগিনী' ছন্দ বলা হয়। বস্তুতঃ 'আসাবরী' বা 'আসোয়ারী' কোন ছন্দের নাম নহে, উহা একটা প্রসিদ্ধ রাগিণী। 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থের মতে ইহা 'ভোগিনী' ছন্দের পদ, 'আসাবরী' রাগিণী সংযোগে গেয়, সুতরাং এই 'ভোগিন্যাসাবরী' সাঙ্কেতিক শব্দটাকে ছন্দের নাম মনে করিয়া নগেন্দ্রবাবু এখানেও হাস্যজনক ভুল করিয়াছেন। 'ভোগিনী' নামটী এতদ্দেশে প্রচলিত নাই, সুতরাং অন্য পূর্বোক্ত নামের অভাবে বিষমমাত্রিক পয়ার ছন্দের 'ভোগিনী' নামকরণ করিলে মন্দ হয় না। এই 'ভোগিনী' ছন্দের—

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয় হনল পঁচ-বাণ॥

ইত্যাদি বিদ্যাপতির পদ এবং

মধুর মধুর তুয় রূপ।
জগ-জন-লোচন-অমিয় স্বরূপ॥

ইত্যাদি গোবিন্দদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগের অনেক পদ প্রসিদ্ধ বটে।

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের "মাধব কি কহব সুন্দরি-রূপে" ইত্যাদি ১৭ সংখ্যক পদটী গ্রীয়ারসন সাহেব মহোদয়ের সংস্করণে, কাব্যবিশারদের সংস্করণে এবং ব্রজনন্দন সহায় ও বেণীপুরী শর্মার হিন্দী সংস্করণে সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রবাবুর পাঠ প্রায় গ্রীয়ারসন সাহেবের ধৃত মৈথিল পাঠের অনুরূপ। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের গৃহীত বঙ্গীয় পুথির পাঠের সহিত ঐ পাঠের সামান্য সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। যেখানে পাঠ-বৈষম্য হেতু পদের অর্থে গুরুতর বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কোনটী শুদ্ধ পাঠ সে বিষয়েও সন্দেহ জন্মিয়াছে, আমরা কেবল সেইরূপ দুই তিনটী স্থলের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

অধর বিম্ব সন দশন দাড়িম্ব বিজু
রবি শশি উগথিক পাশে।

রাহু দুরি বস নিয়রো ন আবথি
তেঁই নহি করথি গরাসে ॥ ৮ ।

গ্রীয়ারসন সাহেব ও নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির এই কলিটীর স্থলে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত পাঠ, যথা —

অধর বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ব বীজু
রবি শশী উভয় পাশ ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস ॥

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন —

৭—৮ । অধর বিম্বতুল্য, দশন দাড়িম্ব বীজ। রবি (সিন্দুর বিন্দু) শশী (মুখ) পাশাপাশি উদয় হইয়াছে। রাহু (কেশ) দূরে বাস করে, নিকটে আসে না, সেইজন্য গ্রাস করে না। (পৃষ্ঠবিলম্বিত মুক্তকেশ মুখ হইতে দূরে থাকে)।

কাব্যবিশারদ টীকায় লিখিয়াছেন যে, এখানে "অধর বিম্বের সহিত, দশন দাড়িম্ব বীজের সহিত, রবিশশী কপোলদ্বয়ের সহিত ও রাহু কেশজালের সহিত উপমিত হইয়াছে"।

গ্রীয়ারসন সাহেবের অনুবাদে 'রবিশশী'—"the sun and moon" এবং উহার তাৎপর্য পাদ টীকায় "Her two eyes" অর্থাৎ নায়িকার চক্ষুদ্বয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজনন্দনবাবু অনেক স্থলেই কাব্যবিশারদের পাঠ ও অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এখানে তিনি কাব্যবিশারদ ও গ্রীয়ারসন—উভয়ের পাঠ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন— "রবিশশী কপোল যুগল অথবা নেত্র দ্বৈ"। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'রবিশশী' শব্দে কোন মতেই নায়িকার 'কপোলদ্বয়' বা 'নেত্রদ্বয়' লক্ষিত হইতে পারে না ; কেননা কপোলদ্বয়ে বর্ণের বৈষম্য নাই, কিন্তু রবি রক্তবর্ণ ও শশী গৌরবর্ণ বলিয়া, উহাদিগের মধ্যে স্পষ্টতঃ বর্ণের বৈষম্য রহিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার মতানুসরণে বেণীপুরী মহাশয় যে, 'রবি' শব্দে সিন্দুর বিন্দু ও 'শশি' শব্দে মুখ অর্থ ধরিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক সঙ্গত হইলেও—সেরূপ অর্থও নির্দোষ নহে। নায়িকার মুখ কবিমতে চন্দ্র ধরিলে, সিন্দুর-বিন্দুরূপে সূর্য চন্দ্রের

পাশাপাশি উদিত হইয়াছে, না বলিয়া রবি চন্দ্রের মাঝে উদিত হইয়াছে বলাই উচিত ছিল। এতদ্ভিন্ন কবি 'অধর', 'দশনা' ও 'সিন্দুর বিন্দু' রূপ মুখের পৃথক পৃথক অংশকে বিম্ব ইত্যাদি রূপে বর্ণিত করায়, আবার যদি ঐ সকল অংশের সমষ্টিরূপ সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলকে চন্দ্র বলিয়া বর্ণিত করেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিম্ব দাড়িম্ব বীজ প্রভৃতির কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না এবং অসঙ্গত হইয়া উক্তিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে, কেননা, চন্দ্রে বিম্ব, দাড়িম্ব বীজ প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভবে না। আগে মুখের অবয়বগুলিকে বিম্ব দাড়িম্ব বীজ ইত্যাদি রূপে বর্ণিত করিয়া পরে আবার উহাদিগের সমষ্টিকে চন্দ্র বলিয়া প্রখ্যাপিত করিলে, সেই উক্তি পূর্বাপরবিরুদ্ধ উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্যত্র মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা প্রসিদ্ধ ও সঙ্গত হইলেও, এখানে 'শশি' শব্দের দ্বারা কবি নায়িকার মুখমণ্ডল লক্ষ্য না করিয়া তাহার ললাটের শ্বেত-চন্দন-বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়াছেন ইহাই বিবেচনা হয়।

"রবি শশি উগথিক পাশে" বাক্যের "পাশে" শব্দটীর মধ্যে যে গূঢ় ধ্বনি রহিয়াছে, সম্পাদকগণ কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে অমাবস্যা তিথিতে সূর্যগ্রহণ ও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের কদাচ ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র রবির সহিত একই রাশিতে এবং পূর্ণিমায় রবি হইতে রাশিচক্রের সপ্তম রাশিতে অর্থাৎ রাশিচক্রের দূরতম স্থানে অবস্থিতি করে। রবি ও চন্দ্র পাশাপাশি রাশিতে অবস্থিত হইলেই বুঝা যায় যে, উহা অমাবস্যা বা পূর্ণিমার অবস্থিতি নহে, সুতরাং সেরূপ অবস্থায় জ্যোতিষশাস্ত্র-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণ ঘটিতে পারে না। কবি এই ধ্বনিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, রবি ও শশী এক সঙ্গে অথবা পরস্পরের বিপরীত নহে। কবি বলিতেছেন যে, রবি ও চন্দ্র পাশাপাশি উদিত হইয়াছে বলিয়াই রাহু গ্রাস করিতেছে না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য যে কি, তাহা বুঝিতে হইলেই এই জ্যোতিষ তত্ত্বটি জানা আবশ্যক, নতুবা শুধু কবি কল্পনা মূলে অর্থ করিতে যাইয়া যদি কেহ বলেন যে, রবি ও চন্দ্র পাশাপাশি অর্থাৎ একজন আর একজনের সাথী ও সহায় থাকায় রাহু ভয়ে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও গ্রাস করিতে সাহসী হইতেছে না, এইরূপ অর্থ আপাততঃ সঙ্গত মনে হইলেও উহা বিচারসহ হইবে না। কেননা জ্যোতিষ

শাস্ত্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম-অনুসারে চন্দ্র অমাবস্যায় রবির সহিত একত্র অবস্থান করে, কিন্তু কেবল সেই অমাবস্যায়ই সূর্যগ্রহণ সম্ভবপর বটে। সুতরাং রবি ও চন্দ্রের একত্র অবস্থান গ্রহণ হইতে রক্ষা পাওয়ার কারণ না হইয়া সূর্যগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যতম কারণ হওয়ায়, কবি পাশাপাশি অর্থাৎ নিকটবর্তী অথচ ভিন্ন রাশিতে রবি চন্দ্রের উদয় বর্ণিত করিয়া কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মণি-কাঞ্চন যোগ প্রদর্শিত করিয়াছেন।

আলোচ্য কলিতে শশিদ্বারা নায়িকার মুখমণ্ডল না বুঝাইয়া, ললাটের শ্বেত চন্দনবিন্দু অর্থ করিলে উহা যে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হয় না, বিদ্যাপতির—

কত ন বেদনা মোহি দেহি মদনা।
হর নহি বলা জুবতি জনা॥

ইত্যাদি নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৬৯ সংখ্যক পদের নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে, যথা—

চন্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥

পূর্বে মহাদেব মদনকে ভস্ম করায়, সেই আক্রোশবশতঃ বিরহিণী শ্রীরাধাকে মহাদেব বলিয়া ভ্রম করিয়া, মদন শরপ্রহারে জর্জরিত করিতেছেন বিবেচনায় শ্রীরাধা মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— হে মদন! তুমি আমাকে কত বেদনা দিতেছ? আমি হর নহি, কেবল যুবতী জন মাত্র। (আমার ললাটে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা) চন্দনের বিন্দু— উহা চন্দ্র নহে। (আর যাহা দেখিতেছ, তাহা) সিন্দুরের ফোটা, উহা অগ্নি নহে। কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পদের "কতিহু মদন তনু দহসি হমারি" ইত্যাদি যে বঙ্গীয় রূপান্তর (version) উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে "চন্দনক বিন্দু" ইত্যাদির স্থলে পাঠ আছে— "মোতিক বদ্ধ মৌলি—নহ ইন্দু।" অর্থাৎ ইহা আমার মুক্তাখচিত শিল্প শিরোভূষণ—চন্দ্র নহে।

বলা বাহুল্য যে, চন্দনবিন্দু বা মুক্তাখচিত শিরোভূষণের সহিত চন্দ্রের সাদৃশ্য থাকায় মদনের পক্ষে চন্দ্র বলিয়া ভুল করা সম্ভবপর হইয়াছে, এবং সেইজন্যই শ্রীরাধা মদনের ভ্রম দূর করার জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,

আমার ললাটে এ দুইটি চন্দ্র ও অগ্নি নহে,—চন্দন ও সিন্দুরের ফোটা বটে। কেহ বলিতে পারেন যে বিদ্যাপতির —

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে ভরি আন্ধিয়ার॥

(কাব্যবিশারদের ৬ সংখ্যক)

পদে কবি "রবি শশী" শব্দের দ্বারা নায়িকার সিন্দুরবিন্দু ও বদনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝা যায়; সুতরাং এখানেও শশী শব্দের দ্বারা নায়িকার মুখ-চন্দ্রকেই লক্ষ্য করা সঙ্গত। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, এখানে নায়িকার সুন্দর বদনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং 'রবি শশী' একসঙ্গে উদিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এখানে গ্রহণের কোন প্রসঙ্গ নাই; সুতরাং এখানে মুখে চন্দ্রত্বের আরোপে কোনই বাধা দেখা যায় না। আমাদিগের আলোচ্য পদে মুখে চন্দ্রত্বের আরোপ করিলে যে সকল অসঙ্গতি ঘটে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিদ্যাপতি যে অন্যত্র চন্দনবিন্দুর সহিতও চন্দ্রের উপমা দিয়াছেন "চন্দনক বিন্দু মোয়া নহি ইন্দু গোটা" বাক্যদ্বারা তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আলোচ্য পদে কবি অসাধারণ সতর্কতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টিহেতুই রবি চন্দ্রের (একসঙ্গে বা সুদূরে উদয় বর্ণনা) না করিয়া গ্রহণের অযোগ্যতা দেখাইবার জন্যই পাশাপাশি উদয় 'বর্ণনা' করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলের উপমা না দিয়া উহার পৃথক পৃথক অবয়ব অধর দশন প্রভৃতির পৃথক পৃথক বিম্ব, দাড়িম্ব বীজ ইত্যাদি উপমা জুটাইয়াছেন, সুতরাং সম্পূর্ণ মুখকে আবার চন্দ্রের সহিত উপমিত করিলে চন্দ্রে বিম্ব, দাড়িম্ব-বীজ ইত্যাদির অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়া অলঙ্কার-দোষই ঘটিয়া থাকে—এই বিষয়গুলি প্রণিধান করিলে, এখানে যে মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা কবির অভিপ্রেত নহে, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আলোচ্য কলির যে পাঠ বঙ্গীয় পদাবলী হইতে কাব্যবিশারদ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে "উগথিক" শব্দের স্থলে "উভয়" শব্দদ্বারা ছন্দ বা অর্থ কিছুই রক্ষিত হয় না; সুতরাং মৈথিল পদের "নিয়রে" "আবথি" "করথি" শব্দগুলির পরিবর্তে বঙ্গীয় পুঁথিতে সরলতার জন্য যে সমার্থক "নিকটে"

"আওয়ে" ও "করয়ে" পাঠ যথাক্রমে গৃহীত হইয়াছে, উহা তেমন দূষনীয় মনে না করিলেও আমরা এস্থলে কোনমতেই "উগথিক" স্থলে "উভয়" পাঠ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এই 'উভয়' শব্দটাকে শুদ্ধ পাঠ বলিয়া গ্রহণ করায়ই বোধহয় কাব্যবিশারদ মহাশয় "রবি শশি" নায়িকার কপোলদ্বয়ের সহিত উপমিত হইয়াছে, এইরূপ একটা অসঙ্গত হাস্যজনক অর্থ করিয়া ফেলিয়াছেন!

এই পদের আরও দুই একটা বাক্যের পাঠ ও অর্থ লইয়া সম্পাদকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু সেই স্থলে নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত পাঠ ও অর্থই সঙ্গত বলিয়া, আমরা গ্রীয়ারসন সাহেব, কাব্যবিশারদ মহাশয় ও ব্রজনন্দনবাবুর ভ্রম প্রদর্শিত করিতে যাইয়া বাগ্‌বাহুল্যের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

(১৮ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের "মঞে তো আজ" ইত্যাদি ১৮ সংখ্যক পদটীতে কোন ভণিতা নাই, কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটী চরণ আছে, যথা—

মঞে তো আজ দেখলি কুরঙ্গি নয়নিঞা।
সরদক চান্দ বদনিঞা॥ ২।
কনক লতা জনি কুন্দি বৈসাওল
কুচ যুগ রতন কটোরবা লো।
দশন জ্যোতি জনি মোতি বৈসাওল
অধর তম্বু পবারবা লো॥ ৪।

সম্পাদক মহাশয় টীকায় এই পদের ছন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন—

মিশ্র অহিরাণী ছন্দ। সাধারণ অহিরাণী ছন্দের লক্ষণ ২৬ হইতে ২৯ মাত্রা, প্রত্যন্তর, (ধ্রুব অথবা ধুয়া) ১২ মাত্রা। এই পদে দ্বিতীয় চরণে ১২ মাত্রা এবং তৃতীয়ে (লো শব্দ ত্যাগ করিয়া) ২৯ মাত্রা, কিন্তু প্রথম চরণে ১৯ মাত্রা।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এখানেও সম্পাদক মহাশয় মাত্রা ও চরণের গণনায় বিষম ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন; তিনি উল্লিখিত পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিকে পৃথকভাবে যথাক্রমে ঐ পদের প্রথম চরণ ও প্রত্যন্তর

বা ধুয়া বলিয়া গণনা করিয়াও, জানি না কি জন্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিকে একযোগে তৃতীয় চরণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তিকে চতুর্থ চরণ বলিয়া গণ্য করা তাঁহার কর্তব্য হইলেও উহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ এই পদটী তিন বা চারি চরণবিশিষ্ট শুদ্ধ বা মিশ্র অহিরাণী ছন্দের পদ নহে। আভিরী অপভ্রংশে—আহিরী, অহিরাণী একটা প্রসিদ্ধ রাগিণীর নাম,—উহা কোন ছন্দের নাম নহে। উদ্ধৃত পংক্তিগুলি একটা অসম্পূর্ণ মাত্রাত্রিপদী পদের তিনটী অর্দ্ধ কলি অর্থাৎ সাকল্যে দেড় কলি (stanza) মাত্র।

নগেন্দ্রবাবু "কনকলতা" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের অর্থ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"কুন্দি—কুঁদিয়া, কাটিয়া। কটোরবা—কটোরা। * * ৬-৪। কনকলতা দেহ কাটিয়া যেন কুচ-যুগল আকারে রত্ননির্মিত বাটী বসাইয়াছে।" এই লেখার ভাবে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি 'কনকলতা' অর্থাৎ দেহকেই 'কুন্দি' অসমাপিকা-ক্রিয়াটীর কর্মপদ ধরিয়া লইয়াছেন। এরূপ অর্থ কোনরূপেই সমীচীন নহে। 'কুন্দি' শব্দের অর্থ যে কুন্দ নামক তক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা কুঁদিয়া বা চাঁছিয়া—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, কনকলতারূপ কৃশ দেহকে কুঁদিয়া কুচযুগরূপ রত্ন নির্মিত বাটী বসানো যাইতে পারে কি? স্থূল দ্রব্যকে কুন্দে চাঁছিয়া কৃশ করা যাইতে পারে, কিন্তু কৃশ দ্রব্যকে চাঁছিয়া তদপেক্ষা স্থূল করা একান্তই অসম্ভব। কুচযুগের উপরিস্থিত গ্রীবা ও নিম্নস্থিত কটি উভয় অঙ্গই কুচযুগল অপেক্ষা কৃশ বটে, সুতরাং এ অবস্থায় কনকলতারূপ কৃশ দেহকে চাঁছিয়া স্থূল কুচযুগ বসাইয়াছে বলিলে নিতান্তই অসঙ্গত কথা বলা হয়। তারপরে কনকলতাবৎ দেহকে কুন্দে কাটিয়া বা চাঁছিয়া কুচযুগ নির্মিত হইলে উহাও কনকবর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু কবি কুচযুগকে এখানে কনক কটোরা না বলিয়া 'রতন কটোরা' বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অবশ্য রতন শব্দে স্থলবিশেষে স্বর্ণ না বুঝা যাইতে পারে—এমত নহে, কিন্তু এখানে আগে কনক শব্দ দ্বারা স্বর্ণ বুঝাইয়া, পরে আবার রতন শব্দের প্রয়োগ করায় উহা যে স্বর্ণ নহে, কিন্তু স্বর্ণ আধারে শোভমান অন্য কোন রত্ন সুতরাং মণিকাঞ্চন যোগহেতু পরম সুদৃশ্য ও লোভনীয় উহাই প্রতীত হয়। নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত অর্থের আর একটা গুরুতর দোষ এই যে,

কৃশ দেহকে কাটিয়া বা চাঁছিয়া কুচযুগরূপ স্থূল বাটি নির্মিত করা যদি তর্কস্থলে সম্ভবপর বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও নায়িকার স্বর্ণ লতাবৎ নধর ও কোমল দেহের উপর কুন্দ যন্ত্র রূপ শাণিত অস্ত্রপ্রয়োগের বর্ণনা দ্বারা মধুর রসের বিরোধী বীভৎস বা ভয়ানক রসই রসজ্ঞের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় 'কনকলতা' কুঁদিয়া ক্রিয়ার কর্মপদ নহে, ইহা 'বৈসাওল' ক্রিয়ার আধার অর্থাৎ অধিকরণ বটে। ত্রিচরণাত্মক ধ্রুব কলির প্রথম চরণ নাই, ইহার তিনটী অর্দ্ধ কলিতেই (half stanza) ত্রিপদীর নিয়মানুসারে দুইটি করিয়া চরণ আছে। সুরের ওজন রক্ষার জন্য চতুর্থ ও ষষ্ঠ পংক্তির শেষে যে 'লো' শব্দ আছে, উহা হিসাব হইতে বাদ দিলে সাধারণ মাত্রা ত্রিপদীর মত উহার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণগুলিতেও যথাক্রমে ১৬, ১২, ১৬ ও ১২ মাত্রাই পাওয়া যায়। 'গীতগোবিন্দে'র "লবঙ্গলতা" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের অনুকরণে রচিত মৈথিল ও বাঙ্গালা ব্রজবুলীর পদের ধ্রুব কলির ব্যতীত অন্যান্য কলিতে সর্বত্রই এইরূপ মাত্রা বিন্যাস দেখা যায়। এই মাত্রা ত্রিপদীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে ২৮টি মাত্রা আছে। ত্রিপদীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলি এক পংক্তিতে না লিখিয়া উদ্ধৃত পদের মত দুইটি চরণে বিভাগ করিয়া লিখিলে উহার অযুগ্ম চরণগুলিতে ১৬ মাত্রা ও যুগ্ম চরণগুলিতে ১২ মাত্রা পাওয়া যায়। এই পদের দ্বিতীয় চরণেও সেই ১২ মাত্রাই ঠিক আছে, কিন্তু প্রথম চরণে ১৬ মাত্রার স্থলে দুইটি মাত্রা বেশী পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রথম চরণটি ছন্দ রক্ষা করিয়া পাঠ করা যায় না। অথচ এই প্রথম ও দ্বিতীয় চরণটিকে এই পদের ধ্রুব কলি গণ্য করিয়া মাত্রার অনিয়মের কারণ নির্দেশ করাও এখানে সম্ভবপর নহে। কেননা মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দের ধ্রুব কলির তিনটি চরণের পরিমাণ নিতান্ত কমের পক্ষেও যথাক্রমে ১২, ১০ ও ১২ মাত্রা হওয়া আবশ্যক। এখানে "মঞে তো" ইত্যাদি চরণের মাত্রাগুলিকে অস্বাভাবিকরূপে বাড়াইয়া পড়িলেও উনিশ বা কুড়ি মাত্রার বেশী পাওয়া যায় না; সুতরাং উহাকে ধ্রুব কলির প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের সমষ্টি মনে করার কারণ নাই। আমাদের বিবেচনায় গায়ক বা লেখকের ভুলে এই অসম্পূর্ণ পদের ধ্রুব কলি ও 'মঞে আজ' ইত্যাদি কলির অর্দ্ধাংশ পরিত্যক্ত ও 'মঞে আজ' ইত্যাদি অর্দ্ধ কলিতে অনাবশ্যক 'তো' শব্দটী সংযোজিত হইয়াছে। 'তো' শব্দটী পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক উচ্চারণ

অনুসারে পড়িলে—"সৈ দেখলি কুর"গ-নয়নিঞা" ইত্যাদি অর্দ্ধ পংক্তিদ্বয়েও পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারেই যথাক্রমে ১৬ ও ১২ মাত্রা অর্থাৎ মাত্রা-ত্রিপদী ছকের অর্দ্ধ কলির সেই ২৮ মাত্রাই পাওয়া যাইবে। সুতরাং এজন্য নগেন্দ্র বাবু কিংবা তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিত যিনিই দায়ী হউন না কেন, এই ছন্দ ও মাত্রার বিবরণ নিতান্ত অশুদ্ধ। পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে, (কোন সুদক্ষ শিল্পী) যেন কুচযুগরূপ রত্ননির্মিত কটোরাকে কুঁদিয়া নির্মাণ করিয়া কনকলতায় বসাইয়াছে। নায়িকার কুচযুগ চিত্র বিচিত্র ক"াচুলী দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া উহাকে নানাবিধ রত্নের দ্বারা খচিত রত্নকটোরা রূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। খনি হইতে উত্তোলিত রত্নরাজিকে না কুন্দাইলে অভীষ্ট আকারে পরিণত করা যায় না, তাই রত্নরাজি কুঁদিয়া রত্ন কটোরারূপ কুচযুগ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি লোপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং এখানে 'কনকলতা' শব্দের অর্থ 'কনকলতায়' হইতে কোনই বাধা নাই। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণ হইতেই সপ্তমী বিভক্তি-লোপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

(১) নয়ন বয়ন দুই উপমা দেল।
এক কমল দুই খঞ্জন খেল॥
(১৫ সংখ্যক পদ)

নয়ন (ও) মুখ দুই উপমা দিল (উপমিত হইল) এক কমলে (যেন) দুই খঞ্জন খেলা করিতেছে। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

(২) কনক লতা অরবিন্দা।
দমনা মাঝ উগল জনি চন্দা॥ ২।
(১৬ সংখ্যক পদ)

কনকলতায় (দেহলতায়) পদ্ম (মুখ) দ্রোণ গুল্মের মধ্যে যেন চন্দ্রোদয় হইল। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

(৩) নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
শির দেল চিকুর সমারি।
(২৫ সংখ্যক পদ)

নীল বসনে তনু ঘিরিয়াছে, মস্তকে কেশ সাজাইয়া দিয়াছে। (ঐ)

(১৯ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "জুগল সৈল সিম" ইত্যাদি ১৯ সংখ্যক পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি ও 'রাগতরঙ্গিনী' পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু পাঠকদিগের হিতার্থে টীকার প্রারম্ভেই পদের ছন্দ ও মাত্রাবিবরণে লিখিয়াছেন "করুণ মালব ছন্দ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা।"

। ॥ ॥ । । । । । ॥ । । ।
জুগল সৈল সিম হিম কর দেখল
। । । । । । ॥ । । ।
এক কমল দুই জ্যোতিরে ॥

আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, নগেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত এই ছন্দের নাম ও মাত্রাবিশ্লেষণ (scanning) সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। 'করুণ মালব' রাগিণী বিশেষ,—উহা কোন ছন্দের নাম নহে। নগেন্দ্রবাবু প্রথম কলির অর্দ্ধাংশের যে মাত্রা বিশ্লেষণ করিয়াছেন উহাও ঠিক নহে। সাধারণ মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের অর্দ্ধ কলির প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যথাক্রমে ১৬ ও ১২ মাত্রা অর্থাৎ দুইটী চরণে সাকল্যে ২৮ মাত্রা পাওয়া যায়,—এখানেও সুরের পূরণের জন্য প্রত্যেক অর্দ্ধ কলির পরে প্রযুক্ত 'রে' শব্দ বাদেই ২৮ মাত্রা আছে। দ্বিতীয় চরণের 'রে' শব্দ লইয়া ১২ মাত্রা দেখাইতে যাইয়া নগেন্দ্রবাবু 'এক' শব্দের 'এ' অক্ষর ও 'জ্যোতি' শব্দের 'তি' অক্ষর লঘু অর্থাৎ এক মাত্রা পরিমিত গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু 'এ' ও 'তি' অক্ষরটীকে গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রাত্মক পাঠ না করিলে,—'এক কমল' ইত্যাদি চরণের যে ছন্দ রক্ষিত হয় না, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। মৈথিল ভাষায় 'এ' অক্ষর প্রয়োজনবশতঃ লঘু বা গুরু উভয়রূপেই পাঠ করা যাইতে পারে; 'রে' শব্দ পদের অঙ্গীয় না হওয়ায়, 'জ্যোতি' শব্দের 'তি' অক্ষরটী চরণের অন্ত্য বর্ণ বলিয়া ছন্দোশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিকল্পে গুরু ধরা যাইতে পারে। সুতরাং 'রে' শব্দ বাদেই 'এক কমল দুই জ্যোতি' বাক্যে ১২টী মাত্রা বর্ত্তমান আছে। 'রে' বর্ণ গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রাত্মক, উহাকে গণনা করিলে এই পদের অর্দ্ধ কলি ২৮ মাত্রাত্মক না হইয়া ৩০ মাত্রাত্মক হইয়া পড়ে। নগেন্দ্রবাবু ১৮ সংখ্যক পদের ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পংক্তির শেষের 'লো' সুরপূরক বলিয়া মাত্রা গণনায় বাদ দিয়াছেন। এই পদেও 'রে' শব্দটীকে বাদ দিয়াই মাত্রা গণিতে হইবে।

মাত্রা-ত্রিপদীর প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যে যথাক্রমে কেবল ১৬ ও ১২ মাত্রা থাকিলেই চলে, এরূপ নহে। ঐ মাত্রাগুলি আবার সহজে চতুর্মাত্রিক গণে বা অংশে বিভাজ্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা ছন্দোভঙ্গ ঘটে। নগেন্দ্রবাবুর প্রদর্শিত 'এক কমল' ইত্যাদি চরণে 'এ' অক্ষর লঘু ধরিলে— "এক কম। ল ‖ দুই জোতি রে।" বাক্যে ঐ চতুর্মাত্রিকগণ মিলে না,— কেননা "জোতি" শব্দের 'জো' অক্ষরটীকে সহজে কাটিয়া দুইভাগ করা যায় না, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে 'এ' ও 'তি' অক্ষর গুরু ধরিলে অতিরিক্ত সুরপূরক 'রে' অংশ বাদেই ১২ মাত্রা পাওয়া যায়, যথা— "এক ক। মল দুই। জোতি।" ছন্দ ও মাত্রার কলা ছাড়িয়া এখন পদের পাঠ ও অর্থের দিকে দেখা যাউক। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে পদের অন্তিম কলিটি নিম্নরূপ, যথা—

ভনই বিদ্যাপতি এহু পূরব পুন তহ
ঐসন ভজনে রসমন্ত রে।
বুঝয়ে সকল রস নৃপ সিব সিংঘ
লখিমা দেইবর কন্ত রে॥

নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত হস্তলিখিত পুথিখানার মধ্যে এই পদের পাঠে কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা জানা যায় না; কেননা, সম্পূর্ণ পদটার মধ্যেও তিনি কোন পাঠান্তরের উল্লেখ করেন নাই। ব্রজনন্দনবাবুর 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে কিন্তু উদ্ধৃত কলির প্রথম চরণে "এহু" শব্দটা নাই, এতদ্ভিন্ন তৃতীয় চরণের 'নৃপ সিব সিংঘ' স্থলে 'নৃপতি সিব সিংঘ' পাঠ আছে। বস্তুতঃ 'এহু' শব্দটার এখানে বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না, উহা না থাকিলেও অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত হয় না। 'এহু' থাকিলে ঐ চরণের নির্দিষ্ট ১৬ মাত্রা স্থলে ১৮ মাত্রা হইয়া পড়ে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ব্রজনন্দনবাবু 'এহু' শব্দটীকে ত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার আদর্শ পুথিতে 'এহু' শব্দ নাই,— বুঝা গেল না। বস্তুতঃ যে কারণেই হউক 'এহু' শব্দের বর্জন দ্বারা যে ছন্দোদোষ সংশোধিত হইয়াছে এবং অর্থেরও কোন ক্ষতি হয় নাই—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ পংক্তির 'পুন তহ' শব্দের অর্থ পুণ্যতঃ অর্থাৎ 'পুণ্য হইতে'। 'ঐসন' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ 'ঐ প্রকার (রমণী) রসিক পুরুষকে ভজনা করে।' সুতরাং সম্পূর্ণ অর্দ্ধ কলির অর্থ 'বিদ্যাপতি

বলিতেছেন— পূর্ব পুণ্যহেতু ঐরূপ রমণী রসিক পুরুষকে ভজনা করে।' এখানে 'এই পূর্ব পুণ্য' না বলিয়া শুধু 'পূর্ব' বলিলেও অর্থ বুঝিতে বাধা হয় না। 'নৃপ সিব সিংঘ' পাঠের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এইরূপ পাঠ স্বীকার করিলে যদি অনুস্বারযুক্ত বলিয়া 'সিং' অক্ষরটীকে গুরু গণ্য করা হয়, তাহা হইলে 'ঘ' অক্ষরটীকে সেইরূপ গুরু গণ্য না করিলে চরণের নির্দিষ্ট ১৬ মাত্রার পূরণ হয় না। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদের ভণিতায়ই রাজা শিব সিংহের উল্লেখ আছে, যথা—

রস বুঝ শিব সিংহ নৃপ সহোদার।
(নগেন্দ্রবাবুর ২০ সংখ্যক)

সিব সিংহ মিথিলা-ভূপে।
(ঐ ২১ সংখ্যক)

রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ।
(ঐ ২৩ সংখ্যক)

এই সকল স্থলে অনুস্বারযুক্ত হইলেও 'সিং' অক্ষর লঘু অর্থাৎ এক-মাত্রাত্মক রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কবি যে এখানে তাঁহার স্বাভাবিক রীতির বিপর্যয় করিয়া 'সিংঘ' শব্দের 'সিং' অক্ষরটীকে গুরু অক্ষররূপে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সম্ভববোধ হয় না। তারপরে সম্পূর্ণ অর্দ্ধ কলির অন্তে-স্থিত লঘু অক্ষর ছন্দের জন্য গুরু গণ্য করার ব্যবহার আছে, কিন্তু চারি চরণের কলির প্রত্যেক চরণের অন্তেস্থিত লঘু অক্ষরকে ইচ্ছা অনুসারে গুরু গণ্য করার নিয়ম নাই, সুতরাং এখানে সিংঘ শব্দের 'ঘ' অক্ষর দ্বিতীয় অর্দ্ধ কলির অন্তে না থাকিয়া মধ্যে থাকায় উহাকেও গুরু গণ্য করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে উদ্ধৃত ভণিতার দুইটি অর্দ্ধ কলির অন্তে (রে শব্দ ধর্তব্য নহে বলিয়া) যে দুইটি 'ন্ত' অক্ষর আছে উহা লঘু হইলেও গুরু গণ্য করিয়া অর্দ্ধ কলির পূর্বোক্ত ১৬+১২=২৮ মাত্রার পূরণ করা হইয়াছে। সুতরাং 'নৃপ সিব সিংহ (হ)' পাঠে যে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে, উহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। ব্রজনন্দনবাবুর গৃহীত 'নৃপতী' পাঠে ছন্দ রক্ষিত হইলেও 'নৃপ' 'নৃপতি' ব্যতীত 'নৃপতী' শব্দের প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য নহে। উহার স্থলে 'নরপতি' শব্দ প্রয়োগ করিলেই সকল দিক রক্ষিত হইতে পারে, আমরা উহাকেই এখানে একমাত্র সঙ্গত পাঠ বলিয়া বিবেচনা করি।

আলোচ্য পদের একটি কলি এই —

বিপরিত কনক কদলি তর শোভিত
থল পঙ্কজকে রূপ রে।
তথহুঁ মনোহর বাজন বাজয়ে
জনি জগে মনসিজ ভূপ রে॥ ৫।

নগেন্দ্রবাবু উহার টীকায় লিখিয়াছেন—

৫। বিপরীত কনক কদলী (উরু) তলে শোভিত স্থলপদ্মের রূপ (চরণ), তাহাতে যেন জগতে মনসিজ ভূপের মনোহর বাদ্য (নুপুর) বাজিতেছে।

দুঃখের বিষয় এই যে আমরা নগেন্দ্রবাবুর এই ব্যাখ্যাটীকে সম্পূর্ণ ভুল না বলিয়া পারিতেছি না। সমাস ব্যতীত সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তিলোপের উদাহরণ সংস্কৃত, হিন্দী, মৈথিল বা বাঙ্গালা কোন ভাষাতেই দেখা যায় না। ইহা ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। এ অবস্থায় উদ্ধৃত কলির চতুর্থ পংক্তির 'মনসিজ ভূপ' শব্দের কোনমতেই 'মনসিজ ভূপের' অর্থ করা যায় না, আর উহার সহিত তৃতীয় পংক্তির 'বাজন' (বাদ্য) শব্দেরও টানিয়া অন্বয় করা যাইতে পারে না। তারপরে যদিও হিন্দী, মৈথিল ও বাঙ্গালার 'জগৎ' শব্দের অপভ্রংশ 'জগ' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু উহার সপ্তমী বিভক্তিতে হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'জগ মেঁ' 'জগ মহ' কিংবা বিভক্তিলোপে শুধু 'জগ' ব্যতীত 'জগে' পদের প্রয়োগ দেখা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার সপ্তমীতে 'তে' অপেক্ষা 'এ' বিভক্তিরই বাহুল্য, কিন্তু বাঙ্গালায়ও 'জগ' শব্দের সপ্তমীতে 'জগে' পদ এযাবৎ পাই নাই। যদিও বা ভাষাতত্ত্বের নিয়ম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া জোর করিয়া ঐরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলেও এখানে 'জগতে' শব্দটার কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। নায়িকার দেহকে কবিকল্পনায় বলে যৌবনরাজ্য বা মদন ভূপতির রাজ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহাকে নির্বিশেষে জগৎ বলা যাইতে পারে না। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে মনসিজ রাজার বাদ্যে অর্থাৎ নায়িকার নুপুরের ধ্বনিতে সমস্ত জগের মনোহরণ করিতেছে, —কবির ইহা বলাই অভিপ্রেত হইলে, এই বাক্যটী সম্পূর্ণ অন্যভাবে রচনা করা আবশ্যক হইত। বর্তমান অবস্থায় সেরূপ অর্থ কোনমতেই করা যায় না। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'জাগা' অর্থে 'জগ' ধাতুর বহুল প্রয়োগ আছে, 'জাগিতেছে' অর্থে মৈথিল ভাষায় 'জগই' 'জগে' 'জগু' 'জগ' ইত্যাদি পদ

হইয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় এখানে 'জাগ' অর্থেই 'জগ' পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। গীত ও বাদ্যদ্বারা রাজাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করাইবার প্রথা প্রাচীন কালে এদেশে প্রচলিত ছিল। নায়িকার চরণকমলে নূপুরযুগল মনোহর বাদ্য করিতেছে দেখিয়া অনুমান হয়, যেন মনসিজ রাজা মনোহর বাদ্যে জাগিতেছেন। অর্থাৎ এতকাল তিনি নিদ্রিত ছিলেন, এখন সময় বুঝিয়া তিনি জাগরিত হইতেছেন। নবযৌবনার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক বর্ণনা বটে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ব্রজনন্দনবাবু এই পদের অর্থ ই লিখিয়াছেন, কিন্তু সন্দিগ্ধ 'জগে' শব্দের অর্থ লিখেন নাই। হিন্দুস্থানী ও মৈথিল ব্যক্তিদিগের নিকট 'জগে' শব্দের 'জাগে' অর্থটী এতই সহজ যে, উহার অর্থ লিখার তিনি মোটেই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ বিভক্তিহীন 'মনসিজ ভূপ' শব্দকে কর্তৃপদ ধরিলে 'জগে' অর্থাৎ 'জাগে' শব্দটাকে উহার ক্রিয়াপদ না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। হিন্দী ও মৈথিল ভাষার অনেক শব্দ ও ধাতুর রূপেই এরূপ সহজ আকারবৈষম্য অনেক সময়েই বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগেরও কিরূপ গুরুতর হাস্যজনক ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে,—ইহা তাহার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত বটে।

(২০ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২০ সংখ্যক "অধর সুশোভিত বদন সুছন্দ" ইত্যাদি পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে সংগৃহীত। উহার দুইটী কলি এইরূপ, যথা—

বিশেখি ন দেখলি এ নিরমলি রমণী।
সুরপুর সঞো চলি আইলি গজগমনী ॥ ৬।
গিম সঞো লাবল মুকুতা হারে।
কুচ জুগ চকেব চরই গঙ্গা ধারে ॥৮।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন—

৫। বিশেখি—বিশেষ, শ্রেষ্ঠতর। দেখলি—দেখিলাম। নিরমলি—নির্মিতা। ৬। সঞো—হইতে। আইলি—আসিল। ৫—৬। এই রমণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নির্মিতা (কোন নারী) দেখি নাই, স্বর্গ হইতে গজগামিনী চলিয়া আসিল। ৭। গিম—গ্রীবা। লাবল—নামিল, দুলিল। ৮। চকেব—চক্রবাক্। চরই—

চরিতেছে। ৭—৮। গ্রীবা হইতে মুক্তাহার দুলিল, যেন কুচ চক্রবাকযুগল গঙ্গাধারে (হারের পার্শ্বে) চরিতেছে।

প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, "বিশেখি ন দেখিল" ইত্যাদি পংক্তির "এ" শব্দটা শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ পংক্তির "শে" "দে" ও "এ" অক্ষর তিনটীকে লঘুরূপে উচ্চারিত না করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। যদিও মৈথিল ভাষায় 'এ' ও 'এ'-কারান্ত বর্ণ বিকল্পে লঘুরূপেও গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু একটা পংক্তিতে তিনটা দীর্ঘস্বরের এইরূপ হ্রস্ব উচ্চারণ বিদ্যাপতির ভাষায়ও বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনা হয় যে এ শব্দটা এখানে লিপিকরের ভুলে আসিয়াছে। 'এ' শব্দটা না থাকিলেও অর্থের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ 'দে' অক্ষরটা গুরু উচ্চারিত হওয়ায় প্রয়োগের স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়। বিদ্যাপতির পদে 'দেখল' ও 'দেখলি' শব্দের 'দে' অক্ষর যে প্রায় সর্বত্রই গুরুবর্ণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দেখিলেই তাহা প্রতীত হইবে, যথা—

(ক) জুগল শৈল সিম হিমকর দৈখল
(১৯ সংখ্যক পদ)

(খ) কি আরে নব যৌবন অভিরামা।
জত দেখল তত কহহি ন পরিঅ
ছও অনুপম এক ঠামা॥
(১৪ সংখ্যক পদ)

(গ) মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন স্বরূপে॥
(১৭ সংখ্যক পদ)

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সাধারণতঃ মৈথিল ভাষার 'দেখল' 'পেখল' ইত্যাদি শব্দের গুরুবর্ণগুলিকে গুরুরূপে উচ্চারিত করার দিকেই যথেষ্ট ঝোঁক দেখা যায়, কেবল যেখানে ছন্দের অনুরোধে সেগুলিকে লঘুরূপে উচ্চারিত না করিলে চলে না, সেখানেই বাধ্য হইয়া বিকল্প বিধির আশ্রয় লওয়া হয়।

বিদ্যাপতির ছন্দোবিচারে এ কথাটা সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবু 'বিশেখি ন দেখলি' ইত্যাদি পংক্তির যে ক্লীষ্ট ও অসঙ্গত অন্বয় দ্বারা পূর্বোক্ত অর্থ বাহির করিয়াছেন, তাহা আমরা কোনমতেই সমর্থন-যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। 'বিশেষ' শব্দের অর্থ যদি তর্কস্থলে শ্রেষ্ঠতর বলিয়াও স্বীকার করা যায় তাঁহা হইলেও 'বিশেষি' 'বিশেখি' শব্দের অর্থ 'বিশেষ করিয়া' ব্যতীত 'বিশিষ্ট' বা 'শ্রেষ্ঠ' কোনমতেই সিদ্ধ করা যায় না। বিদ্যাপতির পদে 'বিশেখি' শব্দটা অন্যত্র 'বিশেষ করিয়া' অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়, কুত্রাপি 'বিশিষ্ট' বা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল, যথা—

(ক) সংশয় পড়ল সব দেখি।
কেও বোলএ তাহি জুগুতি বিশেখী॥
(১৬ সংখ্যক পদ)

বিশেখী — বিশেষ করিয়া। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

(খ) হৃদয় হার মোর দেখী।
লোভে নিকট নহি হোএব বিশেখী॥
(২২২ সংখ্যক পদ)

বিশেখী — বিশেষ করিয়া। (ঐ টীকা)

(গ) নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি।
গিধিনী শ্রবণে বিশেখী॥
(২৫০ সংখ্যক পদ)

নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনিয়া, শ্রবণ গৃধিনী হইতে বিশেষ (প্রধান জিনিয়া)। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

বস্তুতঃ বিশেষ্য 'বিশেখ' শব্দটীর অর্থ সার গ্রীয়ারসন সাহেব মহোদয়ের মৈথিল শব্দকোষেও "speciality" লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত "বিশেষ" শব্দের অর্থও তাই বটে। আমাদের আলোচ্য পক্তিতেও "বিশেখী" শব্দের ঐ স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ ধরিয়াই অর্থ করা যায় যে, বিশেষ করিয়া অর্থাৎ গুণে অতিক্রম করিয়া এরূপ নির্মলা অর্থাৎ গৌরাঙ্গী সুন্দরী রমণী আর দেখি নাই। নগেন্দ্রবাবু যে "নিরমলি"

শব্দের "নির্মিতা" অর্থ করিয়াছেন, উহা সঙ্গত নহে। এরূপ অর্থে 'নিরমল' বা 'নিরমলি' শব্দের প্রয়োগ আমরা পদাবলী সাহিত্যে কোথাও পাই নাই। 'নিরমল' শব্দ ক্রিয়াপদ হইলে, উহার অর্থ 'নির্মাণ করিল' এবং বিশেষণ হইলে উহার অর্থ 'নির্মল' হইবে। এখানে 'নিরমলি' শব্দের '(বিধাতা) নির্মাণ করিল' অর্থ সঙ্গত না হওয়ায়, উহা 'নির্মলা' শব্দের অপভ্রংশ ও 'গৌরাঙ্গী সুন্দরী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বিবেচনা হয়। নগেন্দ্রবাবু যে 'রমণী' শব্দের পরে 'অপেক্ষা' অর্থে পঞ্চমী বিভক্তির লোপ করিয়া 'রমণীর অপেক্ষা' অর্থ করিয়াছেন, উহা ব্যাকরণ বা প্রয়োগ অনুসারে কোনমতেই সিদ্ধ হয় না। তাঁহার অন্বয় ও ব্যাখ্যা আগাগোড়া ব্যাকরণ ও প্রয়োগের বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত বটে। আমাদের প্রদর্শিত অন্বয় ও অর্থ ব্যাকরণ ও প্রয়োগ দ্বারা উত্তমরূপে সমর্থিত হইতেছে। অবশ্য এরূপ অর্থ করিতে হইলে একটা 'এসী' (এরূপ) শব্দ উহ্য করিতে হয়; আলোচ্য পংক্তির 'এ' শব্দটা ধরিলে, উহার অর্থও এইরূপ করা যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবুর অর্থে ব্যাকরণ ও প্রয়োগ অগ্রাহ্য করিয়াও 'কোন নারী' শব্দদ্বয় ও পঞ্চমী বিভক্তি উহ্য করিতে হইয়াছে, উহা হইতে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন মনে হয়।

নগেন্দ্রবাবু 'লাবল' (লাওল) শব্দের অর্থ 'নামিল' 'তুলিল' লিখিয়াছেন; কিন্তু এরূপ অর্থ কোনরূপে সিদ্ধ হয় না। সংস্কৃত 'লা' ধাতুর মত হিন্দী ও মৈথিল ভাষায়ও গ্রহণার্থক লা ধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সার গ্রীয়ারসন সাহেবের মৈথিল শব্দকোষে 'লা' ধাতুর অতীত 'লাএল' পদ আছে। 'লাবল' শব্দের 'ব' অন্ত্যস্থ 'ব' বলিয়া 'লাবল' 'লাওল' 'লাএল' সকল রূপই সম্ভব বটে। 'লা' ধাতুর মৌলিক অর্থ 'গ্রহণ' হইতেই 'আনিয়া সম্মিলিত করা' বা সংঘটিত করা আসিয়াছে। বিদ্যাপতির আর একটী মৈথিল পদে 'সংঘটন করে' অর্থেই আমরা 'লাবএ' শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি, যথা—

জগত কত ন জুব জুবতী
কত ন লাবএ পেম ॥
(নগেন্দ্রবাবুর ২৬০ সংখ্যক পদ)

জগতে কত কত যুবক যুবতী প্রেম সংঘটন করে। (নগেন্দ্রবাবুর টীকা)

এখানেও 'লাবল' 'সংঘটিত করিল' অর্থাৎ 'সম্মিলিত করিল' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। "'গিম সঞো' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ গ্রীবার সহিত মুক্তাহারকে

(কুচযুগের সহিত) সম্মিলিত করিল। 'সঞো' বা 'সঞে' শব্দের অর্থ যদি 'হইতে' করা যায়, তাহা হইলে অর্থ হইবে —গ্রীবা হইতে মুক্তাহারকে (কুচযুগের সহিত) সম্মিলিত করিল। অবশ্য এই বাক্যের তাৎপর্য অর্থ শ্রীরাধা গলায় হার ঝুলাইল ; কিন্তু তা বলিয়া সোজাসুজি 'লাবল' শব্দের অর্থ 'নামিল' বা 'দুলিল' করা যাইতে পারে না। সেরূপ করিলে ব্যাকরণ ও প্রয়োগকে একবারে বিসর্জন দিতে হয়। 'ল' ও 'ন' এবং 'ম' ও 'ব' অনেক সময়েই পরস্পর পরিবর্তনীয় হইলেও মৈথিল বা হিন্দী ভাষায় 'নমাবল' বা 'নমাওল' ব্যতীত 'নামাইল' বা 'দোলাইল' অর্থে 'লাওল' বা 'নাওল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না।

(২২ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ২১ সংখ্যক পদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। তাঁহার ২২ সংখ্যক "শুনহ নাগর কান" ইত্যাদি পদটীর টীকার শেষে লিখিত হইয়াছে—"বটতলার পুস্তক হইতে সংশোধিত পদ"। বস্তুতঃ কলিকাতার বটতলার মুদ্রাযন্ত্রসমূহ হইতে বহু গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্র-বাবু উহার কোন্ গ্রন্থ হইতে এই পদটী সংগৃহীত করিয়াছেন, বুঝা গেল না। সে যাহা হউক, এই পদে শ্রীরাধার শাশুড়ী জটিলা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, যথা —

জটিলা-বধূ নবীন বালি।
অপন সোভাবে কয় খেয়ালী॥

বিদ্যাপতির কোন নিঃসন্দিগ্ধ পদেই জটিলা নামে শ্রীরাধার শাশুড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন কি তাঁহার সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' গ্রন্থেও 'জটিলা' নামের ব্যবহার দেখা যায় না। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৫৩৪ সংখ্যক "জটিলা শাশ ফুকরি তহিঁ বোলত" ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতা যুক্ত পদটী যে বিদ্যাপতির রচিত নহে,— উহার প্রমাণ উক্ত ৫৩৪ সংখ্যক পদের আলোচনায় দেওয়া যাইবে। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে বটতলার পুস্তকের "শুনহ নাগর কান" ইত্যাদি পদের ভাষা অথবা ভাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহাতে উহাকে বিদ্যাপতির রচিত মনে করা যায়। পক্ষান্তরে উহার 'জটিলা' শব্দ এবং ছন্দোদুষ্ট "অপন সোভাবে কর খেয়ালি" ইত্যাদি

বাক্যসমূহই উহাকে ব্রজবুলী রচনায় অপরিপক্ক কোন বঙ্গীয় কবির রচনা বলিয়াই স্পষ্ট পরিচয় দেয়।

(২৩ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২৩ সংখ্যক "সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা" ইত্যাদি পদটি 'পদকল্পতরু'র ১০৫৯ সংখ্যক পদ বটে। এ পদের শুদ্ধ ও প্রামাণিক পাঠ মৎসম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য। নগেন্দ্রবাবু 'পদকল্পতরু' অশুদ্ধ সংস্করণ হইতে পাঠগ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, এই পদে যে কতকগুলি ভুল করিয়াছেন, উহার আলোচনা করিয়াই আমাদের আজিকার বক্তব্য শেষ করিব।

এই পদের অন্তিম কলিদ্বয়, যথা —

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কো পয়ে জান।
রাজা শিব সিংহ রূপ নরায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

নগেন্দ্রবাবুর পাঠ ও টীকা, যথা—

তিন বাণ মদন তেজল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধইতে রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে॥ ৮॥

ভণই বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কেও পয় জানে।
রাজা শিব সিংহ রূপ নরায়ণ
লখিমা দেবী রমানে॥ ১০॥

৭—৮। মদন তিন বাণ ত্রিলোকে ত্যাগ করিল, দুই বাণ অবশিষ্ট রহিল। বিধি বড় নিষ্ঠুর, রসিক পুরুষকে বধ করিবার জন্য (সেই দুই বাণ) তোমার নয়নে সমর্পণ করিয়াছেন।

৯। কেও—কেহ। পয়—অব্যয় শব্দ।

১০। রমাণ—রমণ, বল্লভ।

৯—১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, এই রস লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণের (তুল্য) কেহ (বিরল ব্যক্তি) জানে।

প্রথমেই বক্তব্য এই যে, নগেন্দ্রবাবু 'জিতল' শব্দের স্থলে বটতলার পুস্তকের 'তেজল' পাঠ গ্রহণ করিয়া যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। মদন স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল—এই তিন লোকে তিনটি বাণ ত্যাগ করিল, শুধু ইহা বলিলেই ত্রিলোকের জয় বুঝা যায় না। 'তেজল' পাঠের স্থলে সকল পুথিতেই 'জিতল' ও কেবল বটতলার আদর্শ 'ক' পুথিতে 'তিজল' পাঠ আছে। প্রাচীনতর ও প্রামাণিক 'খ' 'ঘ' পুথির 'জিতল'ই লিপিকরের ভুলে 'তিজল' পাঠে পরিণত হইয়াছে— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থ হইবে—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,) মদন তাঁহার তিনটি বাণের দ্বারা তিন লোক জয় করিলেন, দুইটি বাণ উদ্বৃত্ত হইল; সুতরাং সেই দুইটি বাণ নিজের নিকট রাখিয়া কোন কার্য নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি রসিক পুরুষদিগের পরাজিত করার জন্য তোমার নয়নদ্বয়ে এ দুইটি বাণ সমর্পণ করিয়াছেন।

এই 'তেজল' পাঠের সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, পূর্ববর্তী সম্পাদক কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে 'জিতল' পাঠ ও উহার টীকায় 'জয় করিয়াছেন' অর্থ লিখিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু অনেক স্থলেই কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত অনেক অশুদ্ধ পাঠ সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন; এরূপ অবস্থায় তিনি এখানে তাঁহার শুদ্ধ ও সঙ্গত পাঠটী ত্যাগ করিয়া অশুদ্ধ ও অসঙ্গত পাঠ কেন গ্রহণ করিলেন, বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় কথা, তিনি যে জন্যই হউক 'বধিতে' শব্দের স্থলে 'বধইতে' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু উহাতে যে পংক্তিটীতে ১৬ মাত্রার স্থলে ১৭ মাত্রা হওয়ার ছন্দোভঙ্গ ঘটে, তিনি উহা লক্ষ্য করেন নাই। বেণীপুরী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর অন্ধ অনুকরণে তাঁহার অধিকাংশ অশুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও এখানে ছন্দোভঙ্গ সুস্পষ্ট বুঝিয়াই বোধহয় নগেন্দ্রবাবুর 'বধইতে' স্থলে 'বধয়ে'

পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে ছন্দ রক্ষিত হইলেও অর্থের অসঙ্গতি হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, 'বধয়ে' শব্দের অর্থ 'বধ করে' না হইয়া 'বধ করিবার জন্য' হইতে পারে না। বেণীপুরী মহাশয় 'বধয়ে' পাঠ কল্পনা করিয়াও ঐ বাক্যের অর্থ করিয়াছেন— "ব্রহ্মা বড়া হী নিষ্ঠুর হৈ, (উনবচে হুএ দো বাণোঁ কো) রসিকোঁ কী হত্যা করনে কে লিয়ে তুহ্মারে নয়নোঁ কো সৌঁপ দিয়া।" ব্রজনন্দনবাবু তাঁহার 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি' গ্রন্থে 'বধিতে' শব্দের স্থলে 'বধত' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বধত' শব্দের অর্থ—'বধ করে' অথবা 'বধ করিতে' উভয়ই হইতে পারে। বস্তুতঃ এখানে যে 'বধিতে' পাঠ আছে, উহার 'তে' অক্ষর মৈথিল ভাষার নিয়ম অনুসারে বিকল্পে লঘু গণ্য করিলে উহা দ্বারা ছন্দের কোন হানি হয় না ; সুতরাং ছন্দের জন্য 'বধত' পাঠ কল্পনা করার কোন কারণ দেখা যায় না। যদিও আধুনিক মৈথিল ভাষায় 'করিতে' 'যাইতে' ইত্যাদির অর্থে 'করইত' 'জাইত' ইত্যাদি রূপগুলির অধিক প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু 'করিতে' 'জাইতেঁ' ইত্যাদি রূপগুলিও প্রাচীন প্রয়োগে দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা স্যার গ্রীয়ারসনের মৈথিল শব্দকোষে 'জাইত' ও 'জাইতেঁ'— এই উভয় রূপই পাইয়াছি। সুতরাং বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলীর 'করিতে' 'যাইতে' ইত্যাদি বহু কৃদন্ত শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যে তৎস্থলে 'করইত' 'যাইত' ইত্যাদির ব্যবহার করিয়াছেন, উহা আমরা সমীচীন মনে করি না। ঐরূপ করিলে আলোচ্য 'বধইতে' শব্দের ন্যায় অনেক স্থলেই যে ছন্দের মাত্রা ঠিক থাকে না, উহা দ্বারাই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ স্থলে 'করত' 'জাইত' ইত্যাদি অথবা বঙ্গীয় পুথি অনুসারে 'করিতে' 'যাইতে' ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক শব্দ ব্যতীত কোনরূপেই 'করইত' ইত্যাদি চতুর্মাত্রিক শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত 'যুবতি' পাঠেও ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য বটে। বেণীপুরী মহাশয় উহা বুঝিতে পারিয়াই তৎস্থলে 'জৌবতি' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'যুব' 'জৌ' গুরু অক্ষর বলিয়া উভয়ই এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে। বিদ্যাপতির মৈথিল পুথিতে অনেক স্থলেই 'যুবতি' শব্দের পরিবর্তে 'জৌবতি' বা উহার অপভ্রংশ 'জৌমতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রজনন্দনবাবু ছন্দের দোষ এড়াইবার জন্য 'যুবতী' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 'যুবতী' সংস্কৃত রূপ হইলেও হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় প্রায়শঃ 'যুবতি' (জুবতি) ব্যতীত 'যুবতী' শব্দের ব্যবহার দেখা

যায় না। বিদ্যাপতির ছন্দের আর একটা বিশেষত্ব এই যে উহাতে শব্দের আদ্য বর্ণকে গুরুরূপে ধ্বনিত করার প্রবণতা দেখা যায়। 'যুবতি' 'যৌবতী' বা 'যুবতী' শব্দগুলির প্রত্যেকটী চতুর্মাত্রিক শব্দ হইলেও 'যুবতি' বা 'জৌবতি' শব্দের প্রথম অক্ষর গুরু উচ্চারিত হইলেই উচ্চারণের উক্ত স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়, কিন্তু 'যুবতী' পাঠে সেই স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয় না, বিশেষতঃ প্রচলিত ব্যবহার লংঘন করিয়া 'তী' অক্ষরকে গুরু উচ্চারিত না করিলে ছন্দোভঙ্গই ঘটিয়া থাকে। বিদ্যাপতির ছন্দের রহস্যজ্ঞ বেণীপুরী মহাশয় এজন্যই সংস্কৃত 'যুবতী' শব্দটা সুলভ হইলেও উহা না লইয়া 'জৌবতি' শব্দই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের মৈথিল শব্দকোষে 'জুবতি' ও 'জৌমতি' শব্দ আছে; 'যুবতী' বা 'জুবতী' শব্দ নাই।

নগেন্দ্রবাবুর "কেও পয় জানে" পাঠ ও উহার অর্থ কিঞ্চিৎ রহস্যপূর্ণ। 'পদকল্পতরু'র 'ক' 'খ' পুথি 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর' পুথিতে 'কেও পয় জানে' স্থলে 'কো যুবতি জান' এবং 'ঘ' 'চ' পুথিতে 'কো পয়ে জান' পাঠ আছে। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ও তদনুযায়ী ব্রজনন্দনবাবুর সংস্করণে 'কূপ যে জানে' পাঠ আছে। কাব্যবিশারদ টীকায় লিখিয়াছেন, "কূপ কোন ২ হস্তলিখিত পুস্তকে 'কোপ' পাঠ পাওয়া গেল।" তিনি তাঁহার ধৃত 'ইহ রস কূপ যে জানে' বাক্যের কোন অর্থ করার প্রয়াস করেন নাই। ব্রজনন্দনবাবু শুধু "রসকূপ = অগম রস" অর্থাৎ অগম্য রস লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে দুই এক স্থানে কেবল রসের কূপ ইত্যাদি প্রয়োগ পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতির পদে তাদৃশ প্রয়োগ দেখা যায় না। বস্তুতঃ আমাদিগের দৃষ্ট উক্ত পুথিগুলিতে 'কূপ' বা 'কোপ' পাঠ নাই। 'ইহ রস কো জান' পাঠেই অনভিজ্ঞ লিপিকরের ভুলে 'ইহ রস কোপ' (অথবা কূপ কে জানে), অদ্ভুত পাঠে পরিণত হইয়াছে। সে যাহা হউক নগেন্দ্রবাবু যে কোথায় 'ইহ রস কেও পয় জানে' পাঠ পাইলেন বুঝা গেল না। বোধ হয় উহা তাঁহার অনেক পাঠের মতই সম্পূর্ণ মনোকল্পিত। এরূপ অপ্রামাণিক ও কল্পিত পাঠ গ্রহণ করিয়াও তিনি কোন সঙ্গত অর্থ করিতে পারেন নাই। তিনি 'পয়' শব্দটীকে অব্যয় শব্দ লিখিয়াই অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অব্যয় শব্দের কি কোন অর্থ নাই? সকল ভাষার সকল অব্যয় শব্দেরই অনেক সময়েই একাধিক অর্থ পাওয়া যায়।

এখানে 'পয়' শব্দের কি অর্থ, তাহা নির্ণয় কর্তব্য ছিল। নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার অন্ধ অনুকরণে বেণীপুরী মহাশয় ব্যাকরণের নিয়মবিরুদ্ধ দূরান্বয় করিয়া এই অন্তিম কলির যে অর্থ দিয়াছেন উহা কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না। প্রামাণিক ও শুদ্ধ পাঠ প্রথমেই উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার কি অর্থ হইতে পারে, এখন উহাই বিচার্য বটে। গ্রীয়ারসন মহোদয়ের শব্দকোষে 'পয়' বা 'পৈ' শব্দের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "Prep. on ; upon: in ; form (of time), Conj though, although : properly indecl. part of."

এখানে 'পয়' শব্দের though বা although অর্থ ধরিয়া উক্ত বাক্যের অর্থ হয়,—বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে যুবতিশ্রেষ্ঠ। যদি কেহ এই রসকে জানেন, (তবে,) রূপনারায়ণ (উপাধিবিশিষ্ট) রাজা শিবসিংহ ও লছিমা দেবী (উহার) প্রমাণ অর্থাৎ তাঁহারা উভয়ে ঐ রসতত্ত্বের নির্ণয়ে সমর্থ বটে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে, রাজকর্মচারীরা রাজার নিকটে কোন বিষয় নিবেদন করিলে, শেষে 'অত্র স্বামি-পাদাঃ প্রমাণম্'—এইরূপ বাক্যের উপসংহার করিতেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমি যতদূর জানি মহারাজের নিকট নিবেদন করিলাম, ইহার প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয়ে মহারাজই সমর্থ।

রাজসভাসদ্ কবি বিদ্যাপতিও বহু পদেই নিজের অনুভব বর্ণিত করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের ও তাঁহার প্রধান মহিষীর গুণজ্ঞতা ও রসজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া পদের উপসংহার করিয়াছেন। মৈথিল কোন কোন পুথিতে 'প্রমাণ' শব্দজাত 'পরমাণ' শব্দটী লিপিকরদিগের প্রমাদহেতু বিকৃত হইয়া 'বিরমাণ' বা 'রমাণ' রূপ ধারণ করায় নগেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার অনুকরণে বেণীপুরী মহাশয় এরূপ স্থলে পাঠ ও অর্থের গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। যদিও গ্রীয়ারসনে কুত্রাপি 'রমাণ' পাঠ নাই, তথাপি 'রমণ' শব্দ হইতে যে অপভ্রংশ 'রমাণ' না হইতে পারে, তাহা নহে। আমাদিগের ইহাই বক্তব্য এখানে এবং এরূপ আরও অনেক স্থলে 'রমাণ' প্রামাণিক পাঠ নহে। এই যে সকল পদে লিপিকরদিগের প্রমাদবশতঃ 'পরমাণ' পাঠ 'বিরমাণ' 'রমাণ' পাঠে পরিণত হইয়াই অর্থের দুর্বোধ্যতার কারণ হইয়াছে, বলা আবশ্যক যে, কাব্যবিশারদ মহাশয় ও তাঁহার অনুকরণে ব্রজনন্দনবাবু এখানে 'পরমাণে' পাঠ গ্রহণ করিয়াও ঐ আপাতদুর্বোধ্য শব্দটার অর্থ করার কোন প্রয়াস করেন

নাই। কাব্যবিশারদ মহাশয় "মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে" ইত্যাদি পদের ভণিতার "লছিমা দেবি পরমাণে" বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—"পরমাণে—প্রমাণে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সম্মুখে।" সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক প্রত্যক্ষাদি ন্যায়ানুসারী প্রমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ অর্থে প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। "ত্বরা করি যাহ বীর রাম সন্নিধান। এই কথা কহ গিয়া তাঁহার প্রমাণ" ইত্যাদি স্থল ইহার দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গত ভাবে "প্রমাণ" শব্দের "প্রত্যক্ষ" অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আলোচ্য স্থলে "প্রত্যক্ষে" বা "সম্মুখে" অর্থ সংলগ্ন হয় না। সুতরাং এখানে 'পরমাণ' শব্দের পূর্ব ব্যাখ্যাত অর্থই যে ঠিক, তাহাতেও সন্দেহ নাই। "কহ গিয়া তাঁহার প্রমাণ" বাক্যেও সেই মূল অর্থই অন্তর্নিহিত আছে। অর্থাৎ —রামের সন্নিধানে যাইয়া এই কথা বল, তিনিই তোমার কথার তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১৫০, ১৭১, ২০৬ ও ২৪৮ সংখ্যক পদেও 'পরমাণ' শব্দটা কোথাও লিপিকরের ভুলে আর কোথাও বা গ্রীয়ারসন্ সাহেবের অন্ধ অনুকরণের ফলে—'বিরমাণ' রূপ ধারণ করিয়া নগেন্দ্রবাবুর দ্বারা "রমণ", "বল্লভ" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রীয়ারসন্ কিন্তু বিদেশী হইলেও অতদূর যাইতে সাহস করেন নাই। তিনি শব্দকোষে সন্দেহসূচক চিহ্ন দিয়া লিখিয়াছেন— "বিরমাণ, a queen (?)।"

(২৪ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ২৪ সংখ্যক পদটী এইরূপ যথা—

(সখীতে সখীতে কথা)

ধনি মুখ মণ্ডল চান্দ বিরাজিত
লোচন খঞ্জন ভাঁতি।
মদন চাপ জিনি ভৌঁহ লগ যুগ
দশনহি মোতিম পাঁতি॥ ২।
সখি হের রমণমোহিনি রাই।
কত কত বিদগধ হেরিতেহি মুরছিত
মদন পরাভব পাই॥ ৪।
কনক বিরোচি মনিহার বিলম্বিত
অধরহি বিম্ব অকারা।

নব উরজ পর মোতি বিরোচিত
সুমেরু সুরসরি ধারা॥ ৬।
(কীর্তনানন্দ।)

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন—

২। লগ—লাগে, অনুমান হয়।
৩। রমণমোহিনি—বল্লভ মোহিনী।
৪। বিরোচি—বিরচিত, খচিত।
৫। অকারা—আকার।
৬। নব পয়োধরের উপর মুক্তা (মালা) শোভিত (যেন) সুমেরুতে গঙ্গাধারা।

নগেন্দ্রবাবু মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত 'কীর্তনানন্দে'র যে হস্তলিখিত পুথি হইতে এই ভণিতাহীন পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঠিক সেই পুথিখানিই পরে লালগোলার রণরাজা বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে মুর্শিদাবাদ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও উপযুক্ত সংশোধনের ত্রুটিতে মুদ্রিত গ্রন্থে অত্যধিক ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তথাপি বলা আবশ্যক যে এই পদের অর্থহীন, 'লগ যুগ' স্থলে উহাতে 'লতা যুগ' শুদ্ধ পাঠই মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার ২০১ সংখ্যক পুথি ও উহার 'পদরত্নাকর' পুথিতেও আমরা 'লতা যুগ' পাঠই পাইয়াছি। যদি নগেন্দ্রবাবু 'লগ—লাগে, অনুমান হয়' এইরূপ টীকা না করিতেন, তাহা হইলে ইহা ছাপাখানার ভুল মনে করিয়াই আমরা হয়ত ইহাকে উপেক্ষা করিয়া যাইতাম; কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর স্বীকৃত পাঠ, তাঁহার টীকায়ই উহা জানা যাইতেছে। নগেন্দ্রবাবু পুথির ও মুদ্রিত গ্রন্থের অনেক পাঠ শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন; এরূপ অবস্থায় এখানে পুথির শুদ্ধ পাঠ অশুদ্ধ করিলেন কেন, প্রথমে উহার কারণ বুঝিতে আমাদের মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল; কিন্তু পরে বুঝিলাম যে তিনি বুঝিয়া শুনিয়া 'লতা' শব্দকে 'লগ' করেন নাই। প্রাচীন পুথির পুটুলি ও মাত্রাচিহ্নহীন কিঞ্চিৎ বিকৃত রূপ 'তা' অক্ষরটীকে তিনি ভুলে 'গ' অক্ষর মনে করিয়াই 'লতা' শব্দের স্থলে 'লগ' পাঠোদ্ধার করিয়া, অগত্যা কষ্টকল্পনার বলে 'লগ' শব্দের ঐরূপ একটা অদ্ভুত অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিদ্যাপতির পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে বিদ্যাপতির কোন পদেই 'লগ' শব্দের 'অনুমান হয়'

অর্থ পাওয়া যায় নাই। তর্কস্থলে যদি 'লগ' শব্দের এরূপ অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও 'লগ' ক্রিয়াপদটা মধ্যে রাখিয়া, "ভেঁাহ" (ভুরু) শব্দের সহিত 'যুগ' (যুগল) শব্দের যে কি প্রকারে সমাস অন্বয় হইতে পারে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য বটে। ইহা ব্যতীত 'লগ' পাঠ হইলে 'মদন চাপ' ইত্যাদি পংক্তির এক মাত্রা কম পড়ে। 'লতা' পাঠে ছন্দ, অর্থ অন্বয় সমস্তই রক্ষিত হয়। সুতরাং 'লগ' যে পাঠোদ্ধারের ভুল,—তাহাতে সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু প্রায় সকল পদেরই প্রায় সকল সহজ ও কঠিন শব্দের ও বাক্যের অর্থ লিখিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু, তিনি এখানে 'ভেঁাহ লগ যুগ'—এই একান্ত দুর্বোধ্য বাক্যের অর্থ না দিয়া, শুধু 'লগ' শব্দের একটা কাল্পনিক অর্থ দিয়া ক্ষান্ত হওয়ায়, ইহাই মনে হয় যে, এরূপ অর্থ করিলে ভেঁাহ শব্দের সহিত যুগ শব্দের যে যোড়া মিলে না তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াও গত্যন্তরের অভাবে আসল কঠিন ও দুর্বোধ্য কথাটাই চাপা দিয়া গিয়াছেন!

এখন আর কয়েকটি পাঠ ও অর্থের বিচার করা যাউক। 'সখি হের রমণ মনমোহিনী রাই' বাক্যের স্থলে পূর্বোক্ত ২০১ সংখ্যক পুথির পাঠ—'সখি বড় মোহিনী রাই।' 'পদরত্নাকর' পুথির পাঠ—'সখি হে কিয়ে মনমোহিনী রাই।' আমাদের বিবেচনায় 'কীর্তনানন্দে'র ছন্দোদুষ্ট পাঠ অপেক্ষা এই উভয় পাঠই অধিক সঙ্গত। নগেন্দ্রবাবুর 'বিরোচিত' শব্দের স্থলে ২০১ সংখ্যক পুথি ও 'পদরত্নাকর' পুথিতে 'রচিত' পাঠ আছে। 'বিরচিত' শব্দের অপভ্রংশ হিন্দী বা মৈথিল ভাষায় 'বিরোচি' শব্দের আর প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না, বিশেষতঃ 'রচিত' পাঠের পরিবর্তে 'বিরোচি' পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে, সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ কারণেই আমরা 'রচিত' পাঠ প্রামাণিক ও সঙ্গত মনে করি।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'নব উরজ' ইত্যাদি পংক্তির পাঠও ছন্দোভঙ্গদুষ্ট বটে। ঐ পক্তির স্থলে ২০১ সং পুথির পাঠ—

নব উরজ পরি মোতি বিরাজিত

'পদরত্নাকরে'র পাঠ—

নব উর উপর মোতি বিরাজিত।

উভয় পাঠই ছন্দোদুষ্ট, কিন্তু উভয়ের তুলনা দ্বারা প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ পাওয়া যাইতেছে—

নব উরজ উপর মোতি বিরাজিত ।

বলা বাহুল্য যে, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'কীর্তনানন্দে'র "বিরোচিত" পাঠ এখানেও শুদ্ধ বা সংলগ্ন নহে।

নগেন্দ্রবাবু কাল্পনিক ও ছন্দোদুষ্ট 'সুরসরি' পাঠ গ্রহণ করিলেও 'কীর্তনানন্দ' গ্রন্থে এবং ২০১ সংখ্যক ও 'পদরত্নাকর' পুথিতে 'সুরেশ্বরি' পাঠ আছে। 'সুর-সরিৎ' শব্দের অর্থও 'সুরেশ্বরী' শব্দের ন্যায় গঙ্গা বটে। যথা—

দেবি সুরেশ্বরি ভগপতি গঙ্গে।
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে ॥

(গঙ্গাষ্টক)

'সুরসরিৎ' শব্দের অপভ্রংশ 'সুরসরি' সিদ্ধ হইলেও এখানে 'সুরসরি' পাঠ গ্রহণ করিলে অগত্যা সুমেরু শব্দের 'সে' অক্ষরটাকে গুরুরূপে উচ্চারিত না করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে। মৈথিল ভাষায় একারযুক্ত বর্ণ বিকল্পে গুরু গণ্য হইলেও বিদ্যাপতির পদে সুমেরু শব্দের 'সে' অক্ষর প্রায় সর্বত্র লঘুরূপেই উচ্চারিত হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং এখানে উহার ব্যাতিক্রম করা সঙ্গত মনে হয় না। যখন সকল পুথিতেই 'সুরেশ্বরি' পাঠ আছে, তখন 'সুরেসরি' পাঠের কল্পনা অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত। এই পদের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, নগেন্দ্রবাবু শুধু রচনার সাদৃশ্য দর্শনে বঙ্গীয় পুথির অনেক ভণিতাহীন পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া নিজের সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ অনুমানে পদ নির্বাচন করিতে যাইয়া তিনি অনেক সময়েই গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা যথাস্থলে সেই সকল পদের কৃতিত্বের আলোচনা করিব। এখানে কিন্তু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতে যাইয়াও নগেন্দ্রবাবু লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য হইয়াছেন, কেননা যদিও তাঁহার আলোচিত 'কীর্তনানন্দ' পুথি বা আমাদিগের আলোচিত সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে এই পদের ভণিতার কলিটি পাওয়া যায় না, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের 'পদরত্নাকর' পুথির ষষ্ঠ তরঙ্গের ১২ সংখ্যক 'ধনি মুখ মণ্ডল' ইত্যাদি পূর্বালোচিত পদের শেষে আমরা বিদ্যাপতির ভণিতাটী পাইয়াছি ; যথা —

অলখিতে সত্বর অম্বরে ঝাঁপল
বঙ্কিম নয়নে নেহারী।
বিদ্যাপতি কহ সহচরীগণ সহ
পেখলুঁ অপরুব নারি॥

প্রাচীন কোন পদকর্তাই ভণিতাহীন পদ রচনা করেন নাই, বিশেষতঃ নগেন্দ্র-বাবুর সংস্করণে যেভাবে পদটা শেষ হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণনার ত্রুটি থাকিয়া যায়। 'পদরত্নাকর' পুথির এই অন্তিম কলির দ্বারা অসম্পূর্ণ পদটীর সুন্দর ও স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি হইয়াছে; সুতরাং আমরা এই ভণিতার কলিটী প্রামাণিক বলিয়াই বিবেচনা করি। এই কলির বর্ণনাদ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, এই পদটী সখীতে সখীতে কথা নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটা পদ বটে। নগেন্দ্রবাবু না জানিয়া ইহাকে "বয়ঃসন্ধি" অধ্যায়ে স্থান দিয়াছেন। এই অন্তিম কলির বর্ণনাদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বালোচিত নগেন্দ্রবাবুর 'সখি হের রমণ মোহিনি রাই' পাঠ এইরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রীরাধার অনুরাগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে তাঁহার 'রমণ' অর্থাৎ 'বল্লভ' বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভবপর বা সঙ্গত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে শ্রীরাধার রূপমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সখী অর্থাৎ নিজের আপ্তদূতীর নিকট 'সখি হে কিয়ে মনমোহিনি রাই' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীরাধার সানুরাগ বর্ণনা যথেষ্ট স্বাভাবিক ও সুন্দর বটে। যাহা হউক, সযত্নে বহুসংখ্যক প্রাচীন পুথি মিলাইলে, কখন কখন এরূপ লুপ্ত রত্নোদ্ধারও করা যাইতে পারে, সুতরাং প্রাচীন পদাবলীর আলোচনায় একাধিক প্রাচীন পুথির তুলনা ব্যতীত কোন রূপেই ইষ্ট সিদ্ধির আশা করা যাইতে পারে না — এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা এই পদের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

(২৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর 'জাইতি দেখলি পদ' ইত্যাদি ২৫ সংখ্যক পদটী সার গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের সংস্করণে ও ব্রজনন্দনবাবুর 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি'

গ্রন্থে আছে। নগেন্দ্রবাবু গ্রীয়ারসন্ সাহেবের পাঠ ও অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই পদের সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

নগেন্দ্রবাবুর ২৬ সংখ্যক 'পথগতি নয়নে মিলল রাধা কান' ইত্যাদি পদটীতে কবিশেখরের ভণিতা আছে। কবিশেখর যে বিদ্যাপতির একটা উপনাম বা উপাধি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার প্রাচীন বাঙ্গালী পদকর্তা রায়শেখর যে তাঁহার অনেক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদে কবিশেখর নামে ভণিতা দিয়াছেন ইহাও সর্ববাদিসম্মত কথা বটে। বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলীর প্রভাবে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হইয়া ব্রজবুলীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়ায় এখন বিদ্যাপতির অধিকাংশ বঙ্গীয় পদের ভাষা দেখিয়া সেগুলিকে রায়শেখর গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্রজবুলী রচনা হইতে চিনিয়া লওয়া একান্ত অসাধ্য না হইলেও কঠিন মনে হয়। ফলতঃ নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার উপদেষ্টা মৈথিল পণ্ডিতগণ এজন্যই ভাষার সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া, ভণিতা-হীন ও কবিশেখর, চম্পতি, ভূপতি প্রভৃতির ভণিতাযুক্ত বহু সংখ্যক পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় নগেন্দ্রবাবু ঐ সকল পদ তাঁহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়া, অযথাভাবে তাঁহার গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। চম্পতি, ভূপতি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এখানে আমরা বাঙ্গালী কবি রায়শেখর ওরফে কবিশেখরের যে সকল পদ নগেন্দ্রবাবু কর্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে অনঙ্গতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে উহাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নগেন্দ্রবাবুর আলোচ্য ২৬ সংখ্যক পদ ছাড়া, ১২৮, ১৭৮, ১৮৯, ২৩৬, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৫, ২৭৬, ২৯০, ২৯২, ৩০২, ৩১৬, ৪৩৬, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৯৭, সংখ্যক পদগুলি যে বাঙ্গালী পদকর্তা কবিশেখর অর্থাৎ রায়শেখরের রচিত, উহার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ (internal) প্রমাণ আছে। আমরা নিম্নে সাধারণভাবে সেই প্রমাণগুলির উল্লেখ করিব, এই পদগুলির সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ কথা যথাস্থলে আলোচিত হইবে।

১। উল্লিখিত পদগুলি রায়শেখরের রচিত অষ্টকালীয় লীলার বর্ণনাত্মক 'দণ্ডাত্মিকা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। রায়শেখর কেবল স্বরচিত পদদ্বারাই ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন, ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বটে। বস্তুতঃ 'দণ্ডাত্মিকা'

গ্রন্থে 'রায়শেখর' 'শেখর' 'কবিশেখর' 'কবিশেখর রায়' ইত্যাদি নামের ভণিতা ছাড়া অন্য কোন পদকর্তার ভণিতা পাওয়া যায় না। এই সকল পদের প্রায় পনের আনা পদ যে রায়শেখরের রচিত, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই; এ অবস্থায় বাকি এক আনা পদ রায়শেখর কি জন্য যে নিজের নামে আত্মসাৎ করিবেন, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। সুতরাং বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে এই পদগুলিও রায়শেখরের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।

২। উল্লিখিত পদগুলি 'দণ্ডাত্মিকা' গ্রন্থ হইতে 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন পদসংগ্রহে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু অপর পক্ষ এই পদগুলির মধ্যে কোন পদই মৈথিল 'রাগতরঙ্গিণী' কিংবা বিদ্যাপতির পদাবলীর তালপত্রের পুথিতে পাওয়া যায় নাই। এগুলি কবিশেখর উপাধিধারী বিদ্যাপতির রচিত হইলে উহার মধ্যে অন্ততঃ কোন কোন পদের মৈথিল রূপান্তর (version) মিথিলায় অবশ্যই পাওয়া যাইত।

৩। এই সকল পদের ব্রজবুলী ভাষার সহিত সাধারণতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞ-দিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব নহে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণের ভূমিকায় বিশেষভাবে ২৩৫ ও ২৯০ পদ দুইটার রচনা বিদ্যাপতির ব্যতীত আর কাহারও বলিয়া মনে হয় না—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ঐ পদদ্বয় ভাষাতত্ত্বের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসারেও যে বাঙ্গালী কবির ব্রজবুলী রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয় তাহা আমরা অপ্রকাশিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের ভূমিকার ১৲—১৵ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি; বিশেষ জিজ্ঞাসু পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। এখানে সে সকল কথার পুনরুক্তি করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইব না। এই ভাষা বিচারের প্রধান বক্তব্য কথা এই যে, বিদ্যাপতির রচনা বাঙ্গালায় আসিয়া স্বাভাবিক নিয়মে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও উহাতে অপভ্রংশ মৈথিল শব্দের সংখ্যা ও মৈথিল রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ অনেক অধিক পাওয়া যায়, কিন্তু রায়-শেখর, গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্রজবুলী রচনায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া বাঙ্গালা ব্রজবুলী রচনায় অনেক সময়েই ছন্দের এরূপ অনেক ত্রুটি দেখা যায়, যাহা বিদ্যাপতির মৈথিল মাত্রা ছন্দের রচনায়

একান্ত দুর্লভ বটে। দৃষ্টান্তস্থলে আলোচ্য ২৬ সংখ্যক পদটাই দেখুন। উহার প্রথম কলিটা এইরূপ, যথা—

পথ গতি পেখল মো রাধা।
দুহু মনে মনসিজ পুরল সন্ধান॥

এখানে দুই-দুই চারিমাত্রার রাধা শব্দটি ছন্দের অনুরোধে দুই মাত্রার শব্দরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ 'রাধা' শব্দটী এরূপ লঘু বর্ণদ্বয় রূপেই উচ্চারিত হয়। সুতরাং এরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালী কবির পক্ষেই কেবল স্বাভাবিক বটে। মৈথিল বিদ্যাপতির মাত্রা-ছন্দের পদে এরূপ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। দৃষ্টান্তস্থলে নগেন্দ্রবাবুর ৫৩ সংখ্যক পদের প্রথম কলিটা দেখুন—

পথ গতি পেখল মো রাধা।
তথনুক-ভাব পরাণ পৈ পীড়লি
রহল কুমুদনিধি সাধা॥ ২।

এই কলির প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির নির্দিষ্ট ১২ মাত্রা পূরণ করার জন্য 'রাধা' ও উহার মিল (rhyme) 'সাধা' শব্দ দুইটী প্রত্যেকটী দুই-দুই চারি মাত্রাত্মক রূপে না পড়িলে চলে না।

উল্লিখিত পদগুলির প্রায় সবগুলি হইতেই বাঙ্গালী পদকর্তার পক্ষে স্বাভাবিক এইরূপ ছন্দের ত্রুটি প্রদর্শিত করা যাইতে পারে।

৪। বাঙ্গালী পদকর্তা রায়শেখর শ্রীমহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি সখীর অনুগা অভিমানে তাঁহার পদাবলীতে সেই অনুগার সমুচিত যে সকল সেবাকার্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদে কুত্রাপি সেইরূপ সমুচিত সেবাকার্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষা ও ছন্দোগত প্রমাণের ন্যায় উল্লিখিত পদগুলির আধ্যাত্মিক ভাবগত চতুর্থ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাও সেগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজভুক্ত বাঙ্গালী পদকর্তার রচনা বলিয়াই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যে আমরা উল্লিখিত পদাবলী হইতে সখীসুলভ সেবাকার্যের কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিলাম ঃ

শেখর পন্থ পর মিলল যাই।
আনল নাগর ভেটল রাই॥
(২৩৬ সং পদ)

যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥
(৩৩৫ সং পদ)

শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব।
দুহু সঙ্গ ভঙ্গ করায়॥
(২৬৫ সং পদ)

৫। উল্লিখিত পদগুলির মধ্যে দুইটী পদে স্পষ্টতঃ 'রায়' উপাধির উল্লেখ আছে। 'কবিশেখর' বা উহার সংক্ষেপ শুধু 'শেখর' বিদ্যাপতির উপনাম বলিয়া তাঁহার ভণিতায় ব্যবহৃত হইতে পারিলেও মৈথিল বিদ্যাপতি ঠাকুরের যে 'রায়' উপাধি ছিল, ইহা কেহই বলেন না। সুতরাং 'কবিশেখর' বা 'শেখর' শব্দের সহিত 'রায়' শব্দ সংযুক্ত পাইলে, ঐ ভণিতা যে রায়শেখর ব্যতীত 'কবিশেখর' বিদ্যাপতির কোনমতেই হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় যে, বিদ্যাপতির নূতন পদ সংগ্রহের জন্যে অত্যধিক আগ্রহান্বিত হওয়ায় নগেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত 'নিন্দে নিন্দায়লি বালা' ইত্যাদি ৫৯৭ সংখ্যক পদের

কহ কবি শেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায়॥

ভণিতার এক কোণায় ক্ষুদ্র কিন্তু মিলের জন্য অপরিহার্য 'রায়ের' শব্দটা যে লুকাইয়া ছিল, নগেন্দ্রবাবু ব্যস্ততাহেতু তাহা লক্ষ্য করেন নাই। যাহা হউক, অতঃপর বিদ্যাপতি বৎসল কেহ যদি 'রায়' শব্দটাকেও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটা অজ্ঞাতপূর্ব উপাধি বলিয়া প্রচারিত না করেন, তাহা হইলেই বাঙ্গালী রায়শেখরের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকায় 'গগনে অব ঘন' ইত্যাদি যে ২৯০ সংখ্যক পদটীর রচনাদর্শনে উহা বিদ্যাপতির খাঁটি পদ বলিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন, উহার ভণিতার কলির প্রামাণিক ও শুদ্ধ পাঠ এইরূপ, যথা—

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥

'পদকল্পতরু'র চারিখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি 'পদরসসার' পুথি ও সাহিত্য পরিষদের ১৯৪ সংখ্যক 'দণ্ডাত্মিকা' পুথিতে এইরূপই পাঠ আছে; কিন্তু নগেন্দ্রবাবু 'রায়শেখর' স্থলে 'কবিশেখর' পাঠ গ্রহণ করিয়া পদটী তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু নিজে ইচ্ছা করিয়াই এরূপ মারাত্মক পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন— প্রকৃত বিষয় না জানিয়া তাঁহার উপর এমন একটা গুরুতর দোষারোপ করা আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি না। তবে আমরা একথা না বলিয়া পারি না যে, নগেন্দ্রবাবু যদি কোন পুথিতে রায়শেখর স্থলে কবিশেখর পাঠ পাইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও এ পাঠ 'পদকল্পতরু'র সকলগুলি মুদ্রিত সংস্করণের বিরুদ্ধে এবং স্পষ্টতঃ ছন্দোদুষ্ট বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করিয়া 'পদকল্পতরু'র 'রায়শেখর' পাঠই শুদ্ধ মনে করিয়া পদটী পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। এই পদের ধ্রুবপদ ব্যতীত প্রত্যেক কলিতে নিম্নরূপ মাত্রাবিভাগ দেখা যায়, যথা—

৩+৪ ৩+৪

৩+৪+৪

"কবিশেখর" পাঠ গ্রহণ করিলে ৭ মাত্রা স্থলে ৬ মাত্রা হওয়ায় ছন্দো-পতন যে অনিবার্য হইয়া পড়ে, যাঁহাদিগের মাত্রা-ছন্দের সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারাও উহা বুঝিতে পারিবেন। এ অবস্থায় নগেন্দ্রবাবুর মত একজন প্রবীণ সম্পাদক যে কেন সে বিষয়টা লক্ষ্য করেন নাই, আমরা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে— 'গরজ বড় বালাই'। নগেন্দ্রবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এরূপ উৎকৃষ্ট রচনা বিদ্যাপতির ছাড়া রায়শেখর প্রভৃতির মত কোন বাঙ্গালী কবির হইতে পারে না। যদি সেই বিশ্বাসের বলেই তিনি রায়শেখরকে কবিশেখর বানাইয়া থাকেন তাহা হইলে সেরূপ করা যে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট অবিবেচনার কার্য ও সম্পাদকীয় কর্তব্যের গুরুতর ত্রুটি হইয়াছে, ইহা আমরা দুঃখের সহিত না বলিয়া পারিতেছি না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, বেণীপুরী মহাশয় তাঁহার হিন্দী সংস্করণে প্রায় সর্বত্র নগেন্দ্রবাবুর পাঠ ও টীকা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও এখানে 'কবিশেখর' পাঠে স্পষ্টতঃ ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে, ইহা লক্ষ্য করিয়াই নগেন্দ্রবাবুর 'কবিশেখর' স্থলে 'কবীশেখর' পাঠ কল্পনা করিয়া ছন্দ বজায় রাখিয়াছে। ছন্দের জন্য কবির উপর এরূপ জবরদস্তি আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই। বেণীপুরী মহাশয়কে বিশেষ দোষ দেওয়া

যায় না। তিনি 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করেন নাই। বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদের জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নগেন্দ্রবাবুর বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের উপরই অগত্যা নির্ভর করিতে হইয়াছে। তবে সেখানে তিনি বুঝিয়াছেন যে, নগেন্দ্রবাবুর পাঠে ছন্দোভঙ্গ ঘটে এবং এক আধটা ইকার বা উকার পরিবর্তন করিলেই সহজে ছন্দ রক্ষা করা যাইতে পারে, সেখানে তিনি 'কবি'কে 'কবী' করিয়া আর কিছু না হউক অধিকতর ছন্দোজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, 'পদকল্পতরু' প্রভৃতির প্রামাণিক পাঠ পাইলে তাঁহাকে 'কবীশেখর'এর মত একটা অদ্ভুত ও অজ্ঞাতপূর্ব শব্দের সৃষ্টি করিতে হইত না।

৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে যেমন 'জটিলা' 'জরতী' 'ললিতা' প্রভৃতির কোন উল্লেখ পাওয় যায় না, তাঁহার সমসাময়িক বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীতেও সেইরূপ বটে। 'কবি শেখর' ও 'শেখর' ভণিতা-যুক্ত উল্লিখিত পদগুলির মধ্যে কোন কোন পদে 'জরতি', শ্রীরাধার শাশুড়ী 'জটিলা' ও 'ললিতা' সখীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাও বুঝা যায় যে, ঐ পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত নহে।

(২৭ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "ভল ভেল দম্পতি" ইত্যাদি ২৭ সংখ্যক পদটীর মৈথিল ও বঙ্গীয় পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। নগেন্দ্রবাবু মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা প্রায় গ্রীয়ারসন্ সাহেবের পাঠের অনুরূপ। কাব্যবিশারদ মহাশয় শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি বিষয়ক ৮ সংখ্যক পদে যে বঙ্গীয় পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ব্রজনন্দনবাবু তাঁহার 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে প্রায় উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পাঠবিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে উক্ত উভয় পাঠই টীকাসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ, যথা—

(দূতীর উক্তি)

ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচনে লেল॥ ২।

দুহুক নয়ন তর দূতক কাজ।
ভূষণ ভএ পরিণত ভেল লাজ॥ ৪।
আবে অনুখন দেঅ আঁচর হাথ।
বাজ সখী সঞে নত কএ মাথ॥ ৬।
হমে অবধারল সুন সুন কাহ্ন।
নাগর করথু অপন অবধান॥ ৮।
ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।
মারতি রহত পোখ অবসেখ॥ ১০।
রসময় বিদ্যাপতি কবি গাব।
রাজা শিবসিংহ বুঝ রস ভাব॥

নগেন্দ্রবাবুর টীকা, যথা—

পর্বতীয় বরাড়ী বা চৌপই ছন্দ।

১। ভল—ভাল। দম্পতি—নায়ক ও নায়িকা।

১—২। (নায়িকার) শৈশব গেল, দম্পতির (পক্ষে) ভাল হইল; চরণের চপলতা লোচন হইল।

৪। ভ এ—হইয়া।

৩—৪। দুইজনের নয়ন দূতের কাজ করে (দূত মুখে কথা না পাঠাইয়া চক্ষে চক্ষে কথা হয়)। লজ্জা ভূষণ হইয়া (স্বরূপে) পরিণত হইল।

৬। বাজ—বাচ, কথা কয়। কএ—করিয়া।

৫—৬। এখন সর্বদা অঞ্চলে হাত দেয়, মস্তক নত করিয়া সখীর সঙ্গে কথা কয়।

৭। অবধারল—স্থির করিয়াছি, যথার্থ কহিতেছি।

৮। নাগর—রসিক, চতুর।

৭—৮। কানাই শুন শুন আমি যথার্থ কহিতেছি (যে) চতুর পুরুষ আপনার (প্রতি) মনোযোগ করুক (আত্মরক্ষায় যত্নবান হউক)।

৯। ভঁউহ—ভ্রূ। ধনুষ — ধনুক।

১০। পোখ— পংখ, বাণের পক্ষ যুক্তস্থান, শেষাংশ। অবসেখ— অবশেষ।

৯—১০। ভ্রূ ধনুক, কজ্জল রেখা গুণ, পুংখ (মাত্র) অবশিষ্ট (রাখিয়া) কটাক্ষ (বাণ) মারিবে। (কেবল পুংখ বাহিরে থাকিবে, অবশিষ্ট নয়ন বাণ মর্মে প্রবেশ করিবে)।

১১ — ১২। রসময় বিদ্যাপতি কবি গায়, রাজা শিবসিংহ রস ভাব বুঝেন।

বঙ্গদেশের পাঠে কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গীয় পাঠ, যথা—

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥ ২।
করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥ ৪।
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥ ৬।
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরি-কর অবলম্ব॥ ৮।
হাম অবধারলু শুন বর কান।
শুনই অব তুহু করহ বিধান॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ১২।

কাব্যবিশারদের টীকা, যথা—

৩। চক্ষুদ্বয় দূতের কার্য্য করিতে লাগিল।

৪। গোপত — গুপ্ত। হাস্যরসের সঙ্কোচ ও লজ্জার উদ্রেক হইল।

৬। সগর — সকল। মস্তক অবনত করিয়া সকল কথা বলে।

৭। কটিক গৌরব — কটিদেশের গুরুত্ব বা স্থূলত্ব।

৮। চলিবার সময়ে সহচরীর কর অবলম্বন করে বা হাত ধরে।

৯। অবধারলু — অবধারণ বা নির্ণয় করিলাম।

১০। এখন তুমি শুনিয়া বিধান কর। যাহা কর্তব্য বোধ হয় কর।

আমরা এখন পাঠ ও অর্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই বক্তব্য যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উক্তি বয়ঃসন্ধির পদ। যৌবনের আগমনে নায়িকার শৈশব দূর হইল— ইহাই দূতীর প্রথম ও প্রধান বক্তব্য। সুতরাং 'ভল ভেল দম্পতি' পাঠ হইতে 'আওল যৌবন' পাঠই সমীচীন মনে হয়। নগেন্দ্রবাবু কথাটাকে উল্টাইয়া লইয়া এবং 'নায়িকার'

ও 'পক্ষে' শব্দ দুইটি উহ্য করিয়া অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'দম্পতি' শব্দের দ্বারা 'দম্পতির' (পক্ষে) অর্থ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। 'ভল ভেল' ইত্যাদি পাঠের একমাত্র ব্যাকরণসঙ্গত অর্থ— ভাল হইল; দম্পতির 'শৈশব' গেল। 'শৈশব' শব্দের সহিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে 'দম্পতি' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ করা যাইতে পারে; তদ্ভিন্ন এরূপ বিভক্তি লোপ করার ও দম্পতির (পক্ষে) অর্থ করার উপায় নাই। গ্রীয়ারসন সাহেব ইহা বুঝিতে পারিয়াই পংক্তিটীর অনুবাদ করিয়াছেন— Happy are the consorts, now that the childhood had fled. পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার পূর্ববর্তী সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক গ্রীয়ারসনের উক্ত সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া কেন এরূপ অশুদ্ধ ও অসঙ্গত অন্বয় করিতে গেলেন। ইহার উত্তর ইহাই মনে হয় যে, 'চরণ চপলতা লোচন লেল' ইত্যাদি পরবর্তী যৌবনের অনুভাবগুলি স্পষ্টতঃ নায়িকার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বটে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু এখানে দম্পতির শৈশব দূর হইল— এরূপ উক্তি অসংলগ্ন মনে করিয়াই অগত্যা পূর্বোক্তরূপ অর্থ করার প্রয়াস করিয়াছেন। 'আওল যৌবন' পাঠে এরূপ কোন অসঙ্গতি ঘটে না; সুতরাং আমরা মৈথিল তালপত্রের পুথির পাঠ হইতে এখানে বঙ্গীয় পুথির পাঠই প্রামাণিক ও সমীচীন মনে করি।

নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'ভূষণ ভএ' স্থলে গ্রীয়ারসনের পাঠ 'ভূষণ ভয়'। তিনি 'ভয়' শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "fear" অর্থাৎ তাঁহার মতে ভূষণ ভয় ইত্যাদি পংক্তির অর্থ— The fear and bashfulness of the damsel and a new ornament to her beauty. বলা বাহুল্য যে, ক্লিষ্ট দূরান্বয় ব্যতীত এরূপ অর্থ করা যায় না। সুতরাং আমরা নগেন্দ্রবাবুর 'ভএ' (অর্থাৎ 'হইয়া') পাঠ ও অর্থ তদপেক্ষা সঙ্গত মনে করি। লজ্জা বালিকার পক্ষে স্বাভাবিক নহে, যুবতীর পক্ষেই উহা স্বাভাবিক ও সুন্দর। নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ সঙ্গত হইলেও বঙ্গীয় পুথির 'হাস গোপত ভেল উপজল লাজ' এই ধ্বনিপূর্ণ বাক্যটী উৎকৃষ্টতর পাঠ বলিয়া মনে করি।

নগেন্দ্রবাবু "এখন সর্বদা অঞ্চলে হাত দেয়" বাক্যটীর তাৎপর্য খুলিয়া বলেন নাই। বলা উচিত ছিল। কেননা, গ্রীয়ারসন্ সাহেব 'বাজ' স্থলে 'কাজ' পাঠ ধরিয়া ঐ শ্লোকের অনুবাদে একটা হাস্যজনক মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন— He continually layeth

his hand upon the cloth which hideth her bosom and at the action and in the presence of her brides-maids, she hangeth her head in shame.

বলা বাহুল্য যে, নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্বে আপ্তদূতীর উক্তিতে এরূপ অর্থ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও রসবিরুদ্ধ বটে। গ্রীয়ারসন্ ইহাকে সম্ভোগের পদ মনে করিয়াই ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, 'জ্ঞাত যৌবনা' 'মুগ্ধা' * নায়িকারা স্বভাবতঃ অন্যের নিকটে যৌবন গোপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বুঝি, বুকের আঁচলখানা একটু সরিয়া গেল—এই ভয়ে তাঁহারা সর্বদা বুকের আঁচলে হাত দিয়া পরীক্ষা করেন। সূক্ষ্মদর্শী কবি স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে এখানে নায়িকার লজ্জাসূচক সেই অঞ্চল স্পর্শ ও সখীর সঙ্গে অবনত মস্তকে সম্ভাষণের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় পুথির 'কটিকে গৌরব' ইত্যাদি শ্লোক মৈথিল পুথিতে নাই। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত পাঠে 'কটিকে' শব্দের 'কে' বিভক্তি মৈথিল ভাষায় অপ্রচলিত বটে। উহাতে 'কটি' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'কটিক' রূপই দৃষ্ট হয়। 'কটিক' পাঠ ধরিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। এজন্য ব্রজনন্দনবাবু 'কটিকে' ইত্যাদি পংক্তির 'কটি-গৌরব অব পাওল নিতম্ব' পাঠ কল্পনা করিয়া ছন্দ রক্ষা করিয়াছেন। আমরাও ঐরূপ পাঠই সমীচীন মনে করি। কাব্যবিশারদ মহাশয় বা ব্রজনন্দনবাবু কেহই আলোচ্য শ্লোকটার অপূর্ব অলঙ্কার ও উহার দ্বারা ব্যঞ্জিত বস্তুধ্বনির চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করেন নাই; সুতরাং আমরা একটু বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনা করিব। স্বভাবতঃ বালিকাদিগের কটি কিঞ্চিৎ স্থূল ও নিতম্ব কৃশ হইয়া থাকে; কিন্তু যৌবনের উদয়ে উহার ব্যতিক্রম ঘটে। তখন বক্ষ ও নিতম্ব স্ফীত হওয়ায় মধ্যবর্তী কটিদেশ কৃশ বলিয়াই প্রতীত হয়। ইহাকেই কবি কটি ও নিতম্বের পরস্পর অবস্থা বিনিময় বলিয়া স্থানান্তরে বর্ণিত করিয়াছেন, যথা—

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব॥

('পদকল্পতরু' ১০৬ সং পদ—বিদ্যাপতি)

* জ্ঞাতযৌবনা ও মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ ও উদাহরণ মৎসম্পাদিত 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এখানে একের কৃশতা অপরে প্রাপ্ত হইল—স্পষ্টাক্ষরে উক্ত না হইলেও তাৎপর্যার্থ দ্বারা প্রতীত হয় যে, নিতম্বের কৃশতা কটি প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ কটি ও নিতম্বের মধ্যে অবস্থার বিনিময় ঘটিল। কবি এখানে অতিশয়োক্তি-মূলক প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে বুঝাইতে চাহেন যে, নায়িকা নিতম্বের গুরুভারে নিজে চলিতে অক্ষম হওয়ায়ই যেন সখীকে অবলম্বন করিয়া চলেন। সখীকে অবলম্বন করার কারণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ নায়িকার একান্ত সখী-প্রীতি হইলেও কবি এখানে নিতম্বের গুরুভারই সেই কারণ বলিয়া বর্ণিত করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ঘটিয়াছে; উহাই 'কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজন বটে। এই সকল অলঙ্কারের দ্বারা প্রধান বিষয় নায়িকার নিতম্বের গুরুত্বরূপ বস্তু ধ্বনি ব্যঞ্জিত হইয়া আলোচ্য শ্লোকটীকে আলঙ্কারিক-দিগের মতে শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন। অল্প কথায় এতগুলি বিচিত্র অলঙ্কার ও ধ্বনি সৃষ্টি করা বিদ্যাপতির ন্যায় মহাকবির পক্ষেই সম্ভবপর বটে। সুতরাং যদিও মৈথিল পুথিতে এই অপূর্ব শ্লোকটি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে কিন্তু বঙ্গীয় পুথির প্রমাণে আমরা এই শ্লোকটীকে বিদ্যাপতির খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারি না।

মৈথিল পুথির 'হমে অবধারল' ইত্যাদি শ্লোকের 'নাগর করলু আপন অবধান'—এই দ্বিতীয় চরণ দূতীর রসিকতাসূচক উক্তি বটে। নায়কের আত্মরক্ষার প্রয়োজন বুঝাইবার জন্যই দূতী 'ভঁউহ ধনুষ' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার একমাত্র সঙ্গত অর্থ—"(নায়িকার) ভ্রূধনু কজ্জলের রেখা (উহার) গুণ (নায়িকা) মারাতে অর্থাৎ কটাক্ষ বাণ প্রহার করাতে (কেবল) বাণের গোড়ার পক্ষযুক্ত অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অর্থাৎ বাণ রসজ্ঞ দর্শকের চিত্তে সম্পূর্ণ বিঁধিয়া গিয়াছে। নয়নের পক্ষরূপ বাণের গোড়ার পাখগুলি কেবল অবশিষ্ট আছে। নগেন্দ্রবাবু এখানে বিস্তৃত টীকা লিখিতে যাইয়া সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 'পোখ' বা 'পুংখ' শব্দের প্রতিপাদ্য কি তাহা বলেন নাই। ইহা ছাড়া তিনি 'মারতি' শব্দের 'মারিবে' ও 'রহত' শব্দের 'রহিবে' রূপ অসিদ্ধ ও অসঙ্গত অর্থ করিয়া সমস্ত বাক্যের অর্থেই গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। 'পুংখ' শব্দের প্রতিপাদ্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি বর্তমানের অর্থ ভবিষ্যৎ বুঝিতেন না। নায়িকার ধনুর তুল্য ভ্রূ, ধনুর গুণের তুল্য নয়নের কাজলরেখা, তীক্ষ্ণ শরের তুল্য কটাক্ষও অন্তঃ-

প্রবিষ্ট ; সুতরাং অদৃশ্য কটাক্ষ-শরের গোড়ার পুংখ অর্থাৎ পক্ষ-যুক্ত অংশ-তুল্য নয়নের পক্ষরাজি বর্ণিত করাই দূতীর উদ্দেশ্য বটে। তিনি সুন্দর 'রূপক' ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে উহা বর্ণিত করিয়া, নায়ককে সাবধান করার ছলে পরম উপভোগ্য রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এখানে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গ্রীয়ারসন সাহেব 'হমে অবধারল' ইত্যাদি শ্লোক এবং 'ভেঁাহ ধনুষি' ইত্যাদি শ্লোক উভয় শ্লোকের অনুবাদেই হাস্যজনক মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, যথা —

4. Hear, hear, O Krishna, I have determined how I shall fight my fight. Do thou, my love, be careful of thyself.

5. My eye brows shall be my bow, strung with a line of collyrium ; and the well-feathered darts which will strike thee, will be (the glances of) my eyes.

গ্রীয়ারসনের সংস্করণে 'মারতি রহত' ইত্যাদি পংক্তির স্থলে পাঠ আছে 'মার নয়ন পর পুংখ অবশেখ।' নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ হইতে এই পাঠ অধিক সঙ্গত ; কিন্তু গ্রীয়ারসন মহাশয় পদটা কাহার কোন্ সময়ের উক্তি বুঝিতে না পারিয়া অর্থের ঐরূপ গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে বঙ্গীয় ও মৈথিল পুথির নিজস্ব উভয় পাঠই সুন্দর ও বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট রচনার লক্ষণাক্রান্ত ; বোধহয় ভুলে বঙ্গীয় পুথি হইতে একটী এবং মৈথিল পুথি হইতে আর একটী কলি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু ভণিতাহীন অনেক পদ ও ভূপতি, চম্পতি, কবিশেখর, রায়শেখর প্রভৃতি বিভিন্ন কবির বহু পদ বিদ্যাপতির রচিত বিবেচনায় নিজের সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; এরূপ অবস্থায় তিনি 'খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ' ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বয়ঃসন্ধির পদটী যে কি জন্য উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা বুঝা যায় না। ইহা 'পদকল্পতরু'র ৮০ সংখ্যক বা ১ম শাখার ৪র্থ পল্লবের ১৪ সংখ্যক পদ বটে। ইহা কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণেও আছে। সুতরাং অনাবশ্যক বোধে এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল না। কৌতূহলী পাঠক উক্ত গ্রন্থ দেখিবেন।

(২৮ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবু বয়ঃসন্ধি ২—২৭ সংখ্যক পদের পরেই 'মাধবের অনুরাগ' শীর্ষক ২৮—৫৫ সংখ্যক পদগুলি সন্নিবেশিত করিয়া তারপরে 'এ সখি কি পেখল এক অপরূপ' ইত্যাদি পদ 'রাধার অনুরাগ' শীর্ষকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা 'বিদ্যাপতি-বিচারে'র প্রথমেই বলিয়াছি যে, নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পূর্ববর্তী সম্পাদকগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে ভুল করিয়াছেন। রসশাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক পর্যায় অনুসারে নায়িকার পূর্বরাগই প্রথমে বর্ণনীয় বটে। উহার পরে নায়কের পূর্বরাগ বর্ণিত করিয়া কবিরা নায়ক কিংবা নায়িকার পক্ষ হইতে আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত দূতীর প্রেরণ এবং সেই দূতীর দ্বারা নায়িকার বয়ঃসন্ধি সুলভ রূপ-বর্ণনার অবতারণা করিয়া থাকেন। সেই স্বাভাবিক ও সুন্দর রসপর্যায়ের ব্যতিক্রম করায়, এই সমস্ত পদগুলির পৌর্বাপর্য বিনষ্ট হইয়া পাঠকের নিতান্ত বৈরস্য-জনক হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমরা কাব্যের আরম্ভ শীর্ষক সন্দর্ভে আলোচনা করায়, এখানে উহার পুনরুক্তি না করিয়া, নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত 'মাধবের অনুরাগ' শীর্ষক পদাবলীর পাঠ ও অর্থ সম্বন্ধে ক্রমে আলোচনা করিব।

প্রথমেই বক্তব্য এই যে নগেন্দ্রবাবু নায়িকার পূর্বরাগের আগে নায়কের পূর্বরাগ বিষয়ক পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়া রসশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তাঁহার পক্ষে এই পদগুলিকে 'মাধবের পূর্বরাগ' না বলিয়া 'মাধবের অনুরাগ' নাম দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। পূর্বরাগ ও অনুরাগ—এই বিষয় দুইটির মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। 'পূর্বরাগ' শব্দের দ্বারা নায়ক-নায়িকার সম্মিলনের পূর্ববর্তী প্রেম ও 'অনুরাগ' শব্দদ্বারা তাঁহাদিগের সম্মিলনের পরবর্তী প্রেমই সূচিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, প্রেমের এই দুইটি অবস্থায় অনুভব ও আস্বাদনের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ নায়কনায়িকার পরস্পর রাগোদ্ভবের পরে আপ্তদূতীর সাহায্যে তাহাদিগের সম্মিলন ও সম্ভোগ সংঘটিত হইলে প্রেমের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা যখন উভয়ের হৃদয় একীকৃত হইয়া দুইটী বিভিন্ন দেহে একটী অভিন্ন প্রাণ হইয়া পড়ে এবং প্রণয়িযুগল সর্বদা অনুভূত হইলেও একজন আর একজনের নিকট প্রতি পলে নূতন বলিয়া প্রতীত হয়েন,— সেই 'নিতুই নবীন' প্রেমোচ্ছ্বাসই রসশাস্ত্রে 'অনুরাগ' নামে কথিত হইয়াছে। পূর্বরাগ যে প্রেম কল্পলতিকার সুশোভন ও সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পমঞ্জরী,— 'অনুরাগ' উহারই

সুমধুর অমৃতময় পরিপুষ্ট ফল ; সুতরাং কার্য ও কারণরূপে উভয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ হইলেও, উভয়ের অনুভব এবং আস্বাদনের মধ্যে যে প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে, ইহা রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

নগেন্দ্রবাবুর ২৮ সংখ্যক 'ফূজলি কবরি অবনত আনন' ইত্যাদি পদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে 'ফূজলি কবরি' ইত্যাদি চরণের 'কবরি' পাঠে ছন্দোপতন ঘটিয়াছে, সুতরাং 'কবরি' স্থলে 'কবরী' শুদ্ধ পাঠ হইবে।

(২৯ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ২৯ সংখ্যক পদের প্রথম কলিটী এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

(মাধবের উক্তি)

চিকুর নিকর তম সম
পুন্থ আনন পুনিম সসী।
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী ॥ ২ ॥

যে জন্যই হউক, নগেন্দ্রবাবু এই পদের ছন্দের মাত্রা নির্দেশ করেন নাই। কেবল উহা নহে, উদ্ধৃত কলিটী যেভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, উহা দ্বারা মনে হয় যে, তিনি প্রথম চরণদ্বয়ের মাত্রা বিভাগ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। পদটী বাঙ্গালার লঘুত্রিপদী ছন্দে রচিত বটে। ইহার প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে ৬+৬+৮=২০ মাত্রা প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ দ্বারা যে অর্দ্ধ কলি গঠিত হইয়াছে, উহাও ঠিক দ্বিতীয় অর্দ্ধকলির মতই হইবে, যথা—

চিকুর নিকর তম সম পুন্থ
আনন পুনম সসী।

বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালার লঘুত্রিপদী ছন্দটী অক্ষরবৃত্ত, উহা মাত্রাবৃত্ত নহে ; সুতরাং এই ছন্দে অক্ষরের লঘু-গুরু ধর্তব্য নহে। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিদ্যাপতি প্রায়শঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পদ রচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহার কতকগুলি পদে ঠিক বাঙ্গালার একাবলী লঘুত্রিপদী দীর্ঘত্রিপদী অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ পদ নেপালের পুথি ও মৈথিল তালপত্রের পুথিতেও পাওয়া গিয়াছে।

সুতরাং এগুলিকে বাঙ্গালী পুথি লেখকদিগের দ্বারা প্রবর্তিত বিদ্যাপতির ছন্দের বিকৃতি বলিয়া মনে করার কোনই কারণ নাই। ইহা দ্বারা এই প্রয়োজনীয় তত্ত্বটী জানা যাইতেছে যে, বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিলী ভাষার সহিত যেমন আধুনিক মৈথিলী হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিদ্যাপতির কোন কোন পদে অক্ষরের লঘুগুরু মাত্রার প্রতি সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদরের দ্বারাও প্রাচীন মৈথিলী কবিতার ছন্দের সহিত বাঙ্গালা ছন্দের সেইরূপ ঘনিষ্ঠতাই প্রমাণিত হইতেছে। আধুনিক মৈথিলী ভাষার উপর হিন্দী ভাষার অধিক প্রভাব হেতু — বাঙ্গালার সহিত ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে উহার অধিক পার্থক্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং রীতিমত ভাষাতত্ত্বের আলোচনা না করিয়া, যে সকল আধুনিক পণ্ডিত কেবল আধুনিক হিন্দী ও মৈথিল ভাষার পাণ্ডিত্যের জোরে বিদ্যাপতির পদে ভাষা ও ছন্দের যাথার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের চেষ্টা যে অনেক স্থলেই ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যাপতির প্রাচীন পদাবলীর প্রকৃত পাঠ ও অর্থের নির্ণয়ের জন্য কেবল আধুনিক মৈথিল ও হিন্দী ভাষার জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। উহার জন্য সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষারও বিশেষ জ্ঞান ও সর্বোপরি তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) সাহায্যে গভীরভাবে পুনঃ পুনঃ বিদ্যাপতির পদাবলীর অধ্যয়ন ও আলোচনা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী সম্পাদকদিগের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয় হইলেও নানা প্রতিকূল কারণবশতঃ তাঁহারা বর্ণিত সাধনগুলি সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এজন্যই বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রকৃত পাঠ ও অর্থের নির্ণয়ে প্রায় পদে পদেই নানা ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে। বিদ্যাপতির যে পদাবলীর প্রথম ও প্রধান সংরক্ষক বলিয়া বাঙ্গালীরা এক সময়ে অনন্যসাধারণ কীর্তি অর্জন করিয়াছেন, কালধর্মে সেই পদাবলী বিকৃত হইয়া পড়ায় এখনও উহার সংশোধন ও সংস্করণের অসাধারণ গৌরব হইতে আমাদিগের স্বদেশী ভ্রাতৃগণ বঞ্চিত হইবেন না এবং আমাদিগের ভরসাস্থল উচ্চ শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এখন হইতে এই কষ্টসাধ্য অথচ যশস্কর ও আনন্দজনক সাহিত্যিক কার্যে সর্বান্তঃকরণে ব্রতী হইবেন,— আমরা ইহাই একান্ত কামনা করি।

(৩০ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩০ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের উক্তি পদটি মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ পদের ৩য় কলিটী এইরূপ, যথা —

সাঁচ কহঞো মোঞে সাখি অনঙ্গ
চান্দক মণ্ডল যমুনা তরঙ্গ ॥ ৬।

নগেন্দ্রবাবু উহার অর্থ লিখিয়াছেন —

৫—৬। সত্য কহিতেছি আমি, অনঙ্গ সাক্ষী, চন্দ্র মণ্ডলে যমুনা তরঙ্গ (ত্রিবলী) (দেখিলাম)।

এইরূপ অর্থ কোনমতেই সংলগ্ন হইতে পারে না। যদি এখানে কৃষ্ণ-রোমাবলীযুক্ত ত্রিবলীকে যমুনা তরঙ্গ বলা যায়, তাহা হইলে 'চান্দক মণ্ডল' বা চন্দ্রমণ্ডল শব্দদ্বারা এখানে কি বুঝিতে হইবে। নগেন্দ্রবাবু নিরুপায় হইয়াই বোধহয় এখানে 'চন্দ্র মণ্ডল' শব্দের প্রতিপাদ্য কি, তাহা স্পষ্ট লিখেন নাই। ত্রিবলী নায়িকার উদরেই লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং ত্রিবলীকে যমুনা তরঙ্গ বলিয়া বর্ণিত করিলে অগত্যা নায়িকার কৃশ উদরকেই চন্দ্রমণ্ডল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি 'কবি-সময়-বিরুদ্ধ' বটে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'চান্দক মণ্ডল যমুনা তরঙ্গ' বাক্যের সঙ্গত অর্থ খুঁজিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, এখানে 'চন্দ্রমণ্ডল' শব্দদ্বারা শ্রীরাধার মুখমণ্ডল ও 'যমুনা তরঙ্গ' শব্দদ্বারা তাঁহার বিলাস বিভ্রম সূচক মন্দ মন্দ ভঙ্গীই সূচিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূতে'র বিরহী যক্ষের মুখে গাহিয়াছেন —

উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী বীচিষু ভ্রু-বিলাসং

অর্থাৎ

ঈষৎ তরঙ্গ ভঙ্গে ভুরু ভঙ্গী করি দরশন

কালিদাসের বর্ণনায় আমরা তরঙ্গিণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গে নায়িকার বিলাস-বিভ্রম সূচক ভ্রূভঙ্গী দেখিতে পাই; কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমন একটা বর্ণের পার্থক্য থাকিয়া যায়, যাহাতে সৌসাদৃশ্যের যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে।

বিদ্যাপতি 'যমুনা-তরঙ্গ' বলিয়া বিশেষণ দিয়া সেই বৈষম্যটা সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়াছেন।

আমাদিগের প্রদর্শিত এই অর্থই যে নির্দোষ ও সমীচীন, গোবিন্দদাসের নিম্নোদ্ধৃত পদাংশ দৃষ্টি করিলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গোবিন্দদাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জোতি' ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র ৮৬ সংখ্যক পদে গাহিয়াছেন —

যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙ্গু বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দি হিলোল॥

অর্থাৎ যেখানে যেখানে শ্রীরাধার ভঙ্গশীল চঞ্চল ভ্রূযুগলের বিলাস, সেখানে সেখানেই যমুনার তরঙ্গলীলা উচ্ছলিত হয়।

বিদ্যাপতির আলোচ্য পদের ৪র্থ ও ৫ম কলিটী এইরূপ, যথা—

কোমল কনককেআ মুতি পাত।
মসি লএ মদনে লিখল নিজ বাত॥ ৮।
পঢ়হি ন পারিয় আখর পাতি।
হেরইতে পুলকিত হো তনু কাতি॥ ১০।

নগেন্দ্রবাবু উহার অর্থ লিখিয়াছেন—

৭। কনককেআ—কনকীয়া, কনকনির্মিতা। মুতি—মূর্তি। পাত—পত্র। ৮। বাত—কথা। ৭—৮। কোমল স্বর্ণগঠিতা মূর্তিরূপ পত্রে মদন মসি লইয়া (রোমাবলী দ্বারা) আপনার কথা লিখিল। ৯। পাতি—পংক্তি। ১০। পুলকিত—রোমাঞ্চিত। কাতি—কান্তি। ৯—১০। অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারি না, দেখিয়া দেহকান্তি রোমাঞ্চিত হয়।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত এই অর্থও আমরা সঙ্গত মনে করি না। সংস্কৃত 'কনক' শব্দের পরে ঈয় প্রত্যয় থাকিলে কনকীয় (স্ত্রীলিঙ্গে—কনকীয়া) পদ সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কনকেআ হইবে কি প্রকারে। সংস্কৃত কনকীয়া অপভ্রংশে ও লিপিকরদিগের দোষে কনকেআ রূপে পরিণত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে শব্দের মধ্যে একটা অতিরিক্ত 'ক' আসিবে কোথা হইতে। এই অতিরিক্ত 'ক' অক্ষর যে লিপিকরদিগের প্রমাদ-জনিত নহে, আলোচ্য পংক্তির শুদ্ধ ছন্দ এবং নগেন্দ্রবাবুর ১৮৬ সংখ্যক 'আজ

দেখিলিসি কালি দেখিলিসি' ইত্যাদি পদের "সুন্দরি কনককেআ মুতি গৌরী" বাক্যই উহার অকাট্য প্রমাণ বটে। এই উভয় স্থলেই 'কনককেআ' শব্দের পরিবর্তে 'কনকীয়া' 'কনকেআ' পাঠ কল্পনা করিলে ছন্দোপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। অপভ্রংশ ভাষা দূরে থাকুক খাঁটি সংস্কৃত ভাষাতেও 'কনকীয়া' শব্দের প্রয়োগ বড় দেখা যায় না, তারপরে হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার এরূপ বিশেষণ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গসূচক আ বিভক্তির প্রয়োগও নিতান্ত বিরল বটে। সর্বোপরি 'কনকেআ' (কনকীয়া) পাঠে ছন্দোপতন অনিবার্য। এই সকল কারণে আমরা নগেন্দ্রবাবুর পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের মতে 'কনককেআ' একটা শব্দ নহে; 'কনক' ও 'কেআ' (কেয়া)— দুইটি শব্দ। সংস্কৃত 'কেতক' শব্দের অপভ্রংশে 'কেআ' বা 'কেয়া' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। 'কেয়া' শব্দে কেতকী বা কেয়া ফুলের গুল্ম অথবা উহার পুষ্প বুঝাইয়া থাকে। এখানে পরে 'পাত' বা পত্রের উল্লেখ থাকায় 'কনককেআ' শব্দের দ্বারা স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট একজাতীয় কেয়াগাছ বুঝিতে হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কেতকীবহুল উড়িষ্যা প্রদেশে এক প্রকার কেয়াগাছ হয়, যাহার পত্র ও পুষ্পগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু মঞ্জরীর কোমল গর্ভপত্র ও পুষ্পের বর্ণ পীত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই জাতীয় কেতকীই নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির উদ্ধৃত পংক্তিগুলির অর্থ—(নায়িকার যৌবনরাজ্যের অধিপতি) মদন (নায়িকার দেহ-রূপ) কোমল স্বর্ণকেতকীর মূর্তি পত্রে অর্থাৎ উহার নধর গর্ভপত্রের উপরে (রোমাবলী-রূপ) মসী লইয়া অর্থাৎ কালির দ্বারা নিজের কথা (অর্থাৎ মদনের অভীষ্ট জগৎজয়ের গূঢ় মন্ত্র) লিখিয়াছেন। (মদনের সেই জগৎজয় সাধক গূঢ় মন্ত্রের) অক্ষরপংক্তি পড়া যায় না; কিন্তু (সেই মন্ত্রশক্তির অচিন্তনীয় মাহাত্ম্যহেতু) উহা দেখিলেই তনুকান্তি রোমাঞ্চিত হয় অর্থাৎ মদনের মন্ত্রে যে কাজ করিয়াছে, উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ দর্শনকারীর দেহে সাত্বিকভাবজনিত রোমাঞ্চের উদ্‌গম হইয়া থাকে। 'কোমল কনক কেয়া' ইত্যাদি কলির প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ও 'পঢ়ই ন পারিয়' ইত্যাদি কলির প্রসিদ্ধ কারণের অভাবেও 'কার্য্যোৎপত্তিরূপ বিভাবনা' অলঙ্কার দ্বারা এখানে শ্রীরাধাই যে বিশ্ববিজয়ী কন্দর্পরাজের মোহনমন্ত্র স্বরূপ এই রূপকধ্বনি ও তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসূচক সাত্বিকভাবের উদ্‌গমরূপ বস্তুধ্বনি ব্যঞ্জিত হইতেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার টীকায় প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়

অনেক শব্দ ও বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন কিন্তু উদ্ধৃত কলিদ্বয়ে যে অপূর্ব অলঙ্কার ও ধ্বনির চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। বিদ্যাপতির ন্যায় মহাকবির কবিতা বুঝিবার জন্য কেবল শব্দার্থের জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পদে কবিকল্পনার কিরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা অন্ততঃ সংক্ষেপে বিবৃত না করিলে সম্পাদকের একটা প্রধান কর্তব্যই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কোন কোন পাঠক সন্দেহ করিতে পারেন যে, স্বর্ণকেতকীর কোমল পত্র অর্থাৎ গর্ভপত্রের সহিত নায়িকার দেহের তুলনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সংস্কৃতের কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার দেহের গৌরবর্ণের উপমা দিতে যাইয়া কেতকী-গর্ভপত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার দুই চারটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং।
শরদিজ ইব ঘর্ম্মঃ কেতকী—গর্ভ-পত্রম্॥
(ভবভূতির 'উত্তর-রাম-চরিত',)

অর্থাৎ—(বিরহ তাপ) এই সীতার পাণ্ডুবর্ণ কৃশ দেহকে সেইরূপ পীড়িত করিতেছে, যেমন শরৎকালীন রৌদ্র কেতকীর গর্ভপত্রকে পীড়িত করে।

বলা বাহুল্য যে, কান্তির সাদৃশ্য না থাকিলে এখানে ভবভূতি কোনমতেই সীতার দেহের উপমাস্থলে কেতকী গর্ভপত্রের দৃষ্টান্ত দিতে পারিতেন না।

(২) মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
(বাসুঘোষ—'পদকল্পতরু' ১১৩৭ সং পদ)

(৩) আজানুলম্বিত সুবাহু যুগল
বরণ কাঞ্চন জিনিয়া।
কিয়ে সে কেতকী কনক অম্বুজ
কিয়ে বা চম্পক মণিয়া॥
(বাসুঘোষ—'পদকল্পতরু' ২১৫৩ সংখ্যক পদ।)

(৪) কনক-কেতকি-চম্পা-তড়িত-বরণী।
ইন্দিবর-নিলমণি-জলদ-বসনী॥
(সালবেগ— 'পদকল্পতরু' ২৪৭২ সং পদ।)

(৩২ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩২ সংখ্যক—

সসন পরস খসু অম্বর রে
দেখল ধনি দেহ।
নব জলধর তরে সঞ্চর রে
জনি বীজুরি রেহ॥ ২।

ইত্যাদি পদ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের সংগ্রহে নাই; কিন্তু 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' গ্রন্থে ও বেণীপুরী মহাশয়ের সংস্করণে আছে। সর্বত্রই পাঠ একরূপ। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর টীকায় পদের ছন্দোনির্ণয়ে ও একটী পরবর্তী কলির অর্থনির্ণয়ে মারাত্মক ভুল আছে।

নগেন্দ্রবাবু এই পদের ছন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "মাধবীর বরাড়ী ছন্দ। ২০, ২১, ২২ অথবা ২৩ মাত্রা। অর্দ্ধপদের * অবসান ১১, ১২, অথবা ১৩ অক্ষরে।" মাধবীর বরাড়ী নামে কোন ছন্দ নাই। বরাড়ী একটা প্রসিদ্ধ রাগিণী। 'মালব'ও তাহাই বটে। 'মাধবীর বরাড়ী' বোধ হয় 'মালবীয় বরাড়ী' হইবে। সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবুর মাত্রাবিবরণ ও অক্ষর বিবরণ সম্পূর্ণ ভুল। ছন্দোবিৎ পাঠক লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই পদের প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে —'রে' এই পাদপূরক শব্দ সহ— ১৪+৯=২৩টী মাত্রা আছে; কোথাও কম বা বেশী নাই। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা ধর্তব্য নহে; সুতরাং নগেন্দ্রবাবু কেন যে অর্দ্ধপাদের অক্ষর সংখ্যা— তাও আবার ভুল সংখ্যা—দিয়াছেন, বুঝা যায় না। মাত্রাগণনায় ছন্দোজ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু অক্ষর গণিতে সকলেই পারেন। পাঠক এই পদের ৮টী অর্দ্ধপাদে যথাক্রমে ১২, ১২, ১১, ১১, ১১, ১২, ১০, ১০টী অক্ষর পাইবেন; সুতরাং অক্ষরবিবরণেও ভুল হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মাত্রাছন্দে অক্ষরসংখ্যা ধর্তব্য নহে। অক্ষরসংখ্যা অসমান হইলেও এই পদের প্রত্যেক পাদ বা অর্দ্ধ কলিতে মাত্রার হিসাবে ১৪+৯=২৩ টী মাত্রা ঠিক আছে।

* 'অর্দ্ধপদ' শব্দটা বোধহয় ছাপার ভুল; 'অর্দ্ধপাদ'ই নগেন্দ্রবাবুর বক্তব্য বটে।

এখন একটা মারাত্মক অর্থের ভুল দেখুন। এই পদের তৃতীয় কলি এইরূপ, যথা—

তা পুন অপরূব দেখল রে
কুচ জুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নাহি কিছু কারণ রে
সোঝা মুখ চন্দ ॥ ৬ ॥

নগেন্দ্রবাবু অর্থ লিখিয়াছেন,

> সোঝা—সোজা, সম্মুখে। ৫—৬। তাহার পর অপরূপ কুচকমল দেখিলাম, কিছু কারণে সম্মুখে তাহার মুখচন্দ্র বিকসিত হয় নাই (পবনে বস্ত্র স্রস্ত হওয়াতে সুন্দরী অঞ্চলের দ্বারা মুখ ঢাকিয়াছিল)।

মুখচন্দ্র বিকসিত না হওয়ার যে লজ্জারূপ কারণ তজ্জন্য সুন্দরীর বসনাঞ্চল দ্বারা বদন আচ্ছাদনরূপ লজ্জাসূচক কার্যটা নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়া লইয়াছেন, উহা কি এরূপ দুর্বোধ্য যে কবি স্বয়ং উহা বুঝিতে না পারিয়া নিজের অজ্ঞতাসূচক কিছু কারণে বাক্যের দ্বারা সেই কারণটা অব্যক্ত রাখিয়াছেন। কিংবা কবি সেই দুরূহ কারণটা অব্যক্ত রাখিয়া একটা হেঁয়ালীর সৃষ্টি করিয়া উহার দ্বারা পদের পাঠক ও শ্রোতার বুদ্ধির পরীক্ষা লওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যদি উহাই কারণ অনুল্লেখের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে এস্থলে নিতান্ত দুঃখের সহিতই বলিতে হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পরীক্ষায় নানা ভাষায় সুপণ্ডিত বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাহার উদ্ধৃত ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত মারাত্মক অর্থের অসঙ্গতি হইয়া পড়িয়াছে।

১। সংস্কৃত ও ভাষা-কাব্যের প্রত্যেক অভিজ্ঞ কবিই কুচযুগের সহিত পদ্মকলির উপমা দিয়া গিয়াছেন শুধু পদ্মের সহিত উপমা দেন নাই। কেননা পদ্মকলির সহিত তরুণীর কুচযুগের যে সৌসাদৃশ্য—প্রস্ফুটিত পদ্মে তাহা দেখা যায় না। তাই মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং
তদীয় শানীলমুখং স্তনদ্বয়ং।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ
সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ং ॥

('রঘুবংশ' ৩য় সর্গ)

মহাকবি বিদ্যাপতি এই কবিপ্রসিদ্ধি উত্তমরূপেই জানিতেন, তাই স্থানান্তরে 'কবরী ভয়ে চামার গিরি কন্দর' ইত্যাদি (নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১১৮ সংখ্যক) পদের কুচের সহিত কমলের উৎপ্রেক্ষা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"কুচ ভয় কমল কোরক জলে মুহি রহু" এ অবস্থায় এখানে বিদ্যাপতি "কুচ জুগ অরবিন্দ" বলিয়া অলঙ্কারের দোষ ঘটাইবেন কেন ?

২। নগেন্দ্রবাবুর প্রতিপাদিত অর্থে 'সোঝা' বা 'সম্মুখে' শব্দটার কোনই সার্থকতা থাকে না। 'সম্মুখে' বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়—কাহার সম্মুখে ? নগেন্দ্রবাবু উহা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার টীকায় 'সম্মুখে' শব্দটা নিতান্তই অসংলগ্ন-ভাবে বসাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথম দুই পংক্তিতে কুচযুগ রূপ অরবিন্দ বা পদ্ম বর্ণিত হওয়ায় পরবর্তী পংক্তির 'সোঝা' অর্থাৎ সম্মুখে শব্দের অন্বয় উহার সহিতই করা আবশ্যক। সেরূপ করিলে, নগেন্দ্রবাবুর মতে এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে যে, পদ্মের সম্মুখে কোন কারণে সুন্দরীর মুখ চন্দ্র বিকসিত হইল না। সেই কোন কারণটা যদি নগেন্দ্রবাবুর অনুমিত লজ্জাই প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে, অর্থ বুঝা যাইবে যে লজ্জায় কুচরূপ পদ্মের সম্মুখে সুন্দরীর মুখচন্দ্র বিকশিত হইল না। এরূপ অর্থের সঙ্গতি কোথায় ?

বস্তুতঃ কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত "তা পুন অপরুব" ইত্যাদি অতুলনীয় কলিতে মহাকবি বিদ্যাপতি যে অপূর্ব উদাহরণ দেখাইয়াছেন উহার ত্রিসীমায়ও অলঙ্কার দোষ বা অর্থের অসঙ্গতি আসিতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু কলিটার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া অসদর্থ করিতে যাইয়াই এ সকল অসঙ্গতি ঘটাইয়াছেন। এই অপূর্ব কলির অন্বয় ও অর্থ নিম্নে লিখিত হইল :—

'বিগসিত (বিকসিত) নহি (হয় নাই)' — বাক্যের কর্তৃপদ নগেন্দ্রবাবুর অনুমিত 'মুখচন্দ' নহে, উহার কর্তৃপদ 'কুচজুগ' (যুগ) 'অরবিন্দ'। সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ —তাহাতে আবার অপূর্ব কুচযুগরূপ অরবিন্দ (পদ্ম) দেখিলাম ; (ঐ পদ্ম) কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই ; অর্থাৎ সম্পূর্ণ কলির আকারেই রহিয়াছে। (ধ্বনিগম্য অর্থ— চিরকালই উহা কলির আকারে এবং সেজন্যই সাধারণ পদ্মকলি অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ 'অপূর্বতা')। (কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে,— কবি তাহা অব্যক্ত রাখিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন) কারণ সম্মুখে — (অর্থাৎ কুচপদ্মের সম্মুখে) নায়িকার

মুখচন্দ্র। চন্দ্রের কিরণে পদ্ম বিকসিত হয় না— মুদ্রিত হইয়া কলির আকারে থাকে, ইহা সর্বজনবিদিত বটে; সুতরাং এখানেও সেজন্যই মুখচন্দ্রের সম্মুখে কুচপদ্ম বিকসিত হইতে পারে না, অর্থাৎ কলির আকারেই আছে (ধ্বনিগম্য অর্থ চিরযৌবনা নায়িকার কুচপদ্ম চিরকাল কলির আকারেই থাকিবে এবং সেইজন্যই পার্থিব কমলসমূহ হইতে উহার চিরন্তন অপূর্বতা)। এখানে বলা আবশ্যক যে, 'মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি'র সম্পাদকের ব্যাখ্যা ঠিক হইয়াছে, কিন্তু বেণীপুরী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

সহৃদয় পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ অন্বয় ও অর্থ করিলে, উহাতে পূর্বকথিত অসঙ্গতির অশিক্ষা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া বাক্যের অর্থের কিরূপ অপূর্ব চমৎকারিত্ব ঘটিয়া থাকে। রসগ্রাহিতাপূর্ণ টীকায় কাব্যের চমৎকারিত্ব যেরূপ খুলিয়া থাকে, দুর্ব্যাখ্য দ্বারা উহার যারপর নাই লাঞ্ছনাও ঘটিতে পারে— ইহা তাহার একটা উদাহরণ বটে। আমরা নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাবুদ্ধির নিন্দা করিতেছি না। বিদ্যাপতি পদাবলীর সম্পাদন করিতে যাইয়া তিনি যে মোটের উপর পূর্ববর্তী সম্পাদকদিগের অপেক্ষা অধিক অধ্যবসায় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তথাপি বিদ্যাপতির কবিতার ভাষা ও ভাবের দুরূহতার জন্য সে সম্বন্ধে যে আরও অনেক গবেষণা ও আলোচনা একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই আমাদিগকে এইরূপ অপ্রিয় সত্যের প্রচার করিতে হইয়াছে। এভাবে আলোচনা করিলে 'বিদ্যাপতি-বিচার' কত বৎসরে শেষ হইবে বলা যায় না। অথচ আরও সংক্ষেপে করিতে গেলে নীরস বিচারাত্মক প্রবন্ধ আরও নীরস হইয়া পাঠকের অধিক অপ্রীতিকর হইতে পারে— সে আশঙ্কাও না আছে এমন নহে। অতএব সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ত্রিলাপ সঙ্কটে অনিচ্ছায় প্রবিষ্ট এই কৃপার্হ লেখকের প্রতি কৃপা করিয়াই হউক, কিংবা বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের গুরুতুল্য মহাকবি বিদ্যাপতির প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্যই হউক, আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ প্রবন্ধটি ধৈর্য ধরিয়া মনোযোগপূর্বক পাঠ করিবেন।

(৩৩ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩৩ সংখ্যক 'জাইতে মিললি কলাবতি রামা' ইত্যাদি ভণিতাহীন পদটি 'কীর্তনানন্দ' পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে এই পদের ২য় কলিটি এইরূপ, যথা—

ধইরজে বুঝল চাতুরি নারী।
অনুভব কএ গেল কুটিল নিহারী॥

নগেন্দ্রবাবু 'অনুভব কএ' ইত্যাদি পংক্তির টীকা করিয়াছেন— 'কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে প্রেমবিকার অনুভব করাইয়া গেল।'

এই ভণিতাহীন পদে মাত্র তিনটি কলি আছে। কলিগুলির ভাষা কিংবা ভাবে এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই, যাহাতে এই পদটাকে বিদ্যাপতির নিঃসন্দিগ্ধ রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইহা যে বিদ্যাপতির রচিত একটা অসম্পূর্ণ পদ না হইতে পারে, এমনও কিছু দেখা যায় না। সুতরাং আমরা পদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া শুধু উদ্ধৃত কলির পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির সম্বন্ধেই দুই চারিটি কথা বলিব।

বহরমপুর হইতে শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত 'কীর্তনানন্দ' গ্রন্থে 'অনুভব কএ গেল' ইত্যাদি পংক্তির পাঠ আছে—

অনূভৈ কৈ গেয় কুটিল নিহারি।

নগেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত 'কীর্তনানন্দ' পুথিখানিই গোস্বামী মহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থেরও একমাত্র আদর্শ বটে। এ অবস্থায় একই পুথি হইতে দুইজনে দুই রকম পাঠ কিরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহা চিন্তনীয় বটে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বাভাবিক সংশোধন প্রবণতাহেতু এখানেও 'কীর্তনানন্দ' পুথির মূল পাঠ উক্তরূপে পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, উহার প্রকৃত পাঠ ও অর্থ কি হইবে বিচার করা যাউক। 'অনুভব' শব্দের 'ব' অক্ষর অন্ত্যস্থ 'ব' বলিয়া উহার মৈথিল উচ্চারণ অনেকটা 'ও' অক্ষরের ন্যায়। সুতরাং 'অনুভব' শব্দটাকে পুথির লেখকগণ 'অনুভও' 'অনুভৌ' কিংবা ভুলে 'অনুভৈ' লিখা বিচিত্র নহে। 'কৈ' ও 'কএ' শব্দ দুইটির মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য নাই। পুথির 'গেয়' শব্দটা হিন্দী ও মৈথিল 'গেও' শব্দেরই অশুদ্ধ রূপান্তর বটে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অনুভব কএ গেল' বাক্যের অর্থ 'অনুভব করিয়া গেল' ব্যতীত 'অনুভব করাইয়া গেল' হইতে পারে কি? সংস্কৃত 'কৃত্বা' শব্দের অপভ্রংশে 'করিঅ' 'করি' 'কই' 'কৈ' ইত্যাদি রূপগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। উহা হইতে 'করিয়া' অর্থ ব্যতীত 'করাইয়া' অর্থ পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? সংস্কৃত যেমন ক্বচিৎ কোথাও 'ণিজন্ত' অর্থ অন্তর্ভুক্ত বা উহ্য থাকে, হিন্দী, মৈথিল বা বাংলা ভাষায় সেরূপ দেখা যায় না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু কষ্ট করিয়া 'আমাকে প্রেমবিকার' এই

কর্মকারকের পদ দুইটি উহ্য করিয়া ও 'কএ' শব্দের অসিদ্ধ ও অপ্রচলিত 'করাইয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়া যে অর্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, উহা সঙ্গত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের প্রকৃত পাঠ হইবে —

ধৈরজে বুঝল চাতুরী নারি।
অনুভও কৈ গেও কুটিল নিহারী॥

অর্থাৎ— (নায়িকার) ধৈর্য অর্থাৎ চপলতার অভাব হইতে বুঝিলাম যে সে চতুরা নায়িকা বটে। (অচতুরা নায়িকারা নানারূপ চপলতার কার্য দ্বারা চরিত্রের লঘুতা প্রকটিত করিয়া গুণগ্রাহী নায়কদিগের নিকট বস্তুতঃ প্রেমের অযোগ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। চপলতা প্রকাশ করা হইবে না, অথচ মনের অনুরাগ প্রকাশ করিতে হইবে,—নচেৎ মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া গেলে নায়িকার অরসজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। এরূপ স্থলে চতুরা নায়িকারা তাহাদের স্বাভাবিক কুটিল কটাক্ষ ও অন্যান্য হাবভাব দ্বারাই অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাই কবি বলিতেছেন:) নায়িকার কুটিল অর্থাৎ বক্রদৃষ্টি তাহার অনুভব অর্থাৎ মানসিক অনুরাগ কহিয়া গেল অর্থাৎ প্রকাশ করিল।

সংস্কৃত 'কথয়িত্বা' শব্দের অপভ্রংশে 'কহইঅ' 'কহিঅ' 'কহি' 'কই' 'কৈ' ইত্যাদি পদ উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং 'কৈ' শব্দের 'কহিয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়া এরূপ অনায়াসেই করা যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু 'ধইরজে বুঝল' ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অর্থপূর্ণ পংক্তিটীর কোন অর্থ লিখেন নাই। বলা বাহুল্য যে, ঐ পংক্তির উক্ত একমাত্র অর্থের সহিত নগেন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যাত 'আমাকে প্রেম-বিকার অনুভব করাইয়া গেল'— অর্থের সহিত কোন যোগসূত্র পাওয়া যায় না; এবং একই কলির দুইটি পংক্তির অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ না হইলেও অসংলগ্ন বিধায় তাৎপর্যশূন্য হইয়া পড়ে। আমরা যেরূপ অর্থ করিতেছি, তাহাতে শব্দার্থের বা তাৎপর্যের কোন অসংলগ্ন বা অসঙ্গতি দেখা যায় না।

বিদ্যাপতির পদে কোন কোন স্থলে 'গেল' শব্দের অর্থে 'গেও' প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণের 'অলখিতে হামে হেরি' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের (১৪) সংখ্যক পদে আছে—

অয়ি লুকায়লি আধ উদাস;
কুচকুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ॥

এখানেও নগেন্দ্রবাবু 'গেও' শব্দের পরিবর্তে 'গেল' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক মৈথিল ভাষায় 'গেল' অর্থে 'গেও' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়াই নগেন্দ্রবাবু পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন কি? বিদ্যাপতির প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন মৈথিল ভাষায় যে 'গেল' অর্থে 'গেও' শব্দের ব্যবহার ছিল না, এরূপ মনে করার কি কারণ আছে? সংস্কতের 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'গত' শব্দের অপভ্রংশে 'গঅ' 'গও' ব্রজভাষায় 'গেও' (আধুনিক হিন্দীর 'গয়া') ইত্যাদি রূপগুলি উদ্ভুত হইয়াছে; 'গেল' অপেক্ষা 'গেও' রূপটাই আমাদিগের নিকট অধিক মৌলিক ও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আধুনিক মৈথিল প্রয়োগের আদর্শ দেখিয়া প্রাচীন প্রয়োগগুলিকে অশুদ্ধ বিবেচনায় এভাবে পরিবর্তন করিলে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সুগম পথকেও যে অগম্য বা দুর্গম করিয়া তোলা হইবে, প্রাচীন সাহিত্যের সম্পাদকদিগের এই কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

নগেন্দ্রবাবু অসঙ্গতরূপে পুথির প্রাচীন পাঠ বদ্‌লাইতে যাইয়া ভাষা তত্ত্বালোচকদিগের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু অপ্রণিধানে পুথিলেখকদিগের অনেক সুস্পষ্ট ভুলও সংশোধন ব্যতীত গ্রহণ করিয়া সংশোধকের কর্তব্যে ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার 'ধইরজে বুঝল চাতুরি নারি' পংক্তির 'বুঝল' শব্দটা লিপিকরদিগের ভুল। প্রকৃত পাঠ হইবে 'বূঝল'। 'বুঝল' পাঠ লইয়া কোন ছন্দোবিৎ শত চেষ্টায়ও ঐ পংক্তির চৌপাই ছন্দের— ৪+৪+৪+৪=১৬ মাত্রা মিলাইতে পারিবেন না। বিদ্যাপতির বঙ্গীয় সম্পাদকগণের সংস্করণে এরূপ ছন্দের মাত্রার ভুল অনেক আছে; কিন্তু নগেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে খুব সতর্ক এবং অধিকন্তু তিনি মৈথিল পণ্ডিতদিগেরও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সংশোধনে এরূপ ভুল থাকা অসঙ্গত বলিয়াই আমরা এইকথা বলিলাম। কেননা, তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া তাঁহার অপ্রণিধান জনিত ভুলগুলিও পরবর্তী সম্পাদকদিগের দ্বারা অবিচারে গৃহীত হইবার আশঙ্কা আছে।

(৩৪ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবু মৈথিল 'রাগতরঙ্গিণী' পুথি হইতে এই পদের যে একটি রূপান্তর উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার প্রথম কলিটি এইরূপ, যথা —

আনন লোলএ বচন-বোলএ হসি।
অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিম সসী ।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে এই পদের যে বঙ্গীয় রূপান্তরটী উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে এই কলিটির নিম্নরূপ পাঠ আছে, যথা —

নন্থঞা বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশী॥

অন্যান্য কলিতেও এরূপ পাঠান্তর আরও পাওয়া যায়; কিন্তু এ সকল পাঠান্তর বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া আমরা এখানে সেগুলির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। পুথির 'বচন কহসি হসি' বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, এ কলিটি শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। কিন্তু পরবর্তী কলিগুলিতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ আপ্তদূতীর নিকট পথে গমনশীলা শ্রীরাধার রূপ বর্ণন করিতেছেন; সুতরাং 'কহসি' (বলিতেছ) পাঠ স্পষ্টতঃ অসঙ্গত প্রতীত হয়। বোধহয় 'কহই' (বলিতেছে) প্রকৃত পাঠ ছিল; কিন্তু 'হসি' শব্দের সহিত অনুপ্রাস মিলাইবার উদ্দেশ্যে অজ্ঞলিপিকরগণ কর্তৃক অসংলগ্ন কিন্তু অনুপ্রাসযুক্ত শ্রুতিমধুর 'কহসি হসি' পাঠ কল্পিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রথম পংক্তির টীকায় লিখিয়াছেন—"নন্থঞা বদনী—ননী মুখী। 'নন্থঞা' এই শব্দের নন্থয়া প্রভৃতি বিবিধ আকার দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ নবনীত বা ননী। হসি—হাসি, হাসিয়া। কহসি—কহিতেছ, এখানে কহিতেছে।" বস্তুতঃ এখানে কহসি শব্দের কহিতেছ অর্থ অসঙ্গত বলিয়াই কাব্যবিশারদ মহাশয় উহার কহিতেছে অর্থ কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু 'কহসি' শব্দের ঐরূপ অর্থ মৈথিল ব্যাকরণ কিংবা প্রয়োগদ্বারা সমর্থিত হয় না। সুতরাং অগত্যা শ্রুতিমধুর অনুপ্রাসের আশা পরিত্যাগ করিয়াই 'কহসি' স্থলে 'কহই' পাঠ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কাব্যবিশারদ মহাশয় 'নন্থঞা' শব্দের যে 'নবনীত' বা 'ননী' অর্থ লিখিয়াছেন, উহাও যথার্থ নহে। সংস্কৃত 'নবনীত' শব্দের অপভ্রংশে 'ননীয়আ' 'ননী'রূপ হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে 'নন্থঞা' বা 'নন্থআ' হইতে পারে কি? হইতে পারিলেও 'ননীমুখী' বিশেষণটা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না কি? সুমধুরভাষিনী নায়িকার বাক্য মধু ও অমৃতের সহিত উপমিত হইয়া থাকে; কিন্তু তা বলিয়া মধু বা অমৃতের সহিত মুখের উপমা দেওয়া যায় না। সুতরাং ননীর সহিত মুখের উপমা কিরূপে সঙ্গত হইবে? বস্তুতঃ মৈথিল বা হিন্দী ভাষায় 'নবনীত' অর্থে

'ননী' 'ননীআ' বা 'নন্নুআ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। সার গ্রীয়ারসন মহোদয়ের মৈথিল শব্দকোষে 'নন্নুঅ' ও 'নন্নুআঁ' শব্দের অর্থ "a boy, a child, young" লিখিত হইয়াছে। আমরা স্থানান্তরে বিদ্যাপতির পদেও 'নন্নুয়া' শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি, যথা—

নন্নুয়া নয়নি নলিনি জনি অনুপম
বঙ্ক নিহারই থোরা।
(নগেন্দ্রবাবুর ৫৩ সং পদ)

নগেন্দ্রবাবু এখানে 'নন্নুয়া' শব্দের অর্থ "সুন্দর" লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার অর্থ হইতেই কোমল বা সুন্দর অর্থ হইয়াছে।

এই 'নন্নুঞা' শব্দের পরিবর্তে কোন স্থলে 'নন্নুমি' রূপান্তরও দৃষ্ট হয়, যথা—

অল্পে কাজরে নয়ন আঁজল
নন্নুমি দেখিয়া আঁখি।
(নগেন্দ্রবাবুর ৫৪ সং পদ)

নগেন্দ্রবাবু এখানে 'নন্নুমি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"কোমল, সুন্দর।"

উদ্ধৃত প্রয়োগগুলির দ্বারা 'নন্নুঞা বদনী' শব্দের কোমল বদনা অল্পই সমর্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা কোন প্রকারেই কাব্যবিশারদ মহাশয়ের টীকার সমর্থন করিতে পারিতেছি না। এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নগেন্দ্রবাবুর ধৃত 'রাগতরঙ্গিনী' পুথির "আনন লোলএ বচন বোলহ হসি" পাঠটিও আমাদিগের বিবেচনায় শুদ্ধ ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। নগেন্দ্রবাবু ঐ পাঠ গ্রহণ করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন "লোলএ—আন্দোলিত হয়। ১-২। মুখ নাড়িয়া হাসিয়া কথা কয়।" বস্তুতঃ 'নন্নুঞা বদনী ধনি' স্থলে 'আনন লোলএ' পাঠ গ্রহণ করিলে উহার ঠিক অর্থ হইবে—মুখ নড়ে, হাসিয়া—কথা কয়। অর্থাৎ হাসিয়া কথা বলিতে মুখ নড়ে। এরূপ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না, 'অমিয় বরিস জনি সরদ পুনিম সসি'—এই উপমার সহিত এখানে মুখের চাঞ্চল্যও খাপ খায় না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় পুথির পাঠ গ্রহণ করিয়া ভাল করেন নাই,—ইহা সত্যের অনুরোধে আমরা না বলিয়া

পারি না। মৈথিল পুথির পাঠ যে সর্বত্র শুদ্ধ নহে, ইহা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত বটে।

(৩৫ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩৫ সংখ্যক পদটি 'কীর্তনানন্দ' পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা ভণিতাহীন এই সম্পূর্ণ পদটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া নগেন্দ্রবাবুর টীকাসহ এখানে উদ্ধৃত করিব ঃ

(মাধবের উক্তি)

অগরুব পেখল সোই।
কনক লতাঞে উয়ল কিয়ে হিমকর
ঐসন লাগল মোই ॥ ২।
ভুটল কেশ চঞ্চল অতি লোচন
নাসা আঁতর ভীন।
রাগ অধর দশন মনি ভেটল
দুহু কুচ দুহু কঠিন ॥ ৪।
ত্রিবলিক মাঝে তনু নিবি বান্ধল
নাভি সরোবর গোই।
ভারি ভখন সম্বল রহু দুবরি
পরদুখে দুখি নই কোই ॥ ৬ ॥

১। সোই— তাহাকে। ৩। আঁতর— অন্তর, দূর। ভান— ভিন্ন। ৪। লোহিত অধর দশন মনির সহিত মিলিত। ৫। গোই— গোপন করিয়া। ৬। তন্বীর গুরুভার যখন সম্বল রহিল, পরদুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না।

নগেন্দ্রবাবুর এই টীকাদ্বারা পদের তাৎপর্য বোধগম্য হইল কি? নগেন্দ্রবাবু অনেক অনাবশ্যক স্থলেও বিস্তৃত টীকা সংযোজিত করিয়াছেন; কিন্তু দুরূহ বলিয়াই বোধহয় এখানে তিনি পদের তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন এবং কোন কোন শব্দের অর্থও ভুল বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলির তাৎপর্য খুব দুরূহ,—উহা না বুঝিলে অন্তিম চরণ-দ্বয়ের তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ২য় ও ৩য় কলির অর্থ এইরূপ, যথা—(নায়িকার) কেশ কুটিল

(এক অর্থে কুঞ্চিত, অন্য অর্থে কুটিল স্বভাব); তাঁহার লোচন অতিশয় চঞ্চল (এক অর্থে অস্থির গতি, অন্য অর্থে চঞ্চল-স্বভাব) তাঁহার নাসিকা অন্তরে (এক অর্থে মধ্যে ভীন অর্থাৎ ভিন্ন কিনা ছিদ্র যুক্ত; অন্য অর্থে হৃদয়ে ভিন্ন ভাবধারী), সেই প্রকার রাগী * (এক অর্থে রক্তিমাযুক্ত, অন্য অর্থে—অনুরাগযুক্ত) অধর দশনরূপ মণিসমূহের সহিত সম্মিলিত হইল অর্থাৎ দশন-রাজির সহিত অধরের স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় অধর দশনরাজির সম্মিলন সুখে মত্ত হইয়া রহিল। (নায়িকার) দুইটী কুচ—দুইটীই কঠিন (ধ্বনি-গম্য অর্থ—কঠিনচিত্ত লোকে পরের দুঃখ বুঝে না; সুতরাং নায়িকার কঠিন কুচদ্বয় তাঁহার দুঃখে কেন সাহায্য করিবে?)। তৃতীয় কলির সম্মিলিত তাৎপর্য এই যে, নায়িকার কেশ, লোচন, নাসিকা, অধর, দশন ও কুচযুগ বর্ণিত কুটিলতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি স্বভাবদোষ (রূপবর্ণনার হিসাবে কিন্তু অসাধারন গুণ) বশতঃ সুকুমারী অথচ বিশাল-নিতম্বা নায়িকার গমনের কোন প্রকার সাহায্য করিল না। (নায়িকার বাকি অঙ্গগুলির মধ্যে) মধ্যদেশ অর্থাৎ কটি (স্বভাবতঃ ক্ষীণ এবং 'ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি' এই নীতিবাক্য অনুসারে)। (রসিক দর্শকের পরমানন্দজনক) নাভি সরোবরকে গোপন করিয়া, ত্রিবলীকে ও নীবি অর্থাৎ কটির বস্ত্রগ্রন্থিকে বাঁধিয়া রাখিল; ('ত্রিবলি' ও 'নীবি' শব্দদ্বয়ের শ্লিষ্ট অর্থ ধরিয়া ধ্বনিগম্য অন্য অর্থ এই যে, নায়িকার কটি নিজে সঙ্কীর্ণ বলিয়া অন্যের উদারতা সহ্য করিতে পারে না; তাই সে দাতৃশ্রেষ্ঠ বলিরাজকে ত্রিবলিচ্ছলে তিন স্থানে পুঁজি ‡ বাঁধিয়াছে। অর্থাৎ কটি দাতৃশ্রেষ্ঠ বলিকে আয়ত্ত করিয়া 'পরের ধনে পোদ্দারী' করিতে চাহে। ফলিতার্থে সঙ্কীর্ণ কটির দ্বারা নায়িকার সাহায্যের কোন প্রত্যাশা নাই; সে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বর্ণিতরূপ স্বকার্যে ব্যস্ত; এমনকি, সে দর্শকগণকে নাভি-সরোবরের শোভা দর্শনদ্বারা একটু আনন্দলাভ করিতে দিতেও অনিচ্ছুক, তাই ঢাকিয়া রাখিয়াছে)। দুবরি অর্থাৎ দুর্বলা কি না সুকুমারী নায়িকার ভারী (একঅর্থে গুরুভারবিশিষ্ট, অন্য অর্থে ভার-বহনশীল অর্থাৎ সহিষ্ণু) জঘন শুধু সম্বল রহিল অর্থাৎ সে নায়িকার দুঃসময়ে তাহাকে সাহায্য দানে পরাংমুখ হইল না। (ধ্বনিগম্য অর্থ—ধৈর্যশীল সহিষ্ণু মহান্ ব্যক্তিই পরের ক্লেশের

* 'রাগ' পাঠ স্পষ্টতঃ ছন্দোদুষ্ট, প্রকৃত পাঠ 'রাগী' হইবে।

‡ 'নীবি' শব্দে বণিকদিগের মূলধন বা পুঁজিও বুঝাইয়া থাকে।

অংশ স্বীকার করিয়া থাকেন) তদ্ব্যতীত কেহই পরের দুঃখে দুঃখিত হয় না। নায়িকার জঘন নিজের মহত্ত্ব গুণ হেতু নিজে চলিতে ক্লেশ অনুভব করা সত্ত্বেও নায়িকার গমনে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিল। অর্থাৎ নায়িকা তাঁহার সুবিশাল জঘনের সাহায্যে মন্থর গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। ('জঘন' শব্দে সাধারণতঃ নিতম্বের সম্মুখ ভাগই বুঝা যায়; কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে নিতম্ব-অর্থেও উহার প্রয়োগ বিরল নহে। এখানে নিতম্ব ও উহার সম্মুখ ভাগ উভয়ই বুঝিতে হইবে)।

এই পদের ভণিতা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ক্ষুদ্র পদটীতে কবি যেরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, উহা সর্বদা বিদ্যাপতির ন্যায় মহাকবির পক্ষেই সম্ভবপর বটে; সুতরাং ভণিতা না থাকিলেও আমরা ইহা বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই অনুমান করি। শব্দগুলির শ্লিষ্ট অর্থ এবং সম্পূর্ণ বাক্যগুলির তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়াই নগেন্দ্রবাবু কেবল কয়েকটী শব্দের যথাশ্রুত তাহাতেও আবার ভুল অর্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

(৩৬ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর ৩৬ সংখ্যক "সজনি অপরূপ পেখল রাম" ইত্যাদি পদ অতি প্রসিদ্ধ। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থেও এই পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু স্পষ্টতই ইহা 'পদকল্পতরু' হইতে গ্রহণ করিয়াও অযথোচিতরূপে স্থানে স্থানে পদের পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু সর্বত্র ছন্দ ও অর্থ বজায় রাখিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার সংস্করণ হইতে ছন্দোদোষের দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—

(ক) "সজনি অপরূপ পেখল রামা।" 'পদকল্পতরু'তে 'সজনি' সংবোধন নাই। 'সজনি' পাঠে ছন্দোপতন অনিবার্য। শুদ্ধ চতুর্মাত্রাত্মক 'সজনী' হইবে। তদ্রূপ 'অপরূপ' পাঠেও ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে; 'অপূর্ব' শব্দের অপভ্রংশ ও 'অপূরব' বা 'অপরুপ' শুদ্ধ পাঠ হইবে।

(খ) "গিরিবর গরুঅ পয়োধর পরশিত গীমে গজমোতিম হারা।" 'গীমে' পাঠে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য। মৈথিল উচ্চারণের নিয়মানুসারে 'মে' অক্ষর লঘু পড়িলেও ছন্দ রক্ষা পায় না; সুতরাং ব্রজনন্দনবাবুর হিন্দী সংস্করণের 'গীম' পাঠও সমর্থনযোগ্য নহে। এখানে 'গীমে' স্থানে শুদ্ধ পাঠ হইবে

'গিম'। সার গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের শব্দকোষে শুধু 'গৃম' শব্দই গ্রীবা অর্থে দৃষ্ট হয়। 'গৃম' শব্দেও 'গৃ' লঘু অক্ষর বটে; সুতরাং মৌলিক 'গ্রীবা' শব্দের অনুরোধে অপভ্রংশ 'গিম' শব্দের 'গি' অক্ষর দীর্ঘ করিয়া মৈথিল উচ্চারণের ব্যত্যয় দ্বারা ছন্দোভঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ছন্দোভঙ্গের কথা যাউক, এই পদের—"পয়সি পয়াগে জাগ শত জাগউ, সেই পাত্র বহুভাগী" পংক্তিদ্বয়ের অর্থ করিতে যাইয়া কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অনুসরণে নগেন্দ্রবাবু যে একটা বড় ভুল করিয়াছেন, আমরা সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। কাব্যবিশারদ মহাশয় ঐ পংক্তিদ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন "পয়সি— জলে। এখানে জলসমীপে অর্থাৎ নদীতীরে। জাগ—যাগ, যজ্ঞ। জাগই—এখানে জাগরণ করিয়া নহে; জাগাইয়া, উদ্বোধিত করিয়া ক্রিয়াটী এই স্থলে ণিজন্তার্থ বোধক। ঞি করিলে মৈথিল ব্যাকরণানুসারে জগাই হওয়া উচিত ছিল।" কিন্তু মৈথিল ক্রিয়াদিতে অনেক স্থলে স্বার্থে ঞি যুক্ত হয় ও অনেক স্থলে ণিজন্তার্থক হইয়াও ঞি বিযুক্ত থাকে। নগেন্দ্রবাবু স্পষ্টতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়াই লিখিয়াছেন— 'যে প্রয়াগতীর্থে (সেই জলে) শত যজ্ঞ উদ্‌যাপন করে, সেই বহু ভাগ্যবান পুরুষ (এই রমণীকে) পায়।' ইত্যাদি।

এইরূপ অর্থ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, বর্ণিত রূপ অন্তর্ভুক্ত বা উহা ণিজন্তার্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে ক্বচিৎ দুই একটা দৃষ্ট হইলেও হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যে এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। তদ্ব্যতীত 'জাগই' শব্দের জাগায় অর্থ অসঙ্গত। কষ্ট কল্পনার সাহায্যে স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা হইতে 'উদ্‌যাপন করে' এই অর্থ আসিতে পারে না। 'জাগায়' শব্দের 'উদ্বোধিত করে' অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও, শত যজ্ঞকে উদ্বোধিত করে এইরূপ বাক্য ও অর্থ রীতিবিরুদ্ধ বটে। নগেন্দ্রবাবু ইহা বুঝিয়াই 'উদ্‌যাপন করে' অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু 'জাগায়' শব্দের ঐ অর্থ যে আরও অধিক অসিদ্ধ, উহা বিস্মৃত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির কোন সম্পাদকই এখানে সঙ্গত অর্থ লাগাইতে পারেন নাই; কিন্তু আমাদের বিবেচনা হয় যে, হিন্দী ও মৈথিল বানান অনুসারে এখানে 'যাগ' ও 'যাগই' স্থলে 'জাগ' ও 'জাগই' লিখিত হওয়ায়ই এই সোজা কিন্তু আপাতদুরূহ পাঠ ও অর্থ বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃতে 'যাগং যজতে' এবং ইংরাজীতে To dream a dream

ইত্যাদির ন্যায় প্রয়োগ বিরল নহে। এখানেও খুব সম্ভবতঃ 'শত যাগের যজন করে' অর্থে 'যাগশত যাগই' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'য' স্থলে 'জ' হিন্দী মৈথিলের লেখার কায়দা মাত্র।

রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্রে'র সংস্কৃত টিপ্পনীতে 'পয়সি পয়াগে' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য লিখিয়াছেন— 'পূর্বজন্মনি প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমক্ষেত্র কৃতশতযজ্ঞেন মহাভাগেন লভ্যা সা সুন্দরী নতু অন্যৈরিতি সংক্ষেপং নায়কেনোক্তম।' টিপ্পনীর "কৃতশতযজ্ঞেন" বিশেষণ দ্বারা প্রতীত হয় যে, রাধামোহন ঠাকুর 'জাগই' পদের দ্বারা 'উদ্বোধিত' বা 'উদযাপিত' অর্থ না বুঝিয়া যজ্ঞ করা অর্থই বুঝিয়াছেন, সেজন্যই কর্মপদে 'জাগ জাগই' শব্দের শত শব্দ থাকায় তাৎপর্য প্রকাশের জন্য শুধু "কৃত" শব্দের প্রয়োগই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন।

সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে "পয়সি পয়াগে" ইত্যাদি ভণিতার কলির পূর্বে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কলিটি দেখা যায়, যথা—

প্রথম বয়স ধনি মুনি-মন-মোহিনী
গজবর জিনি গতি মন্দা।
সিন্দুর তিলক ভালু তড়িত লতা তনু
উয়ল পুনমিক চন্দা॥

এই পদের প্রথম কলিতে "উয়ল হরিণহীন হিমধামা" বাক্যের দ্বারা নায়িকার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রের বর্ণনা করিয়া, কবি যে আবার সেই মুখের সহিত স্ফুট কলঙ্ক পূর্ণিমার চন্দ্রের উপমা দিয়া উভয় উক্তির অসামঞ্জস্য ঘটাইবেন, ইহা সম্ভবপর মনে হয় না, সুতরাং আমরা এই কলিটীকে এখানে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বিবেচনা করি।

(৩৭ সংখ্যক পদ)

নগেন্দ্রবাবুর "কামিনী করএ সনানে" ইত্যাদি ৩৭ সংখ্যক পদটী মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। সার গ্রীয়ারসন্ মহোদয় তাঁহার Maithil Chrestomathy গ্রন্থে এই পদের যে আর একটা মৈথিল রূপান্তর দিয়াছেন, উহার এবং 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্ত ঐ পদের বঙ্গীয় রূপান্তরের সহিত নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত পদের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন, "সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠ এই প্রথম প্রকাশিত হইল।··· এই সঙ্কলনে তালপত্রের পুথির পাঠ ধৃত হইয়াছে; কারণ উক্ত পুস্তক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য।"

বস্তুতঃ নগেন্দ্রবাবুর গৃহীত তালপত্রের পুথির পাঠই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য কি না, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে শুধু প্রাপ্ত পুথিগুলির প্রাচীনতার উপর একমাত্র নির্ভর না করিয়া সূক্ষ্ম ভাষাতত্ত্বের বিচার ও বিভিন্ন রূপান্তর-গুলির পাঠের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের বিচার দ্বারাই সে গুলির শুদ্ধতা বা প্রামাণিকতা স্থির করা আবশ্যক। সেইরূপ করিতে হইলে, শুধু এই একটি মাত্র পদের পাঠান্তরের বিচারেই একটা বড় প্রবন্ধ হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এখানে সেইরূপ আলোচনার সম্পূর্ণ স্থানাভাব। আমরা এখানে শুধু এই মাত্র বলা আবশ্যক মনে করি যে, নগেন্দ্রবাবুর সমাদৃত তালপত্রের পুথির পাঠ সর্বত্রই অধিক প্রাচীন বা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে যাহারা বিদ্যাপতির পদাবলীর একটী শুদ্ধ ও প্রামাণিক সংস্করণ সঙ্কলিত করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে পূর্বোক্ত বিভিন্ন রূপান্তরগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারাই প্রামাণিক পাঠ স্থির করিতে হইবে। নগেন্দ্রবাবুর ধৃত তালপত্রের পুথিতে এই পদের অন্ততঃ দুইটি কলির যে বিকৃত পাঠ আছে এবং নগেন্দ্রবাবু উহার যে অসদর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আমরা এখানে উহার দুইটি মাত্র উদাহরণ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব।

(১) নগেন্দ্রবাবুর ধৃত ৩য় কলিটী এইরূপ, যথা —

কুচ জুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা॥ ৬।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন —

৫। চকেবা—চক্রবাক্। ৬। নিঅ—নিজ। মিলত—মিলিত করিয়া। দেবা—দিবে, দিয়াছে। ৫—৬। চারু চক্রবাক কুচ যুগল নিজ কুলে আনিয়া কে মিলাইয়া দিয়াছে।

এইরূপ পাঠ ও অর্থ কোনমতেই সঙ্গত মনে হয় না। বিধাতার সনাতন বিধান অনুসারে চক্রবাক দম্পতি রাত্রিকালে পরস্পর বিযুক্ত থাকিয়া দিবার

নদীর একই কূলে আসিয়া পরস্পর সম্মিলিত হয়, ইহা চিরন্তন কবিপ্রসিদ্ধি বটে। সুতরাং দিবা নায়িকার কুচযুগল রূপ চক্রবাক দম্পতি একত্র সম্মিলিত হওয়ার কারণ সর্বজনপ্রসিদ্ধ বলিয়া মহাকবি বিদ্যাপতির পক্ষে নিজকূলে আনিয়া কে মিলাইয়া দিয়াছে— এভাবে মিলন-কর্তার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা মোটেই সঙ্গত নহে এবং উহা দ্বারা উক্তির সৌন্দর্যও কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় না। এতদ্ব্যতীত 'দেবা' শব্দের 'দিবে' অর্থ ছাড়া 'দিয়াছে' অর্থ কোন ব্যাকরণ দ্বারাই সিদ্ধ হয় না; 'দিবে' অর্থ স্বীকার করিলে উক্তিটীর কোন সঙ্গত অর্থই করা যাইতে পারে না। এজন্যই নগেন্দ্রবাবুকে হতাশ হইয়া একই বিশ্বাসে 'দিবে' ও 'দিয়াছে'—এই দুটী পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থ লিখিতে হইয়াছে। সার গ্রীয়ারসন্ 'নিজ কুল' ইত্যাদি চরণের স্থলে 'নিজ কর কমল আনি তুঅ দেবা' ধরিয়া পংক্তিদ্বয়ের অনুবাদ করিয়াছেন—"Thy bosom is like two fair Chakwas. Cover them. O cover them with thy lotus hands". এইরূপ পাঠ ও অর্থের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাহেব মহোদয় শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উক্তি কিংবা ইহাকে কিংবদন্তী অনুসারে সদ্যোস্নাতা কোন সাধারণ নায়িকা-বিষয়ক পদ বলিয়া স্বীকার করিলে, কবির উক্তিপদ না বুঝিয়া ইহাকে নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি মনে করায়, সম্পূর্ণ পদটার অর্থ বুঝিতে গোলযোগ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার এই পাঠ ও অর্থ বিদ্যাপতির কোন সম্পাদকই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিথিলায় এই পদের আর একটা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। উহাতে এই কলির নিম্নলিখিত পাঠ আছে —

কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহি আনি মিলাওল দেবা॥

এখানে 'জনি বিহি' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ— 'যেন দেবতা বিধি আনিয়া মিলাইয়াছেন।'

এই কলির স্থলে বঙ্গীয় 'পদকল্পতরু' ইত্যাদি পুথির পাঠ—

কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥

অর্থাৎ (নায়িকার) কুচযুগল সুন্দর চক্রবাক (দ্বয়); দেবতা অর্থাৎ বিধাতা (ঐ দুইটীকে) নিজের কূলে অর্থাৎ উভয়ের মনোনীত একই নদী তটে আনিয়া সম্মিলিত করিয়াছেন। (নায়িকার গলার শুভ্র মুক্তাহারই এখানে নদীরূপে ব্যঞ্জিত হইতেছে)।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, এখানে বঙ্গীয় পুথির পাঠই স্বাভাবিক ও সুন্দর; সুতরাং বর্তমানে আমরা ঐ পাঠ দেড় শত কি দুই শত বৎসরের প্রাচীন কোন পুথিতে না পাইলেও ঐ পাঠই যে খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রাপ্ত পাঠ তালপত্রের পুথির কিংবা গ্রীয়ারসন মহোদয়ের পাঠ হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেও, ঐ 'নিজ কূল' শব্দদ্বয় পরিত্যক্ত হওয়ায়, অলঙ্কারের সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক রাজকৃষ্ণবাবুর আবিষ্কৃত মৈথিল পাঠের দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে যে, মহাকবি বিদ্যাপতি 'মিলাইয়া দিয়াছে' অর্থে 'কোনে দেবা' বাক্যটীর প্রয়োগ করেন নাই। তিনি 'দেবতা' অর্থেই 'দেবা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং মিথিলায় প্রাপ্ত পাঠের দ্বারাই তালপত্রের পুথির উক্ত পাঠ ও নগেন্দ্রবাবুর কৃত ব্যাখ্যা খণ্ডিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, 'কোনে দেবা' শব্দদ্বয়ের অর্থ 'কোন দেবতা' বলায়, চক্রবাক যুগলের এই বাঞ্ছিত সম্মেলন অরসিক নির্দয় বৃদ্ধ ব্রহ্মার কার্য নহে, ইহা কোন সুরসিক পরম কারুণিক দেবতার কার্য ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ অর্থ করিতে হইলেও 'নিজ কুল মিলত আনি' অংশের পাঠ ঠিক রাখা যাইবে না। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে 'মিলত' স্থলে 'মিলায়ত' বা 'মিলায়ল' পাঠ কল্পনা করা একান্ত আবশ্যক; উহাতে ছন্দোপতন অনিবার্য।

(২) নগেন্দ্রবাবুর ধৃত তালপত্র পুথির ভণিতা এইরূপ, যথা—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুণমতি ধনি পুনমত জনি পাবে॥ ১২।

নগেন্দ্রবাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—

গাবে — গায়, গাহিয়া। ১২। গুণমতি — গুণবতী। পুনমত — পুণ্যবান। ১১ — ১২। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, গুণবতী ধনী পুণ্যবান যেন প্রাপ্ত হয়।

এই ভণিতার স্থলে গ্রীয়ারসন মহোদয়ের ধৃত পাঠ—

ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুখ কবহু ন হোয়ত নদানে॥

অনুবাদ— "Bidyapati saith a good husband will never be a fool."

নগেন্দ্রবাবু 'ভনই' ইত্যাদি পাঠের সমার্থক 'ভনই' ও 'গাবে' শব্দ দ্বয়ের পুনরুক্তি দোষ এড়াইবার জন্য যে 'গাবে' শব্দের গাহিয়া অর্থ লিখিয়াছেন, উহা ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। গ্রীয়ারসন সাহেবের ধৃত 'ভনহি' ও 'ভানে' শব্দে সেই দোষ আরও সুস্পষ্ট; সুতরাং এই দুইটা পাঠের কোনটাই প্রামাণিক বলা যাইতে পারে না। এতদপেক্ষা রাজকৃষ্ণবাবুর প্রাপ্ত

বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড় তপ গুণমতি পুনমত পাবে॥

পাঠ অধিকতর সঙ্গত সুতরাং প্রামাণিক মনে হয়। নায়িকার অপূর্ব রূপ-বর্ণনার পরে আপ্তদূতী কিংবা কবির উক্তিতে বড় তপস্যায় পুণ্যবান লোকে (এরূপ) গুণবতীকে প্রাপ্ত হয়—এইরূপ মন্তব্যই সময়োচিত ও সঙ্গত বটে। নগেন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যাত 'গুণবতী ধনী পুণ্যবান যেন প্রাপ্ত হয়' এইরূপ মন্তব্য এখানে মোটেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত নহে। নগেন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ ঠিক বলিয়া ধরিলেও এখানে 'গুণবতী ধনি' কর্মপদ ও 'পুনমত' (জন) কর্তৃপদ স্বীকার করিয়া অর্থ করিতে হইবে—"পুণ্যবান যেন গুণবতী ধনীকে প্রাপ্ত হয়"। বস্তুতঃ এখানে 'জনি' (যেন) শব্দ মোটেই সুপ্রযুক্ত নহে; 'জনি' স্থলে 'জন' পাঠ ধরিলেই সুন্দর অর্থ হয়। বঙ্গীয় 'পদকল্পতরু' পুথিতে পাঠ আছে—

কবি বিদ্যাপতি গাবয়ে।
গুণবন্তি নারি রসিক জন পাওয়ে॥

আমাদের অনুমান হয় যে, বিদ্যাপতির এই পদে সম্ভবতঃ 'গুণবতি ধনি পুনমত জন পাবে' মৌলিক পাঠ ছিল। লিপিকর অথবা পাঠসাধকদিগের প্রসাদে 'জন' 'জনি' পাঠে পরিণত হওয়ায়ই পাঠের অশুদ্ধি ঘটিয়াছে। যাহা হউক; নগেন্দ্রবাবু তালপত্রের পুথিতে যে 'ভনই বিদ্যাপতি গাবে' ইত্যাদি পাঠ পাইয়া উহাকেই প্রামাণিক ও শুদ্ধ বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া উহার আবার বর্ণিত রূপ অসদর্থ করিয়াছেন, তাহা কোনমতেই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বিদ্যাপতির গ্রন্থপঞ্জী *

বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী

১। পুরুষ পরীক্ষা। নীতিমূলক কাহিনী। হরপ্রসাদ রায় কর্তৃক সংস্কৃত থেকে অনূদিত। পৃ ১৭৩। শ্রীরামপুর, ১৮১৫।

২। A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos. W. Ward. 2 vols. Second edition; Serampore, 1818. [On page 579 'of translations from Sungskrita, and works written in the dialects of India', 'Bengali' is entered. 'The Krishnu-Keertun, by Govinda-Dasu and Vidya-putee'.]

৩। পুরুষ পরীক্ষা। পৃষ্ঠা ২৪২। লণ্ডন, ১৮২৬। জি হফটনের সংস্করণ।

৪। পুরুষ পরীক্ষা। পৃষ্ঠা ৩+১৮৬। কলিকাতা, ১৮৫০ ?

৫। "বঙ্গভাষার উৎপত্তি"। রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ, পঞ্চম পর্ব। ১৮৭০ শকাব্দ (১৮৫৮ খৃ), পৃ ১২—১৩ :

"যে সকল বাঙ্গালি পুস্তক আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে জীব গোস্বামীর 'করচা'ই সর্বপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহা এক্ষণে ৩২৫ বৎসর পুরাতন। তাহার রচনাপ্রণালী চৈতন্যচরিতামৃতের সদৃশ। কথিত আছে ত্রিপুরা রাজাবলী নামক পুস্তক ইহা অপেক্ষা অনেক প্রাক্তন; কিন্তু যে পুস্তক এসিয়াটিক নাম্নী সভাতে আনীত হইয়াছিল, তাহার রচনাদৃষ্টে তাহাকে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না; অতএব জীবগোস্বামীর করচাকেই সর্বপ্রাককালীন বাঙ্গালি পুস্তক বলিতে হইবেক। পরন্তু তাহাকে বাঙ্গালি ভাষার সর্বপ্রাচীন রচনা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; ঐ পদই বঙ্গভাষার সর্বপ্রাক্তন আদর্শ বলিতে হইবেক।"

পাদটীকা—

"সদাশয় পাঠকদিগের সুগোচরার্থে বিদ্যাপতিকৃত একটি পদ "প্রাচীন পদাবলী" নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের কালে বর্ত্তমান ছিলেন।

* বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলীর মূল ও অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ এবং তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার এই তালিকাটি শ্রীযুক্ত মহাদেবপ্রসাদ সাহা 'সাহিত্য পত্রিকা'র জন্য সংকলন করেছেন।—সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরিতে অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরস না গেল।
কত মধু যামিনি রভসে গোয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।"

৬। পুরুষ পরীক্ষা। পৃ ৩+১৮৫। কলিকাতা, ১৮৬৫ ?

৭। পুরুষ পরীক্ষা ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৮৬৬।

৮। কবি চরিত। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৮৬৯।

৯। বঙ্গভাষার ইতিবৃত্ত। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃ ১০০। কলিকাতা, বিক্রম সংবৎ ১৯২৮ [১৮৭১]।

১০। বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহ। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কলিকাতা, ১৮৭২।

১১। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃ ৩৭৩। কলিকাতা, বিক্রম সংবৎ, ১৯৩০ [১৮৭৩]।

১২। মহাজন পদাবলী। জগবন্ধু ভদ্র। কলিকাতা, ১৮৭৩।
৪৩—৪৮ নং পর্যন্ত বিদ্যাপতির বিক্ষিপ্ত পদ-নিচয়।

১৩। "The Early Vaishnava Poets of Bengal. I : Bidyapati." John Beames. Indian Antiquary, vol. II (1873), pp. 37ff.

১৪। প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ। বিভিন্ন মাসে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। অসম্পূর্ণ। ১ম-৩য় খণ্ড। চুঁচুড়া, ১৮৭৪-৭৬।

১৫। "বিদ্যাপতি ও জয়দেব"। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০। [বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিবিধ প্রবন্ধ, ৫৩-৫৭ পৃ দ্রষ্টব্য]

১৬। মহাজন পদাবলী সংগ্রহ। ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ (বিদ্যাপতি)। পৃ ১৯১+(১৩৫—১৯৪)। চুঁচুড়া, ১২৮০ বাং।

১৭। "বিদ্যাপতি"। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন, ১২৮২ বাং [১৮৭৫]।

১৮। "On the Age and Country of Bidyapati." John Beames. Indian Antiquary, vol. IV (1875) p. 299.
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধটির সারসংক্ষেপ এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯। বিদ্যাপতির পদাবলী। ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত মূলপাঠ। সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ৩৬+১৬৩। কলিকাতা, ১২৮৫ বাং [১৮৭৮]।

২০। বিদ্যাপতি পদাবলী। অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক টীকা ইত্যাদি সহ সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ২০০। চুঁচুড়া, ১৮৭৮।

২১। "An Introduction to the Maithili of North Bihar, Chresto mathy and Vocabulary." G. A. Grierson. JASB, vol. XLIX, XLI, pp. 34. Calcutta, 1880-82.
ব্যাকরণ এবং ইংরেজি অনুবাদসহ ৮২টি পদ।

২২। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। দুই খণ্ড। প্রথম খণ্ডে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির কবিতা। অক্ষয়কুমার সরকার সম্পাদিত। কলিকাতা, ১২৯১-৯২ বাং [১৮৮৪-৮৫]।

২৩। "Vidyapati and his Contemporaries." G. A. Grierson. Indian Antiquary, vol. XIV (1885) pp. 182 ff.
অন্যান্য প্রসঙ্গ ছাড়াও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকার ইংরেজি অনুবাদ এতে আছে।

২৪। পুরুষ পরীক্ষা। মৈথিলী অনুবাদ ও টীকাসহ মূলপাঠ। চন্দ্র ঝা। পৃ ২৬৫। দ্বারভাঙ্গা, ১৮১০ শক, ১২৯৬ বাং [১৮৮৮]।

২৫। The Modern Vernacular Literature of Hindustan. G. A. Grierson. Calcutta, 1889.
৯ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির আলোচনা।

২৬। দুর্গাভক্তিরঙ্গিনী। বিভিন্ন সংস্কৃত গদ্য পদ্য থেকে বিদ্যাপতি কর্তৃক সংগৃহীত। দ্বারভাঙ্গা, ১৮২২ শক, ১৩০৮ বাং [১৮৯০]।
এই গ্রন্থের ৬ নং শ্লোকে আছে —
বিশেষাং হিতকাম্যয়া নৃপবরোহনুজ্ঞায় বিদ্যাপতিং শ্রীদুর্গোস্তব ...

২৭। The Poets of Bengal. Kaliprasanna Kavyavisharada. pp 32+215. Calcutta, 1894, 1900, 3rd edition. 1910.
বিভিন্ন প্রাচীন সূত্রে প্রাপ্ত পদাবলীর বিস্তৃত সংগ্রহ; টীকা ও ভূমিকা সম্বলিত।

২৮। বিদ্যাপতি ... পদাবলী। পঞ্চানন তর্করত্ন। পৃ ১৮৭+২৯। কলিকাতা, ১৩০১ বাং [১৮৯৫]।
কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও টীকাভাষ্য সহ।

২৯। "A reduced Facsimile of the Grant of the Village of Bisapi by Sivasinha to Vidyapti." G. A. Grierson. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. August, 1895.

৩০। কবি বিদ্যাপতি [অন্যান্য বৈষ্ণব কবি সহ।] টীকাসহ আলোচনা। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য। পৃ ১২+৫+১৪৬। কলিকাতা, ১৮৯৫।

৩১। শব্দের তালিকা। [প্রসঙ্গ-নির্দেশ ও সমার্থক আধুনিক বাঙলাসহ বিদ্যাপতির কবিতায় ব্যবহৃত কঠিন শব্দসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা।] কলিকাতা, ১৮৯৬। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এবং ৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)।

৩২। শৈবসর্বস্ব। বিদ্যাপতি বিরচিত। ভাগ্যবান বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক অনুবাদসহ মূলপাঠ। পৃ ২+৬+১৬২। কলিকাতা, ১৩০৪ বাং [১৮৯৭]।

৩৩। বিদ্যাপতি-পদাবলী। কালীপ্রসন্ন বিশারদ। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ৩+২৪৭। কলিকাতা, ১৮৯৮।

৩৫। "On the Genuineness of the Grant of Siva Sinha to Vidyapati Thakura." G. A. Grierson. Journal of the Asiatic Society of Bengal, LXVII, Pt. I (1899) p. 96.

৩৫। "On Some Mediaeval Kings of Mithila." G. A. Grierson. Indian Antiquary, Vol. XXVIII (1899) p. 57

৩৬। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৩০৫ বাং।

৩৭। নব আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির পদাবলী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। পৃ ৮। কলিকাতা, ১৯০০।

এই কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি নেপালের কাঠমুণ্ডু থেকে আবিষ্কৃত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সম্পাদিত প্রাচীন বাঙলা কবিতার সংকলন প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থাবলীর [১৭ ভাগ। কলিকাতা, ১৯০০-১৯০৬] প্রথম অংশ।

৩৮। মহাজনী-পদাবলী [চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি]। অক্ষয়কুমার দে কর্তৃক জীবনী ও টীকাসহ সম্পাদিত। পৃ ৬+১৫২। কলিকাতা, ১৯০৩।

৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৬+১৬০; ১৯০৫।

৫ম সংস্করণ, পৃ ৬+১৬০; ১৯০৭।

৭ম সংস্করণ, পৃ ৬+১৬০; কলিকাতা, ১৯১১।

৩৯। পুরুষ পরীক্ষা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। কলিকাতা, ১৯০৪।

৪০। "Vidyapati Thakur" Nagendranath Gupta. JASB, vol. LXXIII, Part 1. Extra. pp 20 ff. 1904.

৪১। বৈষ্ণব-পদাবলী। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯০৫।

৪২। "Vidyapati Thakur." G. A. Grierson. JASB, New Series, Part I (1905), 228-229.

৪৩। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী। [ভূমিকা, কবিজীবনী ও টীকাসহ] নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলীর ২৪ নং গ্রন্থ। পৃ ৩+৪২+৫৫২। কলিকাতা, ১৯০৯।

৪৪। বিদ্যাপতি। ব্যাপক সংগ্রহ। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ৩য় সংস্করণ; পৃ ৪৮+২৬৯। কলিকাতা, ১৯১০।

৪৫। পুরুষ পরীক্ষা। স্কুলপাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। গঙ্গানাথ ঝা। এলাহাবাদ, ১৯১১।

৪৬। Bangiya Padavali. (Songs of the love of Radha and Krisna.) আনন্দ কুমারস্বামী এবং অরুণ সেন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত। ভারতীয় চিত্রশিল্পের নমুনা, টীকা ও ভূমিকা সম্বলিত। পৃ ১২+১৯২; ১১ প্লেট ছবি। লণ্ডন, ১৯১৫।

১৩৩টি পদের অনুবাদ; ৫টি পদের মূল পাঠ বইয়ের শেষের দিকে দেওয়া আছে।

৪৭। History of Tirhut, from the earliest times to the end of the Nineteenth Century. Shyam Narayan Singh. Calcutta, 1922.

১৮১ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির আলোচনা।

৪৮। Vaishnava Lyrics. Done into English verse. Surendranath Kumar, Nandalal Datta, and John Alexander Chapman. Preface by J. C. Chapman. With glossary. pp x+52. Calcutta, 1923.

সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' থেকে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, নরোত্তমদাস, জ্ঞানদাস, পরমানন্দ দাস, অনন্ত দাস, রাধারমণ, শিবরাম দাস প্রভৃতির ৪৮টি পদের ইংরেজী অনুবাদ। বিদ্যাপতির ২১টি পদের অনুবাদ রয়েছে। 'রাধা' শীর্ষক কবিতায় Chapman লিখেছেন—

O thou of the milky breasts, out of the mist
Of Indian nights thou surely leaned and Kissed
My mouth, or was this old, sweet, lyric book.
The *Padakaplataru* whose reading shook,
My body; so that quickly a passion grew
No words could still but thine, but one or two
Of thy words, Radha, could, if thou shouldest speak them,
Offering Kisses, and then I would let them keep thee.

৪৯। Kirtilata. Text with Bengali and English translations. Edited with an introduction. Haraprasad Shastri. pp 48+40+48+43. Calcutta, 1924.

৫০। বিদ্যাপতি। ভূমিকা ও টীকাসহ। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা, ১৯৩৪।

৫১। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৩৫।

৫২। The Test of Man, being the Purusa Pariksha of Vidyapati Thakura. English translation with an introduction. G. A. Grierson. pp. XX+194. London, 1935.

৫৩। A History of Brajabuli Literature. Sukumer Sen. Calcutta, 1935.

৫৪। A History of Maithili Literature. Jayakanta Mishra. 2 vols. Allahabad, 1949.

[First comprehensive history of Maithili literature. Chap. V, pp 130—192 devoted to Vidyapati and Chap. VI, pp 139—224 to his contemporaries.]

৫৫। বিদ্যাপতি পদাবলী। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভূমিকা; প্রথম সংস্করণে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের জীবনীমূলক আলোচনা, বিদ্যাভূষণের নিবেদন, বাঙলায় অনুবাদ, টীকা, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ ৭৯+৩৬০+২০৭+৬১+৫। কলিকাতা, ১৩৪৮ বাং [১৯৪২]।

৫৬। বিদ্যাপতির পদাবলী। ভূমিকা ও টীকাসহ। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৫৯ বাং [১৯৫৩]।

৫৭। Vidyapati Get-Sangraha or The Songs of Vidyapati. সুভদ্র ঝা সম্পাদিত। পৃ ১৯৩+২৬৪+১৩। বেনারস, ১৯৫৪।
ইংরেজি তর্জমাসহ ২৬২টি পদ এবং বিদ্যাপতির ১১টি গান।

৫৮। বিদ্যাপতি শতক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত। টীকা টিপ্পনিসহ আলোচনা ও ভূমিকা। পৃ ৬২+১৪। ঢাকা, ১৯৫৪।

৫৯। Songs of Vidyapati. Aurobindo Ghosh. pp 87, 3 plates. Pondichery, 1956. [Translation of 41 Padas. Made from a very old Bengali version (sic.) which is given here in Nagari script.]

৬০। হরপ্রসাদ রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৬১।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে নিবন্ধ; কীর্তিলতার মূলপাঠ ও বাঙলা তর্জমাসহ সংশোধিত সংস্করণ। পৃ ২০৫—২৯২।

৬১। প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদসহ বিদ্যাপতির কতিপয় পদ।

৬২। বিদ্যাপতি গোষ্ঠি। সুকুমার সেন। পৃ ৯৬। কলিকাতা, [মৈথিল ভাষায় রচিত ৩০টি পদ, তার মধ্যে ৫—১৭ নং পদগুলি বিদ্যাপতির। বিদ্যাপতি-কৃত দুইটি অবহট্‌ঠ পদও বইয়ের শেষে সংগৃহীত।]

৬৩। বিদ্যাপতি। সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ। পৃ ১৮৭+২৮। তারিখ নেই।

৬৪। বিদ্যাপতি। যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পৃ ৫২। তারিখ নেই।

৬৫। Catalogue of Sanskrit Mss. in the India Office Library, Part IV. No. 2864. Edited by Eggling.

হিন্দী

১। পুরুষ পরীক্ষা। হিন্দুদের নীতিমূলক উপাখ্যান। মূল সংস্কৃত থেকে হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে কথিত ভাষায় অনূদিত। অনুবাদক: তারিণীচরণ মিত্র, প্রধান মুনশী, হিন্দুস্থানী বিভাগ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কলিকাতা, ১৮১৫।

২। "মহামহোপাধ্যায় কবিবর বিদ্যাপতি ঠাকুর।" কমলানন্দ সিংহ। সরস্বতী (এলাহাবাদ), তৃতীয় খণ্ড (১৯০২), পৃ ৩২৯—৩৩৯। জনৈক মৈথিল পণ্ডিত রচিত, হিন্দী ভাষায় বিদ্যাপতি সম্পর্কিত সুলিখিত আলোচনা। বংশলতিকা এবং কবির মৈথিলী, অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃত রচনাবলীর মূল্যায়ণ।

৩। মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি। ব্রজনন্দন সহায় সম্পাদিত। টীকা, কবিজীবনী ও ভূমিকা সহ। ১ম, ৪র্থ, ৫ম অধ্যায়, পৃ ৪৬+২০২। পাটনা, ১৯১০।

৪। বিদ্যাপতি ঠাকুর কি পদাবলী। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। পৃ ৪৭৫। এলাহাবাদ, ১৯১০।

৫। হিন্দী পুরুষ পরীক্ষা। [৪২টি গল্প।] মহেশ্বর প্রসাদ অনূদিত। সংশোধিত সংস্করণ; পৃ ১৩৮। এলাহাবাদ, ১৯১২।

৬। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রবীণ সংস্কৃত শিক্ষক কর্তৃক অনূদিত হিন্দী পুরুষ পরীক্ষা। পৃ ১২৬। এলাহাবাদ, ১৯১৫।

৭। বিদ্যাপতি কি পদাবলী—সটীপ্পন, সচিত্র। ভূমিকা ও টীকা রচনা এবং সম্পাদনা: রামকৃষ্ণ শর্মা বেণীপুরী; সাধারণ সম্পাদক: রামলোচন শরণ বিহারী। পৃ ৪৫+৩৩৪; ৯টি চিত্র। [সুবোধ কাব্যমালা—২নং] লাহেরীয়া সরাই, ১৯২৬।

৮। ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ। কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ কর্তৃক পরিমার্জিত। লাহেরীয়া সরাই, ১৯৮৮ বিক্রম সংবৎ [১৯৩১]।

৯। কীর্তিলতা। আলোচনা, টীকা ও হিন্দী গদ্যানুবাদসহ বাবুরাম সাকসেনা কর্তৃক সম্পাদিত। পৃ ১৯৫+২৩। এলাহাবাদ, ১৯২৯।

১০। হিন্দী গীতিকাব্য [মীরা, সুরদাস, কবীর ও বিদ্যাপতি]। ভূমিকাসহ রামকুমার বর্মা সম্পাদিত। পৃ ১৪০। এলাহাবাদ, ১৯৩২।

১১। মহাকবি বিদ্যাপতি। আলোচনা। শিবনন্দন ঠাকুর। পৃ ৮+২৪৯। পাটনা, ১৯৪১।

১২। বিশুদ্ধ বিদ্যাপতি পদ্যাবলী। শিবনন্দন ঠাকুর সম্পাদিত। দ্বারভাঙ্গা, ১৯৪১।

১৩। মৈথিলী-কোকিল বিদ্যাপতি: সংক্ষিপ্ত পদাবলী। শম্ভুপ্রসাদ বহুগুণ। পৃঃ ৭১+৭৫। লক্ষ্ণৌ, ১৯৪৭।

১৪। হিন্দী কবি চর্চা। [চাঁদ বর্দৈ বিদ্যাপতি, কবীর, জায়সী, মীরা, সুরদাস এবং রসখানের কবিকর্মের ওপর আলোচনা।] চন্দ্রাবলী পাণ্ডে। পৃ ২৮৫। বেনারস, ১৯৪৮।

১৫। বিদ্যাপতি। আলোচনা। শিবপ্রসাদ সিংহ। বেনারস, ১৯৫০।

১৬। বিদ্যাপতি। আলোচনাসহ পদনিচয়। লালদেবেন্দ্র সিংহ ও সূর্যবলী সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত। ভূমিকা: ভি, পি, মিশ্র। পৃ ৫+১৭৬। বেনারস,

১৭। ১৯৫০। বিদ্যাপতি পদামৃত। ওঙ্কারনাথ মিশ্র। পৃ ৮৪। এলাহাবাদ, ১৯৫১।

১৮। বিদ্যাপতি কি পদাবলী। বসন্তকুমার মাথুর কর্তৃক ভাষ্য লিখিত। পৃ ৪৬৭। দিল্লী, ১৯৫২।

১৯। কীর্তিলতা ঔর অবহট্‌ঠ ভাব। মূলপাঠ হিন্দী তর্জমা ও টীকা সহ শিবপ্রসাদ সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত। বেনারস, ১৯৫৫।

২০। বিদ্যাপতি। কবি সমালোচনা। শিবপ্রসাদ সিংহ। বেনারস, ১৯৫৭।

২১। বিদ্যাপতি ঠাকুর। উমেশ মিশ্র।

২২। বিদ্যাপতি বা অমরকাব্য। গুণানন্দ জয়ল সম্পাদিত। কানপুর, তারিখবিহীন। পৃ ১০৮+১০২।

২৩। বিদ্যাপতি ঔর উনকি কবিতা। সতীশচন্দ্র রায়। ভারতপুর হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত। এলাহাবাদ, তারিখবিহীন।

২৪। বিদ্যাপতি-পদ্যসংগ্রহ। সতীশচন্দ্র রায়। পৃ ৬২। এলাহাবাদ, তারিখবিহীন। পদকল্পতরু-সম্পাদক লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দী প্রবন্ধ।

গুজরাটি

পুরুষ পরীক্ষা। বিদ্যাপতি-রচিত সংস্কৃত নীতিমূলক কাহিনী সংগ্রহ। কালিদাস গোবিন্দজী শাস্ত্রী কর্তৃক গুজরাটি ভাষায় অনূদিত। পৃ ৪+১০৮+১২৮। বোম্বাই, ১৮৮২।

বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ

মুহম্মদ আবদুল হাই

[এক]

বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণবতত্ত্ব

ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল মোটামুটি ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার প্রদত্ত তারিখ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার বহু যুক্তি রহিয়াছে। এই হিসাবমতে বিদ্যাপতি মোটামুটি এক শতাব্দী বাঁচিয়া ছিলেন। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলাবাসী এবং মৈথিল ভাষাতেই কাব্য-সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি বিহারের কামেশ্বর রাজবংশের রাজসভা কবি হিসাবে তাহাদের উত্থান-পতন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি একাধারে বহু ভাষাবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, ন্যায়, স্মৃতি ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখিতেন এবং অলঙ্কার ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত ভূপরিক্রমা, কীর্তিলতা, পুরুষ-পরীক্ষা, কীর্তি-পতাকা, লিখনাবলী, শৈব-সর্বস্ব, গঙ্গাবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থই তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও বিচিত্র বিষয়াভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভা তাঁহার পাণ্ডিত্যকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তিনি সেকালের বিহারের বা পূর্ব-ভারতের নয়, সমগ্র ভারতেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। দেহজীবী প্রেমের কবি হিসাবে তিনি কালিদাস এবং জয়দেবের সগোত্র এবং মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে অদ্বিতীয়।

সেকালের মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির লীলাভূমি। বাংলা দেশ হইতে ছাত্রেরা সেখানে পড়িতে যাইত। তাহারই সমসূত্রে মৈথিল অর্থাৎ সেখানকার দেশী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির গান ও কাব্যে তাহারা আকৃষ্ট হইত। তা'ছাড়া বাংলার সহিত তদানীন্তন মৈথিল ভাষার পার্থক্যও ছিল কম। ফলে বিহারী কবি বিদ্যাপতি সংগীতপ্রিয় বাঙ্গালীচিত্তকে আকৃষ্ট

করিলেন। কালে বাংলাদেশেই বিদ্যাপতির কাব্য বেশী সমাদর লাভ করিল। তাহারও কারণ ছিল।

ধর্মমতের দিক দিয়া বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। ছিলেন শৈব বা (শাক্ত)। তবু তিনি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। হৃদয়ের আর্তিতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতেও তাহা ছিল সমৃদ্ধ। সে কারণে চৈতন্যদেবও তাঁহার পদাবলীকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু বিদ্যাপতির পদাবলী শুনিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতেন তাহা নহে, ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তাঁহার পদাবলীর আস্বাদনও করিতেন। ভাবাবেগ শাসিত বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ বটে। এদেশে বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তা এত বাড়িয়াছিল যে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী বিদ্যাপতি তথা কবিশেখর কবিরঞ্জন প্রভৃতি 'ছোটো' বিদ্যাপতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিরা তাঁহার ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাছাড়া সরাসরি বৈষ্ণব না হইয়াও কল্পনাবশে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মান অভিমান, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ও মিলন বিরহ প্রভৃতি সম্ভোগাত্মক কাঠামোর ভিতর দিয়া তিনি চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কাব্যের গতিপ্রকৃতিতেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি মূলতঃ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। পারিপার্শ্বিক জীবন ও অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবু রাধা ও কৃষ্ণ তাঁহার কাব্যের প্রধান অবলম্বন হওয়ায় সাধারণ মানব-মানবীর জীবনবাণী ও জীবনানুভূতিকে ছাপাইয়া শেষ পর্যন্ত সেখানে আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এজন্যে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকলেরই প্রিয় কবি। তবু বিদ্যাপতি সাধারণ্যে বৈষ্ণব কবি হিসাবে পরিচিত এবং তাঁহার কাব্য বৈষ্ণব তত্ত্বভিত্তিক—অন্য কথায় বৈষ্ণবকাব্য বৈষ্ণবতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা—বলিয়া উক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে।

ভক্তিই বৈষ্ণব তত্ত্বের আধার। সেদিক দিয়া বিষ্ণুর ভক্তমাত্রই বৈষ্ণব। কর্মকাণ্ডপ্রধান বৈদিক যুগে ভক্তিধর্মের ব্যাপক প্রসার না দেখা গেলেও সেকালেই ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। কালক্রমে শঙ্করাচার্য (অষ্টম শতাব্দী), রামানুজ (একাদশ শতাব্দী), মধ্বাচার্য (দ্বাদশ শতাব্দী), নিম্বার্ক (পঞ্চদশ শতাব্দী), বল্লভাচার্য (পঞ্চদশ শতাব্দী) প্রমুখ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারদের

হাতে ভক্তিধর্ম নবতর ব্যাখ্যালাভ করে। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) 'ভক্তিবাদীদের ভাষ্যকে উন্নত করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।' চৈতন্যপ্রবর্তিত এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি।

বৈষ্ণবের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের মূলকথা এই যে, বিশ্বের পরমপুরুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়াও ভিন্ন নহে। সৃষ্টির সহিত তাঁহার নিত্য সম্পর্ক। এই কথাটিই রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্বের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাধা সৃষ্টির এবং কৃষ্ণ পরমপুরুষের প্রতীক। রাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণ রাধা হইতে স্বতন্ত্র, অথচ তাঁহারই অভিন্ন সত্তার নিকট হইতে আনন্দলাভ করিতেছেন।

রাধা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া বাহ্যতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া হইলেও মূলতঃ তাহা নহেন। এবং তাঁহাদের সম্পর্কও কামভাবহীন। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে বৈষ্ণবেরা কাম বলিয়া বুঝিয়াছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে বলিয়াছেন প্রেম। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার বা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির অপরিমেয় প্রেমময় মনোভাবকেই প্রকাশ করিয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য-পরবর্তী এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের প্রধান—এবং সে কারণে বৈষ্ণব কাব্য শাখারও প্রধান—অংশ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও তাহার অনুকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এই অনুকৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রাক-চৈতন্য যুগের প্রধান কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি হিসাবে সংস্কৃত ভাষায় কান্ত কোমলপদ সমন্বিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক 'গীত-গোবিন্দ' কাব্য লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতি তাঁহার কাব্যসাধনা করিয়াছিলেন মৈথিল ভাষাতে। আর বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য মধ্যযুগের আদিমতম বাংলার নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। যে বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভাষ্য তাহা চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবধারাকে কেন্দ্র করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কাব্যের এই যে অসাধারণ সমৃদ্ধি প্রাক-চৈতন্যযুগে বিদ্যাপতির কাব্যেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

[দুই]

ইসলাম ও শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম

বাংলা দেশ অনুকরণপ্রিয়। ইসলাম প্রবর্তিত মানবতার ও নূতন সমাজ ব্যবস্থার আকর্ষণে বাংলা দেশও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাংলা দেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের যুগে সেকালের বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যে উৎপীড়িত হইয়াছিল, এ দেশের সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম আসিয়াছিল বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ। সেইজন্য সেকালে অগণিত বাঙালী বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম সুফী সাধকেরা ইসলামের তাওহীদবাদ এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচারার্থে দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং মালাবার উপকূলে বসবাস করিতে শুরু করেন। তার ফলে সেখানকার লোক মুসলমান হইয়া যায়। নবম শতাব্দীর শুরুতেই মালাবারের চেরামন পেরুমল বংশীয় শেষ নরপতি ইসলামধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া মক্কা চলিয়া যান। * হিন্দু ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে বহিরাগত এই উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য সেকালে ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগামীদের মতে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল, এতকাল পরে বাংলা দেশ তদপেক্ষাও গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে, চৈতন্য তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন। তাই ইসলামের হাত হইতে সেকালের বাংলাদেশকে বাঁচাইবার জন্য ইসলামেরই মূলমন্ত্র আত্মসাৎ করিয়া 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' — এই বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া তিনি রামানুজ না নিম্বার্কের শিষ্য সুস্পষ্ট না বুঝা গেলেও ইসলামের নির্যাস আত্মসাৎ করিয়া ইসলামকে রোধ করিবার জন্য তিনি যে নিম্বার্কের ভক্তি প্রেম ও আবেগপ্রধান সাধনার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নিম্বার্ক এবং রামানন্দের মধ্যে যে সাধনা ছিল

* Tarachand : Influence of Islam on Indian Culture (Allahabad, 1946), p 33-34.

মূলতঃ আবেগপ্রধান, চৈতন্যের মধ্যে তাহা আবেগসর্বস্ব হইয়া উঠিল। তাঁহার মত, অনুভূতি ও সাধনার রূপায়ণে নৃত্যগীতাদি ও হরিনাম সংকীর্তন তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইল। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসাবে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাছে শ্রীচৈতন্যের রূপধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একাকী আসিলেন না। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' হইয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবকান্তিধারণ করিয়া 'বহিরঙ্গে রাধা' এবং 'অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ' রূপে তিনি আবির্ভূত হইলেন—

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরূপ আস্বাদিতে হইলে অবতার॥

এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে চৈতন্য একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ দুইই।

বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবনধারা ও জাতির মর্মমূলের সঙ্গে চৈতন্যের সুগভীর পরিচয় ছিল। তাঁহার যুগে তাঁহার মতো করিয়া আর কোনো বাঙালী হিন্দু ইসলামে সাম্য, মৈত্রীর ও একত্ববাদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হন নাই। তাই ইসলামের মোকাবিলা করিয়া তাঁহার জাতিকে বাঁচাইবার জন্য এই অবতারতত্ত্ব ও বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তির বন্যায় সেদিন তাঁহাকে হিন্দু বাংলাকে ভাসাইবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। তিনি কেবলমাত্র নদীয়ায় হরিনাম-সংকীর্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ছিলেন তব্‌লীগে বিশ্বাসী। তাই সমগ্র বাংলা দেশ ও বাংলার বাহিরে উত্তর ও মধ্যভারতে তিনি এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ তাঁহার ভক্ত শিষ্যরা তাঁহার নবলব্ধ বৈষ্ণব ধর্মচেতনার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা এই অনুভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়াছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল ধারাটি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় অনুভূতির প্রতিরূপ অর্থাৎ রূপক গীতিকাব্য।

[তিন]

বৈষ্ণব অনুভূতি ও সুফী মতবাদ

বৈষ্ণব সম্ভবতঃ বুঝেন যে কোন বৃহৎ ও সার্বজনীন বিষয়বস্তুকে একেবারে আয়ত্তে আনা যায় না। অনন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি চক্ষু জুড়াইয়া

আসে ; মনেই থাকে না কোথা হইতে আমার অভিলষিত এক ঘটি জল লইব। সেই জল তুলিতে গিয়া আমি আত্মপর ভুলিয়া যাই, আপনহারা হইয়া পড়ি ; উদ্দেশ্য প্রথমেই অনির্দেশ্য হইয়া পড়ে। তাই আমার সাধনার আরম্ভ ছোটর ভিতর দিয়া, কারণ সেই ছোটর ভিতরে ছোট তো রহিয়াছেই, অধিকন্তু যেখান হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহা সেই বড়র অংশ বলিয়া বড়ও সেখানে ধৃত হইয়াছে। যেমন একটা ঘট, সেও মাটির অংশ। সুতরাং সেই ঘটাকারে সর্বমৃত্তিকার রূপই প্রত্যক্ষ করি, ঘটাকাশের মধ্যে অনন্ত আকাশের রূপ নিবদ্ধ হয় বলিয়া সেই ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহতের পরিচয় মিলে। প্রথম সেই ক্ষুদ্রকে তুলিয়া আনি তাহাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়া, সেই ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব নষ্ট করিয়া দাও, ঘট ভাঙ্গিয়া ফেল, তখন তাহা অনন্ত মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইবে, আর ঘটাকাশ বিরাট আকাশের মধ্যে, সেই ভূমার মধ্যে বিলীন হইবে। অনন্ত আকাশের অংশবিশেষ যেমন ঘটাকাশটুকু, তেমনি নির্বিশেষের বিশেষরূপ এই জগৎ, এই সৃষ্টি। স্রষ্টা আনন্দলাভ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া সৃষ্টির কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখনই "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (ছান্দোগ্যোপনিষদ)। তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব। সেই ইচ্ছার প্রকাশ এই সৃষ্টি। স্রষ্টার এই সৃষ্টিকে বৈষ্ণবেরা রাধার কায়ব্যূহরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ক্ষমতার বিচিত্র দিককে আনন্দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাঁধিবার জন্য স্রষ্টা যেমন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন বৈষ্ণব ভগবানের সেই সৃষ্টিকে তেমনি রাধিকার 'কায়ব্যূহ' রূপে দেখিয়াছেন। বৈষ্ণবের সুষুপ্ত ব্রহ্মের সুপ্তিভঙ্গই এই সৃষ্টি :—

> কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন, সোনার বরণ পীতবসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে—আহ্লাদিনী ভালবাসাঠাকুরাণী, শ্রীরাধা। ঠাকুরাণী বলিলেন, পরাণ বঁধুয়া তুমি, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আমার ষোলকলার এক এক কলা হইতে তোমার জন্য সহস্র প্রণয়িনী সৃষ্টি করিব। আমার অংশে আমার পরিণাম তাহারা, আমার ধাতু আমার স্বভাব পাইবে, তুমি যাহার সহিত সঙ্গত হইয়াই সুখ পাও, তাহারা তাহাতেই অনুকূল হইবে। সেই ব্রজনারীকে সকলে মিলিয়া সুসজ্জিত করিয়া তোমার ভোগের উপযুক্ত নৈবেদ্য করিয়া তোমার নিকট অভিসার করাইবে।
>
> আমি নন্দমহারাজ হইয়া তোমার জন্যে হাটবাজার করিব এবং যশোদারাণী হইয়া তোমার লালন পালন ও শাসন করিব। ধেনু হইয়া তোমার সাথে ফিরিব।

বনে তোমাকে ঘন দুগ্ধ পান করাইব; বংশী হইয়া তোমার সাধের রাধা নাম গাহিব, তোমাকে আমার নয়নতারা করিয়া রাখিব, তোমার কণ্ঠলগ্না হইয়া তোমার বনমালা হইব, কদম্ব তরু হইব; গ্রীষ্মে সুশীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব; মলয়পবন হইয়া, যমুনার জল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব, অঙ্গ পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাভিতে কস্তুরী ধারণ করিব।... নানা ধাতুর বৈচিত্র স্বীকার করিব; লতায় পুষ্প, পুষ্পে মধু, মধুলুব্ধ অলি, লতাবিতান, লতাবিতানে সুখশয্যা, শারদচন্দ্র, বাসন্তলী, মরালের নৃত্য, কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইব; তুমি সকল রকম রসের কোনটাতেই বঞ্চিত হইবে না। এইরূপে কৃষ্ণের সকল রকম সুখের উপকরণ-সমষ্টি ব্রজনির্মাণ শেষ হইল। ঠাকুরাণী ব্রজনির্মাণ করিলেন। সমগ্র ব্রজটি ভালবাসা ঠাকুরাণীর কায়াব্যূহ।*

রাধার এই বিরাট কায়ব্যূহ নির্মাণের মূলতত্ত্বের সহিত ক্ষুদ্র ব্যক্তি দেহের তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে আনন্দ নিখিলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাই ধরা দেয় মানুষের এই দেহে। বিশিষ্ট প্রেমিক তাহা আস্বাদ করে এই দেহদ্বারা। বৈষ্ণব কাব্যে তাই আমরা দেখি দেহের প্রাধান্য। মানুষ যখন নিজেকে অন্তরের সঙ্গে মিলাইবার জন্য আপনার দেহকে শুধু উপায়স্বরূপে ব্যবহার করে, বৈষ্ণবের মতে তখন তাহা পবিত্রতা লাভ করে, কিন্তু দেহ যদি উপলক্ষ না হইয়া লক্ষ্যে পর্যবসিত হয় তখন তাহা ঘৃণ্য কামপরিচর্যার আধাররূপে দেখা দেয়। উপলক্ষের মধ্যে কামগন্ধও থাকেনা, রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মসমাহিত হইয়া উঠে। তখন বৈষ্ণব বলিতে পারে 'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' ইহা ব্যবহারিক জীবনে সত্য না হইলেও বৈষ্ণবের ভাবানুভূতিতে হয়ত সত্য; তাই তাঁহারা যখন আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিকে অপরেন্দ্রিয় প্রীতিরূপে অনুভব করেন তখন তাহা হয় প্রেম। কিন্তু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যদি স্বরূপেই রহিয়া যায় তখন তাহা কাম। বৈষ্ণবের রাধা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিতে এমনই আবেশ বিহ্বলা যে সেখানে নিজেন্দ্রিয় প্রীতির কথা তাঁহার মনেই আসেনা। কৃষ্ণ যদি সুখী হন তাহা হইলে তাঁহার অদেয় কিছু নাই, কৃষ্ণকে তিনি এমনভাবে ভালবাসিয়াছেন, এমনভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পন করিয়াছেন যে কৃষ্ণের সুখ তাঁহার নিজের সুখ, কৃষ্ণের আনন্দ তাঁহার নিজের আনন্দ। বৈষ্ণবের কথায় এই যে প্রীতি তাহা—

* ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ঠাকুরাণীর কথা।

পীরিতি পীরিতি কি রীতি মূরতি
পীরিতি বলয়ে তারে
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে।

তাই দেখি ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি রাধা বলেন :—

> দর্পণে যখন আমার প্রতিবিম্ব পড়ে তখন সেই প্রতিবিম্বকে যে 'আমি' দেখিতে থাকেন সেই 'আমি' হইলেন আমার ভগবান। প্রতিবিম্ব আমিতে যদি কোথাও দুঃখের ছায়া থাকে, মুখখানা শুষ্ক নীরস ও বিপন্ন থাকে, চোখে যদি জল ঝরে তবে আমার ভগবান যে ব্যথিত হন, তাই আমাকে সাজাইয়া রাখি; ঠোঁট দুইটিকে করিয়া রাখি লাল টুকটুকে, চোখে দেই কাজল, কপালে দিই তেমনি একটা ঘনকৃষ্ণ তিলক ফোঁটা। মুখে রাখি হাসি প্রস্ফুটিত। যখন ভগবানরূপী আমি আমাকে হাস্যোজ্জ্বল ভাবে প্রতিবিম্বিত দেখেন তখন তিনি সুখী হন। তখন তাঁরও মুখে আসে হাসি। তাইত আমার এত বিলাস, তাইত আমার সজ্জা।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখে নিজকে এতটা বিলাইয়া দেওয়ার যে আনন্দ তাহা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নিজের নিজত্বকে ভুলিতে পারে, যখন তার আমিত্ব বলিতে আর কিছুই থাকেনা। যখন তাহার মন ও আত্মা কৃষ্ণময় হইয়া উঠে তখন দেহের মান সম্ভ্রম লজ্জা সঙ্কোচের কথা মনেই পড়ে না। সেই আবেশবিহ্বল অবস্থায় সে বলিতে থাকে আমার সর্বদেহে কৃষ্ণ বিরাজ করুন। তাই কৃষ্ণবিহার স্থল তাহার দেহকে সাজাইতে তাহার কোন বাধা জন্মে না এবং সেই দেহকে তখন সে কলা সমন্বিত করিয়া প্রিয় মিলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যে এই সজ্জার এবং পরমানন্দ উপলব্ধি করিবার ও করাইবার যে বহিঃপ্রকাশ আমরা তাহা উক্ত সাহিত্যের 'ভাব সম্মিলন' অংশেই বেশী করিয়া প্রত্যক্ষ করি। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীতে 'ভাব সম্মিলনে' দেহদানের এই অপূর্ব সমাবেশই বর্ণনার মাধুর্যে এবং প্রকাশের বিশিষ্ট কারুকার্যে একদিকে যেমন ফেনিলোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে অন্যদিকে তেমনি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় রাধিকা হৃদয় আপনাকে ধরা দিয়াছে।

বৈষ্ণব বড় রকমের দেহবাদী। প্রেমের দেউলে সে একান্তভাবে দেহের পূজারী। সে বলে 'অতবড় ভাব লইয়া আমি কি করিব? শুধু আদর্শ লইয়া ত মানুষ বাঁচিতে পারেনা। আমি চাই হৃদয় দিয়া একেবারে প্রত্যক্ষ করিতে। তাই ভগবানকে ভাবলোকে, আদর্শলোকে প্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের অতি সন্নিহিত করিয়া পূজা দিব। ভগবানের লীলা-খেলাকে মর্ত্যজীবনের সঙ্গে মিলাইয়া সাধারণ নরনারীর প্রেম প্রকাশের ভিতর দিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইব।' তাই বৈষ্ণবের কাছে ভগবান হইলেন এক অপূর্ব প্রেমিক নাগর, আর তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি বা আনন্দ বিধায়িনী শক্তি শ্রীরাধা ষোলকলায় বিভূষিতা অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না সাংসারিক নায়িকা।

এই প্রসঙ্গে পারস্য ভাষার সাধক কবিদিগের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাদেরও অনেকে যেমন ওমর খাইয়াম, জামী, হাফিজ, সা'দী, শামস্ তবরেজ, আমীর খসরু ও জেবুন্নিসা প্রভৃতি খোদাওন্দের প্রেমোপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকে অনন্ত যৌবনা, রূপসী প্রেয়সী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং আপনাদিগকে সে অদ্ভুত কলাবিলাসিনী রূপসীর সর্বগুণসম্পন্ন নায়করূপে কল্পনা করিয়া। সহজ কথায় বৈষ্ণব কবিতায় পরমাত্মা পুরুষ, জীবাত্মা নারী; আর সুফী কবিদের গযল কবিতায় পরমাত্মা নারী, জীবাত্মা পুরুষ। উভয় কাব্যসাহিত্যেরই মূলভাব প্রেম এবং মাধুর্য।

আমরা জানি, প্রাকৃত প্রতীকের (symbol) সাহায্যে অপ্রাকৃত প্রেমের পরিমাপ নির্দ্ধারণ করিবার যে ভাবনা কোরাণ কিংবা ইসলামের শরা শরীয়ত বা শাস্ত্রাদি তাহা কোনদিনেই সমর্থন করে না। কিন্তু পারস্যের ও তাহাদের অনুগামী ভারতবর্ষীয় সুফী কবিগণ যুক্তি, তর্ক, বিচার, বিবেক ও শাস্ত্রাদি রচিত সীমারেখার বুদ্ধিজাল ছিন্ন করিয়া শারাব, সাকী, প্রিয়া ও পিয়ালার সাধনায় নিজেদের অন্তরাত্মাকে এমন এক উর্দ্ধলোকে স্থাপিত করিয়াছেন, সেখান হইতে অমৃতলোকের রসাস্বাদন করিতে তাঁহাদের কোন প্রকারের শাস্ত্রানুগ হইতে হয় নাই। আকাশের নীলিমায়, বাতাসের মর্মরধ্বনিতে, সাগরের অসীমতায়, চাঁদের লাবনীতে যে বৈচিত্রময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে, মিলন আশায় সেই আলেয়ার পিছনে জীবনব্যাপী বিরহের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলার যে আনন্দ এবং সেই প্রেমোপলব্ধির যে গভীরতা একান্তভাবে সুফী কবিগণের তাহাই প্রাপ্তি।

সুফী সাধনার ইতিহাসে 'আলামে নাসুত', 'আলামে মালাকুত', 'আলামে জাবারুত' এবং 'আলামে লাহুত' নামক যে চারিটি স্তর রহিয়াছে, তাহার প্রথমটি সেই সাধনপথের যাত্রীকে পার্থিব ভোগলালসার পথ হইতে রক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমোন্নতির পথ নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টিতে জাগতিক লোভ ও মোহমুক্ত মানুষ ঈশ্বরের অপরূপ রূপের দর্শন আশায় অধীর, উদ্‌গ্রীব ও আত্মহারা হইয়া উঠে। তাঁহার দর্শন তখনও সে প্রকৃষ্টভাবে পায় না, অথচ কি যেন কিসের প্রাপ্তির মোহনীয় মাদকতায় উন্মত্তবৎ দিশাহারা হইয়া ফিরে। সুফী সাধনার এই দ্বিতীয় স্তরই অতীব ভয়ানক। উক্ত সাধন-তত্ত্বান্বেষী বহু মানুষ এই স্তরে আসিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময় উন্মাদ হইয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরে যাঁহাকে পাই পাই করিয়াও পাওয়া গেল না তৃতীয় স্তরে নিখিলের মধ্যে তাঁহারই রূপ বিচ্ছুরিত দেখা যায়। প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহারই রূপ অবলোকন করিয়া সুফী সাধক স্বীয় আত্মরতির চরিতার্থতা লাভ করেন। চতুর্থ স্তরে সমগ্র জগতে পরিব্যক্ত সেই অপার্থিব রসমূর্তির নিকটে নিজকে পরিপূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইয়া উঠেন। সে অবস্থায় ভক্ত সাধক ও 'সাধ্যে' কোন পার্থক্য থাকে না, তখন পূজ্য ও পূজক এক হইয়া যান। অপার্থিব অমৃত রস এমনভাবে আস্বাদন করিবার পরেও সুফী সাধক পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে পারেন এবং জাগতিক ও ব্যবহারিক জীবনের সকল তথ্য ও সত্যের ধারায়, সংসার জীবনের লোক-লৌকিকতার মধ্যে স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল ও কঠোর গুণাবলীর আদান-প্রদানে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে নিজেকে নিয়োগ করিতে পারেন। সুফী-মতবাদ, দর্শন ও সাধনার বৈশিষ্ট্য এখানেই।

বেদান্ত দর্শনে জীবাত্মা যেখানে পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, বৈষ্ণব দর্শনে জীবাত্মা পরমাত্মায় একেবারে বিলীন না হইয়া গিয়া সেখানে 'তদ্ভাবে' থাকে, সুফী মতবাদ সেখানে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সংগে মিশাইয়া তাহাকে অপার্থিব দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ও সুপুষ্ট করিয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরাইয়া আনে এবং জগতের সকল বন্ধনের মধ্যে অসম্পৃক্তভাবে অবস্থান করিবার যোগ্যতা দান করে।

সুফী কবিগণ অপার্থিব প্রেমের পার্থিব রূপ রচনা করিয়া আজীবন বিপুল দুঃখের গহীনতায় যেখানে চির সুখের পরিসমাপ্তি চাহেন, বৈষ্ণব কবিগণ

সেই অপার্থিব সত্তাকে পার্থিব রূপের বাঁধনে বাঁধিয়া হৃদয়ের অতি সন্নিহিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পার্থিব নিয়মের বিভিন্ন ধারায় আপন হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কাব্যে বৈষ্ণবের এই যে অনুভূতির প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহা—

এই প্রেমগীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,
দিই তাই দেবতারে। আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে সমগ্র বাংলা দেশ জুড়িয়া যে ভক্তি-প্রীতির বান ডাকিয়াছিল, তাহা ভারতীয় হিন্দু দর্শন হইতে উদ্ভূত; শুধু তাহা কবীর দাদূ প্রমুখ সাধকের সাধনায় ইসলামের সুফী মতবাদের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সময়ে নানাভাবে পল্লবিত হইয়াছে। সে কালের দেশব্যাপী সাধনার স্থায়ী স্বাক্ষর এই বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্য। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলা তথা ভগবান ও তাঁহার আনন্দবিধায়িনী শক্তির এই কেলিকলাকে একেবারে মানব-মানবীয় প্রেমের ধারায় অভিষিক্ত করিয়া মর্ত্য জীবনের মাধুরী পান করিতে চাহিয়াছেন। সেই সাধনায় প্রাক্-চৈতন্য যুগে তাহাদের ভগবান হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা হইয়াছেন একেবারে সদ্বংশজাত কোন বঙ্গীয় কুলবালা; আর চৈতন্য পরবর্তী যুগে ক্ষেত্রবিশেষে কবিদিগের আপনাপন হৃদয়ই শ্রীরাধার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ আপন হৃদয়কে রাধারূপে কল্পনা করিয়া ভগবানের চরণতলে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং সেই ভগবানকে সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য, কান্ত বা মধুরভাবে সেবা করিয়াছেন। অন্যান্য ভাবের তুলনায় কান্ত বা স্বামীভাবে ভগবানকে পূজাদান বৈষ্ণব কাব্যে সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহাদের কাব্যে নায়িকাকে পূর্বরাগ, প্রেম-অভিসার, মিলন-বিরহ, ভাব-সম্মিলন প্রভৃতি স্তরে আপন হৃদয়ের রসমাধুর্য নিবেদন করিতে দেখিতে পাই।

বৈষ্ণবের এই যে কান্ত স্বামীভাবে ভগবানকে পূজাদান ইহার মধ্যে আবার একান্তভাবে পরকীয়াবাদেরই প্রাধান্য। গতানুগতিক সংসার বন্ধনে

প্রেমের স্বাতন্ত্র্য তেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। নিয়মবদ্ধ জীবন যন্ত্রবদ্ধ জীবের ন্যায়। সেখানে প্রেমের ঔজ্জ্বল্য তেমন অনুভূত হয় না—অনেকটা বৈচিত্র্যের অভাবে আর অনেকটা নিতান্ত ধরাবাঁধা নিয়মানুবর্তী বলিয়া। 'পরব্যবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যগ্রা থাকিয়াও অন্তরে সর্বদা উপপতির কথা চিন্তা করে, তেমনই আমরা যদি এই বিশ্বে বাস করিয়া, সাংসারিক কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও সর্বদা বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে তো আমাদের কূল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থা হন।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পদাবলী পরিচয়, পৃ ১৫০।) বৈষ্ণবের শ্রীরাধাও এমনি দ্বিচারিণী নায়িকা। লৌকিক বিশ্বাস—তিনি আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং কূলে কলঙ্ক দিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া নিজকে ধন্য করিয়াছিলেন। গূঢ়তর অর্থে বৈষ্ণবের এই শ্রীরাধা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি—জীবাত্মার বা মানবাত্মার প্রতিমূর্তি। মানুষ সংসারে আসিয়া সাংসারিক লাভ ক্ষতি, লোভ-লালসা এবং ভোগবিলাসে এমনই আবিষ্ট হইয়া পড়ে যে এই সংসারের দাসত্ব করিতেই তাহার জীবন ব্যয়িত হইয়া যায়। সেখানে ধর্ম বা ভগবান বলিয়া কোন শ্রেষ্ঠতর চেতনা সাধারণতঃ স্থান পায় না। আবার সংসারী মানুষের ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সংসারের প্রতি অনাসক্ত হইবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সাংসারিক আচার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া এরকম মানুষ হয় ভুল করিয়া বসে, না হয় সম্পূর্ণ অপারগ হয়। অমৃত লোকের রসাস্বাদনের আকর্ষণে মানবাত্মার এই পরিণতি বিচিত্র নহে।

সংসারে থাকিয়া যে মানবাত্মা ভগবানের ডাকে সাড়া দিবার জন্য ছুটিয়া আসেন তিনি বৈষ্ণবের চোখে পরকীয়া নায়িকা এই শ্রীরাধা। এই সংসার যমুনায় নিত্যকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। তুমি আমি আর সে ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি না, কিন্তু যে রাধারূপী হৃদয় সে আহ্বানে একবার সাড়া দিল, এই অবাঞ্ছিত প্লাবনে তাঁহার এতদিনের সুগঠিত সংসার একেবারে ভাসিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত গৃহকর্ম নষ্ট হইয়া গেল। তিনি ঘর গুরুজন পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥

আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রন্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হওঁা তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী ব'এ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈল কোন দোষে॥
অঝর ঝরএ মোর নয়ানের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলো পরাণী॥
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই লড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের ধনী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাষে।
ব সলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

বৈষ্ণব কাব্যে এই পরকীয়াবাদেরই সমারোহ এবং কান্ত ভাবেরই পূজা। কারণ এই পরকীয়াবাদের ভিত্তিতে সংসারবিরাগী মানবাত্মার প্রেম আপনাকে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সুফী ভাব সাধনায় পরকীয়াবাদ বলিয়া কোন কল্পনা স্থান পায় নাই। উভয় চিন্তা পদ্ধতিতেই পরমাত্মাকে লইয়া রস স্বরূপের যে সাধনা তাহা বিরহ-ভিত্তিক; সুফী ও বৈষ্ণব উভয়ের মধ্যেই পরমাত্মার সহিত মিলনাকাঙ্খা প্রবল, তবু চির বিরহেই তাহার পরিণতি। কেননা—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তিথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

বিদ্যাপতি-পদাবলীর রসবিশ্লেষণ

সংসার পথে নায়কনায়িকার যেরূপে প্রেম পরিণয় বিরহ মিলন ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী লিখিতে গিয়া তাহারই আশ্রয় লইয়াছেন। উপযুক্ত বয়স না হইলেও স্ত্রীপুরুষ কেহই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেনা। তাই কবিকে সর্বপ্রথম শ্রীমতী রাধার বয়ঃসন্ধি

বর্ণনা করিতে হইয়াছে। শৈশব তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিতেছে দেহের মধ্যে অপরূপ যৌবন।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন লেল॥
কবু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সঘন বচন কহু নত কর মাথ॥
ঝটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥

এমতাবস্থায় দেহের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন দেখিয়া শ্রীমতী নিজেই চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে সর্বাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সাথীকে সেই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আর শিক্ষা করিতেছেন অতঃপর কি করিতে হইবে।

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেলু।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল॥...
মুকুর লই অব করত সিঙ্গার।
সখী পুছই কৈসে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসইত অপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ॥

সুন্দরী তেমন নবোদ্ভিন্নযৌবনা। তাহার রূপ যৌবন সম্বন্ধে এখন তিনি সচকিত, সজ্ঞান। তাই তিনি তাঁহার রূপের ছটা বিস্তার করিয়া দিয়া কৌতুকানন্দ উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রীমতী তাই সচকিত হইয়া—

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥

চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

শ্রীমতী কৌতুকপরবশ হইয়া সজ্ঞানভাবে যে রূপজাল বিস্তার করিতেছিলেন শ্রীমান সেই জালে পা বাড়াইয়া দেখিলেন অপরূপ রূপ, মদনও সেখানে পরাভব মানে—

সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ীমালা॥

তাঁহার এই ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেমন যেন উতলা হইয়া রহিলেন। এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। এই আনমনা ভাবে তাঁহাকে একটু অনন্যসাধারণ দেখাইল। শ্রীমতী কৌতুকছলে নিজের রূপের সজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন সেই ফাঁদেই তিনি মরিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া গেল। তাই সখীর কাছে তিনি বলিতে গিয়া ধরা পড়িলেন—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব সপন সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥

শুধু কি তাই? লোকটির রূপ অপরূপ; তাহাতে কন্যা 'বরয়তে রূপং মাতা বিত্তম্, পিতাশ্রুতং', হয়ত এ সবই মিলিতে পারে; তখন সখীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, প্রিয় সখী—

কি পেখল এক অপরূপ।
শুনইতে মানবী সপন সরূপ॥
কমল যুগল পর চাঁদক মাল॥
তাপর উ পজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥

কিছুদিন এমনি কাটিল। ইত্যবসরে মদনও দুষ্টামি করিতে ছাড়িলেন না। তাঁহার চিত্ত যখন অস্থির তখন মদন সম্মোহন বাণ ছাড়িয়া তাঁহাকে একেবারে

কৃষ্ণমুখী করিয়া রাখিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতীকে দেখিবার জন্য নানা ছল খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেন না। 'কদাচ কখনও দেখা হয় যমুনার জলে, স্নানের ঘাটে, স্নান করিয়া ফিরিবার পথে। এই আধো আধো দেখার মধ্যে মন আরও অধীর হইয়া উঠে।' তখন তাঁহার পূর্বরাগের পূর্ণ অবস্থা। কিন্তু নারীশ্রেষ্ঠ এমনি যে তাঁহার কলায় মদনকে হার মানাইতে তিনি ব্যগ্র; তাই গ্রীবা বাঁকাইয়া, ফিরিয়া চাহিয়া, তীব্র কটাক্ষ হানিয়া একটুখানি দুষ্টু হাসি হাসিয়া যান —

গেলি কামিনী গজহু গামিনী।
বিহসি পলটি নেহারী॥
ইন্দ্রজাল কুসুম সায়ক।
কুহকি ভেসি বরনারী॥

এহেন অবস্থায় 'হৃদয়কে শান্ত সংযত করিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া যায় না' কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেখিবার জন্য মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। এত করিয়া যতটুকু দেখা গেল, তা শুধু "আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি, আধহি নয়ান তরঙ্গ।" কিন্তু হায়! দুঃখ রহিয়া গেল, "সজনি, ভাল কএ পেখন ন ভেল। মেঘমালা সঞে তড়িত লতাজন হৃদয়ে শেল দই গেল।"

এযাবৎ বাহ্যিক সৌন্দর্যই প্রকাশিত হইল, আন্তর সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ কেহই লাভ করিতে পারিলেন না। তাহা হইলে কি হয়! শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই শ্রীরাধার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফেলিয়াছেন। সেই কণ্ঠস্বরের কি মাধুর্য! অনবরতঃ শ্রবণেও তৃপ্তি হয় না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মন সেখান হইতে চলিতে গেলেও পদদ্বয় কিছুতেই নড়িতে চায় না। কারণ সেই স্বর যেন বৈষ্ণব কাব্যের মনোহারিণী সঙ্গীতেরই প্রতীক। তাই—

শ্রবণ রহল ঐছে শুনইত রাব।
চলইতে চাহি চরণ ন যাব॥

আধ্যাত্মিকতার কথা আমরা এখন আর কিছুই বলিব না। কিন্তু ইহা সত্য, যে নায়ক নায়িকার দ্বারা মিলন ও বিরহের পটভূমিকায় এতবড় কাব্যলোক সৃজন করিতে হইবে, তাহাদের উভয়কে পরস্পরের কাছে কবি অনুপমরূপ লাবণ্য মণ্ডিত করিয়াছেন। ভাষাসমুদ্র মন্থন করিয়া যেখানে যে বাক্যটীর

প্রয়োজন তাহাই প্রয়োগ করিতেছেন। আর বলিতেছেন, অনুরাগের সলিল তীর্থে যে ব্যক্তি শত যজ্ঞের উদ্বোধন করিয়াও এমন রমণীরত্ন লাভ করিতে সক্ষম হন সত্যই তিনি বড় ভাগ্যবান!

পূর্বরাগ পরিচ্ছেদে উভয়ে উভয়ের প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছিলেন তাহা পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার জন্য সখীর ও দূতীর নিকট এখন কত কথা; কত ছলে কত কৌশলে, কত গালগল্পে তাঁহাদের মন ভুলাইয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবার কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা! সখী ও দূতী একটু আনমনা হইলে, কি তাহাদের কথা শুনিতে না চাহিলে কত অনুনয় বিনয়, কত সাধ্য সাধন। এত করিয়াও যখন দর্শন পাওয়া যাইতেছে না তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একটু অভিমান এবং সেই অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য দূতীর কত অনুরোধ। শ্রীমতী কপট অভিমানের ভান করিয়াছেন,—ইচ্ছা হরি সন্দর্শন। ওধারে হরির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাই দূতী বলিতেছেন—

লাখে তরুবর কোটিহি লতা।
যুবতী কত ন লেখ।
সব ফুল মধু মধুর নহি।
ফুলহু ফুলবিশেখ॥
যে ফুল ভমর নিন্দহু সুমর
বাসি বিসরয় ন পার।
যাহি মধুকর উড়ি উড়ি পর
সেহে সংসারক সার।
সুন্দরি অবহু বচন শুন।
সবে পরিহরি তোহি ইছ হরি
আপু সরাহরি পুন॥
তোরিএ চিন্তা তোরিএ কথা
শেজহু তোরিএ চাঞো।
স্বপনহু হরি পুনু পুনু করি
নয় উঠ তোরিএ নাঞো।
আলিঙ্গন দয় পাছু নিহারয়
তোহি বিমু শূন কোর।
অকথ কথা আপু অবথা
নয়নে তেজয়ে নোর।

এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের অকালপক্কতার দরুণ গভীর বিরহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; আর মনে পড়ে মেঘদূতের সেই পংক্তিগুলি, যেখানে বিরহী যক্ষ প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই তাঁর প্রিয়ার রূপ দেখিতেছেন আর প্রিয়াভ্রমে আলিঙ্গন দিতেছেন।

তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ গাঢ় ও গভীর দূতীর নিকট হইতে একথা জানিতে পারিয়া রাধিকা মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং নিঃসংশয় হইয়া সখীর নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া যায়। দূতীর কথায় ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া দেখিলেন সম্মুখে দুস্তর যমুনা। কৃষ্ণ সেই যমুনায় ভেলা ভাসাইয়া কাণ্ডারী হইয়া বসিয়াছেন। পার তো হইতে হইবে। হরি নিশ্চয় সৎ লোক্ হইবেন। এই ভরসায় তিনি তাঁহার নৌকায় উঠিলেন। দুষ্টবুদ্ধি হরি ওধারে রাধাকে হাতে পাইয়া দুষ্টামি করিতে ছাড়িলেন না। রাধিকা পড়িলেন ফাঁপরে। তাই তখন মুখরা হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

তুয় গুণ গৌরব শীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়সিহু তোহরি নাব॥
হঠ ন করিয় কাহু কর মোহি পার।
সবতহ বড় ধিক পর উপকার॥
আইলি সখী সবে সাথে হামার।
সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার॥
হমে অবলা কত কহব অনেক।
আইতি পড়লে বুঝিয় বিবেক॥
তোহেঁ পরনাগর হাম পরনারী।
কাঁপে হৃদয় তুয় প্রকৃতি বিচারী॥

রাধিকার কাতরোক্তিতে সেবারের মত কৃষ্ণ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ফলে রাধিকার আশা পূর্ণ হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন। যে ভাব এতদিন গুপ্ত ছিল, তাহা যে এখন তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে যাইতে চায়। সংসারে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিতে থাকে। তখন দূতী দেখিল বিপদ তো তাহারই। কেননা জোরপূর্বক সেই তো তাঁহাকে সংসার মরুপথে বাহির করিয়া আনিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে। ধরা পড়িয়া গেলে লাঞ্ছনার ভাগ তাহারও তো কম হইবে না। তখন সে বলিতে থাকে

'কানুর জন্য তোমার মনের আর্তিকে একটু ঢাকিয়া চাপিয়া রাখ— গুরুজনকে একটু লজ্জা সরম করিয়া চল—

শুন শুন বিনোদিনী রাই।
তোহে পুনু কহওঁ বুঝাই।।
কানুক ভাব যো হোই।
হিয় মাহ রাখব গোই।।
কেহ জনু লখইতে পার।
বেকত করবি কুলাচার।।
কানু উয়ব হিয় মাহ।
আন ছলে বিসরবি তাহ।।

মুর্শিদরূপী দূতীর হাতে যে পড়ে তাহার কি আর রক্ষা আছে! তাই দেখি অঘটনঘটনপটিয়সী এই দূতী গুরুজনের চক্ষু এড়াইয়া দিবাভাগে কানুর পীরিতি গুপ্ত করিয়া রাখিতে বলিতেছে। রাত্রির আবির্ভাবে তাঁহাকে ভুলাইয়া বাড়ীর বাহির করিতেছে, কুলবালা রাধিকা, কুলে কলঙ্ক পড়িবে সে ভয় তাঁহার আছে। তাই তিনি বলিতেছেন, 'অমন কাজ আমার দ্বারা হইবে না; আমি আর কিছুতেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইব না।' মুর্শিদ বলিল 'ভয় কি, সঙ্গে তো আমি আছিই। তুমি আমাকে তো বিশ্বাস কর!'—

কাহে ডরসি সখি চলু হম সঙ্গ।
মাধব নহি পরশব তুয় অঙ্গ।।
হই রজনী ফুল কানন মাঝ।
কে এক কিরত সাজি বহু সাজ।।
কুসুমক ঘোর ধনুক ধরি পানি।
মারত শর বালাজন জানি।।
অতএ চলহ সখি ভিতর কুঞ্জ।
যাঁহা রহ হরি মহাবল পুঞ্জ।।

দূতীগুরুর শিক্ষায় দিনে দিনে ভয় ভাঙ্গিল। তাই গুরু 'এত কহি অনল ধনী হরিপাশ, পূরল বল্লভ সুখ অভিলাস।' লজ্জা সংকোচ, ভয় তরাসের বাঁধ আজ টুটিয়া গেল। কিন্তু হায়! একি হইল? এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া মুখ ভার করিয়া রাধিকা গৃহে ফিরিলেন। দূতী এই মিলন ঘটাইয়া দিয়া প্রত্যক্ষভাবে আজ হইতে বিদায় হইল। কারণ সে বুঝিয়াছে যিনি মিলনের

আস্বাদ পাইয়াছেন তিনি আপনার পথ এখন হইতে আপনি চিনিয়া লইতে পারিবেন।

ইহার পর কিছুদিন গেল। রাধিকার গৃহবাস এখন কঠোর হইয়া উঠিল। নূতন অনুরাগে নূতন প্রেমে দীক্ষিতা নারী সংসারের কাজ সারিয়া চুপেচুপে প্রিয়মিলনে বাহির হইলেন—

নব অনুরাগিনী রাধা।
কিছু নহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পথ বিপথ নহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচকুচ মানয় ভার॥
কর সঞে কঙ্কন *মুদরি (*অঙ্গুরী)
পহুহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারল বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥

সেখানে গিয়া দেখিলেন মাধব পূর্বনির্দেশমতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কাল-বিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার নিকটেই আসিলেন। তখন—

কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
ভোপ সময়ে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুমই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে॥

অতঃপর মিলন। কবি নিঃসঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

সখী পরবোধি শয়নতলে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পানি॥
চুঁইতে বালি মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি॥

নহি নহি কহ নয়ন ঝর লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর ॥...
আঁচল লই বদন পর ঝাঁপে।
থির নহি হোয়ত থর থর কাঁপে ॥

এ মিলনে মাধবের তৃপ্তি হইল না। তিনি অভিযোগ করিতে লাগিলেন—

...সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
করইতে কোরে মড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র ন শুনয়ে জনু বাল ভুজঙ্গ ॥...
ভণই বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রস সাগর মুগুধিনী নারী ॥

এই নির্দয় মাধবের হাত হইতে রাধা কোনপ্রকারে বাঁচিয়া গেলেন। পীড়িতা হইয়াছেন তিনি সত্য, কষ্টও পাইয়াছেন কম নয়; কিন্তু মনের ভিতরে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। তাই সখীরা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যেহো করল সোই নাগর রাজ ॥
পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ।
দুতী মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরথর কাঁপ।
সোই লুবুধমতি তাহে করু ঝাঁপ ॥
চেতনা হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলি ॥
হঠকরি নাহ কয়ল যত কাজ।
সে কি কহব ইহ সখিনী সমাজ ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সে ধনি যে থির তাহে নেহারি ॥

আর একদিনের কথা। সখীরা জিজ্ঞাসা করিলে রাধা অকপটে বলিয়া গেলেন। এবার তাহা স্বীকার করিতেই তাঁহার আনন্দ। তাই তিনি বলিতেছেন আর মিটি মিটি হাসিতেছেন।

কি কহব হে সখী আজুক বিচার।
সে সুপুরুখ মোহে কয়ল শিঙ্গার॥
হসি হসি পহু আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥
যব নীবিবন্ধ খসাওল কান।
তোহর শপথ হাম কিছু যদি জান॥

এই শেষের কথাটিতে দেখিতেছি শুধু রাধিকা নন, রসিক কবিও একটু খানি মুচকি হাসি হাসিয়া লইলেন। আর সখীরা তাঁহার আনন্দে কেহ বা আনন্দিত হইলেন, কেহ বা দুঃখে ক্ষোভে ঈর্ষান্বিতা হইলেন।

তখন হইতে আর কোন পক্ষের কোন সঙ্কোচ নাই। সব কিছু গতানুগতিক ও নিয়মিত হইয়া গিয়াছে। নিত্যই এমনি হয়। এমন সময় 'আওল ঋতুপতি রাজবসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ।' সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি নূতন রূপ ধারণ করিলেন। তরুশাখায় নূতন পাতা গজাইয়া উঠিল, ফুলে ফলে পত্রে পুষ্পে চারিদিক শ্যামল হইয়া উঠিল। মানুষের মনেও নব বসন্তের জোয়ার জাগিল। চারিদিকে আনন্দের সমারোহ। রাধা মাধব সেই বসন্ত হিল্লোলে নূতন করিয়া তাঁহাদের পুরাতন বীণায় সুর সংযোজন করিলেন। এবারের সুরও হইল বড় মধুময়। আর সেই সুরে তাঁহাদের শত বান্ধবী তান ধরিলেন। শত কিন্নরীকণ্ঠে সারা বৃন্দাবন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তাই —

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ।
নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল।
মাতল নব অলিকুল।
বিহরই নবল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জবন শোভন।
নব নব প্রেম বিভোর॥
নবল রসাল মুকুল মধুমাতি।
নব কোকিল কুল গায়॥
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই।
নব রসে কাননে ধায়॥

নব যুবরাজ নবল নব নাগরী।
মিলয়ে নব নব ভাঁতি॥
নিতি নিতি ঐসন নব নব খেলন।
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

এই আনন্দবন্যার সঙ্গে বসন্ত বিহারের আর একটি গীত জুড়িয়া না দিলে ইহার পূর্ণতা উপলব্ধি করা যাইবে না।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতিভঙ্গ।
মধুর নটনী নটরঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

বসন্তের এত অবিমিশ্র আনন্দের পর সখীরা তাঁহাদের দুইজনকে রাখিয়া ধীরে ধীরে বিদায় লইলেন। আনন্দের আবেগ এখন কমিয়া গিয়াছে। দুইজনে নিরালা বসিয়া মাঝে মধ্যে কখনও একটু রসালাপ, কখনও একটু হাসি, আর কখনও একটু কৌতুক—এক্ষণে তাহাই চলিতেছে।

যে নায়ক নায়িকাকে লইয়া বিরাট আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতারণা করিবেন, কবি তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্যের চিত্র আঁকিয়া একেবারে সর্বকালীন সর্বমানবের পরিচিত রীতিতে তাঁহাদের মিলন কাহিনীর বর্ণনা দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পাঠককে ও রাধা-মাধবের সখী-বৃন্দকে অসীম আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়া সেখান হইতে রাধামাধবকে লইয়া নিভৃতে সরিয়া পড়িলেন। অতি কৌশলে সকলকে দূরে সরাইবার পর রাধিকাকেও তাঁহার বল্লভ হইতে দূরে লইয়া গেলেন।

ইহার পর মাধবের সঙ্গে তাঁহার আর তেমন দেখা হয় না। মাধব ক্বচিৎ এখানে অভিসারের নির্দেশ দেন, রাধিকাও প্রিয়মিলনের আশায় অপরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া হৃদয়াবেগে পথবিপথ না মানিয়া সেখানেই অভিসার করেন। গুরুজনের বাধাকে তিনি আজ জয় করিতে পারিয়াছেন। তাহাদের চোখে ধূলি দিয়া সন্তর্পণে চলিতেছেন—

গুরুজন নয়ন পসার পবন জওো।
সুন্দরী সতরি চললি।...
কি আরে নবি অভিসারক রীতি।
কে জাবে কওন বিধি কামে পঢ়াউলি॥
কামিনী ত্রিভুয়ন জিতি॥
অম্বর সকল বিভূষণ সুন্দর
ঘনতর তিমির সামরী॥
কেহু কভহু পথ লখহি ন পারলি
জনি মসি ডুবলি ভমরী॥

গভীর রাত্রি। ঘোর অন্ধকার। চিন্তা করিবার অবসর নাই। মাধবের নির্দেশ— তাঁহাকে যাইতেই হইবে। পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেখানে ফিরিয়া আসিলেন।

রজনী কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পড়য় দুরবার।।
গরজ তরজ মন রোষে বরিষ ঘন
সংশয় পড় অভিসার।।
সজনি বচন ছড়ইতে মোহি লাজ।।
যে হোয়ত সে বরু হোয়ও সবে হমে অঙ্গিকরু
সাহসে মন দেল আজ।।...
চরণ বেধিল ফণী হিত-কয় মানল ধনী
নেপুর না করএ রোল॥

সুমুখি পুছঞো তোহি স্বরূপ কহসি মোহি
সিনেহ কতদূর ওল ।।

অন্ধকার রাত্রি। যখন জলধারায় সেই অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। অবিরত জলধারায় হৃদয়ের আকর্ষণ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। মাধবকে না দেখিলে তাঁহার সঙ্গে মিলিত না হইলে তাঁহার চলিবে না। যেমন করিয়াই হউক, তাঁহাকে যাইতে হইবে।

ঝর ঝর বরিষ সঘন জলধার।
দশ দিশ সবহু ভেল আঁধিয়ার ।।
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনু বারএ হরি অভিসার ॥
কৈসনে সঙ্কেত বঞ্চব কান।
সুমরই জর জর অথির পরাণ ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান ।।
ঘর মাহ রহত রহই না পার।
কি কব্বব ই সব বিধিন বিথার ।।
চঢ়ব মনরথ সারথি কাম।
তোরিত মিলায়ব নাগর ধাম ।।

ক্রমেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা গভীর হইতেছে। সে ব্যাকুলতা বাড়াইয়া তুলিতেছে নিদারুণ প্রকৃতি। এই পদটিতে অপরূপ ধ্বনিব্যঞ্জনাময় শব্দ প্রয়োগ করিয়া কবি প্রকৃতির দারুণ দুর্যোগময় রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আকাশ ঘন মেঘে আবৃত। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ঘন ঘন অশনিপাত হইতেছে। সমগ্র ভূখণ্ড আলোড়িত করিয়া বাতাস উঠিয়াছে। ওধারে বিদ্যুৎ এধারে ঝড়। দুইয়ে মিলিয়া যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়াছে। এমন দিনে রাধিকার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে। তাহার পক্ষে বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়াছে—কারণ কানু নির্দেশ দিয়া সঙ্কেতকুঞ্জে চলিয়া গিয়াছেন। এই বৃষ্টি বাদলের দিনে তাঁহার কি উপায় হইবে? ঘন দুর্যোগে কোথায় কোন দূর বনে দাঁড়াইয়া তিনি একা একা রাধিকার পথ চাহিয়া রহিবেন। একথা স্মরণ করিতে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই।।
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কন্ত হমরি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘনঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরই মোর॥
সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি
অথির থর থর কাঁপ।
ই মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ।।
তোহিতে চলঅব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার।
কবি শেখর বচনে অভিসার
কিয়ে সে বিঘিন বিথার।।

কানুর জন্য বর্ষাগভীর রাত্রে শ্রীরাধা-হৃদয়ের যে আর্তি ধ্বনিত হইয়াছে বিদ্যাপতির লেখনীতে তাহাই অনবদ্য ধ্বনি সংক্রমকে ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রেমগর্বে গরবিনী আত্মহারা পাগলিনী রাধিকার অভিসার বর্ণনায় কবি যেমন একদিকে আত্মবিহ্বল অন্যদিকে তেমনি সুচিন্তিত এবং সযত্ন-সন্নিবিষ্ট শব্দ প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ। ইহাকেই বলা যায়—"The gorgeous imagery of Vidyapati and the majestic faces of his musie might, o n occasions, tends to sweep you off your feet, but the poet would never lose his. It is not of many that this could very well be said." ইহা যে কতখানি সত্য, তাহা ছন্দোস্রোত বজায় রাখিয়া যথার্থ আবৃত্তি বা পাঠের দ্বারা ধরিতে না পারিলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাপতি কাব্যের যথাযথ আবৃত্তিই উক্ত কাব্যের সঙ্গীতপ্রাণ ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকে।

যাহা হউক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিক্রম করিয়া নদীনালা পার হইয়া আসিয়া যমুনার অপর পারে যখন রাধিকা মাধবের সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য মিলিত হইলেন তখন তাঁহার মনে অনেক কথা, বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলেন না। শুধু জানাইলেন, 'হে মাধব তোমার সঙ্গে সব সময়েই মিলিত হইবার ইচ্ছা, কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না, কেননা—

পূরল পুর পুরজন পিসুনে
যামিনী আধ আঁধার।
বাহুতরি, হরি! পলটি যাএব
পুনু যমুনা পার॥

আর বলিতে পারিলেন না। যে রুদ্ধ আবেগ মাধবকে সাক্ষাতে পাইয়া উথলাইয়া উঠিতে চাহে তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিলেন না, কিন্তু শঙ্কিত হৃদয়ের ভাষা একটি কথাতেই গুমরিয়া উঠিয়া তাঁহার মর্মন্তুদ অসহায় অবস্থা জানাইয়া গেল—

একূলে কূলকলঙ্ক ডরাইঅ
ওকূলে আরতি ডোরি।

ইহা যেন 'ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যা বেলায় কে ডেকে নেয় তারে?' এহেন অবস্থায় 'আমি যে আজ সঙ্কটাপন্ন আমার আশ্রয় কোথায়?' চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। সেই অশ্রুজলই নির্বাক ধৈর্যে বলিয়া গেল—

জগতে কত না যুব যুবতী কত না লাবএ প্রেম

তবে আমার বেলায় কেন এ অপবাদ? তাই যাইবার কালে রাধা মাধবের কাছে শুধু একটি প্রার্থনাই করিয়া গেলেন। বহুদিন পরে যদি আবার দেখা হয় তবে

গোচর এক মোর পএ রাখবি, রাখবি দুঅও লাজ।
কবহু মুখ মলান না করবি হোয়ত পুনু সমাজ।

কারণ আমার মন যাহাই বলুক না কেন, তোমার মুখে বিষাদের ছায়া আমি দেখিতে পারিব না, তাহা হইলে দুঃখভারগ্রস্ত আমার এ হৃদয় আরও ব্যথিত হইবে।

এখন হইতে দেখি মাধব কেন যেন অহেতুক শক্ত হইয়া উঠিতেছেন। শুধু শক্ত নন, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই রাধিকাকে ভুলিতে বসিয়াছেন।

হৃদয় হরণ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছেন। আর আমাদের মনে পড়িতেছে 'men love for a while, but women love longest.' এখন তিনি তাঁহার সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেন না। বহু অনুসন্ধানের পর একদিন রাধিকা তাঁহাকে ধরিলেন, কিন্তু মাধব কিছুতেই তাহার কথা শুনিবেন না; না শোনার কারণস্বরূপ একটা দোষও তাঁহার চরিত্রে আরোপ করিলেন। রাধিকা বিমূঢ় হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

এতদিন ছল পিয়া তোহ হামে যেহে হিয়া
শীতল শীল কলাপে।
তোহে ন কানধরু, বিনতি দূর করু
দুরজন দুরিত অলাপে॥

মাধব মুখ ফিরাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। তখন বাধ্য হইয়া অসহায়া রাধিকা রমণীসুলভ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না।

তোহ-হাম পেম যত দুরে উপজল, সুমরবি সে পরিপাটী।
আগে পর-রমণী রঙ্গরস ভুললাহে কওনে কলা হম যাটী?

কিছুতেই যখন কিছু হইল না তখন ক্রোধ-কম্পিতা স্বরে বলিলেন—

পুরুষ-হৃদয় জল দুঅও সহজে চল,
অনুবন্ধে বাঁধ থিরাই।
সে যদি ফুটল রহ সহস ধারে বহ।
উচেও নীচ পথে ধাই॥

ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ও গ্লানিতে পড়িয়া রাধিকা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শয্যা লইলেন—আর উঠিলেন না। মনে করিলেন 'সংসারকেই ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিব।' কিন্তু তাহা হইল কোথায়? তাই বিরহের সূচনা হইল।

করতল কমল নয়ন ঢর নীর।
ন চেতয় সভরণ কুন্তল চীর॥
তুয় পথ হেরি হেরি চিত নহি থির।
সুমরে পুরুব নেহা দগধ শরীর॥

তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া আমাদের বহুদিনবিস্মৃত সেই দূতীগুরু আবার

ফিরিয়া আসিয়া মিলনের ভার লইয়া মাধবকে গিয়া বলিল—

কতে পরি মাধব সাধব মান।
বিরহী যুবতী মাগ দরশন দান॥

দূতীর বাক্যে মাধব চুপ করিয়া রহিলেন। রাগ করিয়া তাই দূতী বলিল,—

'রসিকক সরবস নাগরী বাণী।
ভল পরিহর ন আদরি আনি॥

আরও বলিলেন,—

মাধব করিয় সুমুখি সমধানে।
তুয় অভিসার কয়ল যত সুন্দরী
কামিনী করয়ে কে আনে॥
বরিষ পয়োধর ধরণী বারিভর
রয়নী মহাভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনী তুয় গুণ মনে গুণি
তসু সাহস নহি সীমা॥...
নিজ পহু পরিহরি সঁতরি বিথম নরি
অঁগিরি মহাকুল গারি।
তুয় অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুণল বরনারী॥

'যে তোমার জন্য এত করিল তাহার প্রতিদান কি তুমি দিবে না?' দূতীর কথায় চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া মাধব মন ফিরাইলেন। 'গিরিসম গরুয়' মান পরিত্যাগ করিয়া রাধার সঙ্গে মিলিলেন। কিন্তু তাহা অত্যল্পকালের জন্য। যেই দূতী চলিয়া গেল অমনি মাধব শ্রীমতীকে 'পড়া পুথি সম' ফেলিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। রাধা হৃদয়ের দুঃখ বাড়িয়া চলিল। সুফী কাব্যে যেমন বৈষ্ণব কাব্যেও তেমনি দুঃখের সাধনাই বড় সাধনা। দুঃখই মানুষের সত্যকারের স্বরূপ পরিস্ফুট করে। অন্তরের খাঁটি জিনিস দুঃখের হাপরে গলিয়া নিকষিত হেমরূপে বাহির হইয়া আসে। মানুষ সংসারের মধ্যে থাকিয়া স্রষ্টার ডাকে সাড়া দেয়, তাঁহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়; তখন সংসার তাহার কাছে অরণ্য বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় সব মিথ্যা, সব মায়া; আর প্রাণ তখন বলিতে থাকে—

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতদিনে ঘুচব গরুয় দুখভার॥
কতদিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কতদিনে ভ্রমরা কমলে করুকেলি॥
কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহু পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কতদিনে করে ধরি বইসাওব কোর।
কতদিনে মনোরথ পূরব মোর॥

বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে বিরহের গূঢ় অর্থ ইহাই। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যখন সব কিছু কানায় কানায় পরিপূর্ণ, যখন ভরা ভাদরে কানায় কানায় ভরা নদী কুলু কুলু করিয়া বহিয়া যায়, মাঝে মাঝে যখন সন্ধ্যার অন্ধকারকে গাঢ় করিয়া আকাশে মেঘ তাহার পক্ষচ্ছায়া বিস্তৃত করিয়া দেয়, ঝড়ঝঞ্ঝা যখন ধূলিবালি উড়াইয়া পথিককে বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি' যখন গর্জন করিতে থাকে, যখন একটা স্নিগ্ধ সজল আবহাওয়া চারিদিকে তাহার শীতলতা ছড়াইতে থাকে, আর মেঘমেদুর বর্ষাকাল উপর হইতে অবিরল ধারায় বর্ষণমুখর হইয়া উঠে, তখন প্রোষিতভর্তৃকা রাধিকা-হৃদয়ও তাঁহার কোন সুদূরের প্রিয়ের আশায় উতরোল হইয়া উঠে। এমন দিনে মন মন্দির শূন্য না হইয়া ত পারে না! চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে। বহু পূর্বে উজ্জয়িনী রাজসভার মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
——কিংপুনর্দূর সংস্থে।

কালিদাস যে কথাটি শুধু একটা দীর্ঘ তপ্তশ্বাসের সাহায্যে সারিয়া দিয়াছেন, বিদ্যাপতির বহু বিশ্রুত পদে সেই চিরকালের কথাটি রাধিকা হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া একেবারে বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—

সখি হে হমর দুখক নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া ॥
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া ॥

রাধিকার সেই অকৃত্রিম মর্মন্তুদ দুঃখজ্বালায় সহানুভূতি দেখাইবার জন্য কবি অমনি বলিয়া উঠিলেন,— তোমার যখন এই অবস্থা তখন—

কৈসে গমাওবি
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥

ইহার পর রাধিকা আর আত্মস্থ হন নাই। বিরহের দশম দশার নিকটবর্তী হইয়া অজ্ঞানে শুধু হরি হরি স্মরণ করিয়াছেন—

অনুখন মাধব মাধব সুমরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল
অপন গুন লুবধাই ॥
মাধব অপরূপ তোহর সিনেহ।
অপন বিরহে অপন তনু জর জর
জীবইতে ভেলি সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধা আধা বাণী ॥
রাধা সঞো যব পুনতহি মাধব
মাধব সঞো যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥
দুহু দিশ দারু দহনে যৈসে দগধই
আকুল কীট পরাণ।

ঐসন বল্লভ হেরি সুধা মুখি
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ;

এই দুর্লভ বল্লভ-বিরহই রাধিকার আধ্যাত্মিকতার পথকে উন্মেষিত করিয়া দিল। ইহা একেবারে সমাধির অবস্থা,—দ্বৈতভাবের পরিবর্তে অদ্বৈতভাব। বৈদান্তিক দর্শনের সত্য বৈষ্ণব অনুভূতিতে এমনিভাবে ধরা দিয়াছে।

ইহার সঙ্গে সুফী কবির চিরবাঞ্ছিতের সহিত অবিচ্ছিন্ন মিলনের একাত্মতা জনিত মধুময় অনুভূতির তুলনা করা যাইতে পারে। আমীর খসরুর কথায় তাহা ঃ—

"মন্ তু শোম্ তু জান শুদী
তা কস্ না গোয়েদ বা'দ আযী
মন্ দিগরম্ তু দিগরী।
আমি তুমি হলেম, তুমি আমি হ'লে
আমি হলেম দেহ, তুমি হ'লে আত্মা ;
এর পর আর কেউ বলতে পারবে না
আমি একজন আর তুমি একজন।

এতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানব মানবীর অবস্থা বর্ণনের ভিতর দিয়া বিদ্যাপতির কাব্য পথ বাহিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু এইখানে আসিয়া মানবিকতা শেষ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র কাব্য অংশ হইতে ইহার পরের 'ভাব সম্মিলন' সর্গের দুই একটি পদ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পড়িলে সেখানে হয়ত অশ্লীলতার কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটির পর একটি স্তর ডিঙ্গাইয়া 'ভাব সম্মিলনে' পৌঁছিলে অশ্লীলতার ও নীতির প্রশ্ন মনেই ওঠে না। রাধিকার দেহদানের নিঃসঙ্কোচ আত্মোক্তি ও সাজসজ্জার সমারোহের মধ্যে কোথাও যেন উন্মাদনা বা কামবহ্নির জ্বালা আর দেখা যায় না। সবই যেন প্রশান্ত, একটা সুন্দর অমলিন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাই এতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, অভিসার ও মিলনের মধ্যে পার্থিব নায়ক নায়িকার দাম্পত্য বা অনুরূপ জীবনের যে প্রকাশ্য জীবন্ত ছবি দেখিয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে সুস্থ মানবজীবনের একটা স্বাভাবিক ক্রমই লক্ষ্য করা যায়। মনুষ্যদেহ বিগলিত 'বেদ্যান্তর-স্পর্শ' যে রস, কবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের যৌবনলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া সম্ভোগের মধ্যেই তাহাকে ধরিতে চাহিয়াছেন। এযাবৎ

যৌবন লীলার যে চাপল্য, যে প্রাণোন্মাদকর আত্মরতির প্রাধান্য, যে তুমুল ঝড়ঝঞ্ঝার ঘনঘটা, যৌবন বেদনারসের উচ্ছলতার যে লীলায়িত বর্ণনা আমরা পাইয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে যে কম্পন ও আনন্দ-আবেশ ইত্যাদির কথা আছে তাহাও বিদ্যাপতির হাতে পড়িয়া আধ্যাত্মিকতার পূর্বতটে নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির এই গানগুলিতে ভাষা, ছন্দ, শ্লেষ, অলঙ্কার ও অনুপ্রাসের জাঁকজমকে রাধামাধবের কেলি-কোলাহলের যে রূপ আমরা পাই তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য: "বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটা সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, কেশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি; কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কতছন্দে কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তরদেশে যে গভীরতা, যে নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।" রবীন্দ্রনাথের এই মনোমুগ্ধকর রসালোচনা বিদ্যাপতির গানগুলির সম্বন্ধে এই স্তর পর্যন্ত অপরূপভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ইহার পর ভাব সম্মিলনে ও প্রার্থনায় ইহা আর খাটে না।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া ব্রজধামে আর ফিরিয়া আসেন নাই। এখানেই তাঁহার বৃন্দাবনলীলার চিরসমাপ্তি ঘটিয়াছে। বিরহের পর মিলন-বর্ণনামূলক যে সকল পদ বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই তাহা প্রকৃত দৈহিক মিলনের নহে। বিরহের পূর্বে সেই যে মাধব রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তখন হইতে রাধা-মাধবে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। রাধা তাই বিরহের অবস্থায় কল্পনার আতিশয্যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন— মাধব আবার ফিরিয়াছেন, আবার তাঁহাদের মিলন ঘটিয়াছে। সেই মিলনে কত আনন্দ! ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভাবসম্মিলন বা বিরহের অবস্থায় ভাবনার ভিতর দিয়া প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এ মিলন তাই উত্তাপহীন; একটা স্নিগ্ধ ও শান্ত আবহাওয়াই আমরা এ মিলনে অনুভব করি। তাই এ মিলন এত মধুর, এত সুন্দর। তাই যখন সখীকে রাধার স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিতে শুনি তখন বুঝিতে

পারি এ মিলন কোন্ ছন্দে গাঁথা ঃ—

সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে।
অনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে ॥
ন দেখিয় ধনুগুণ ন দেখিয় সন্ধানে।
চৌদিশ পরএ কুসুম শর বাণে ॥

এতদিন পরে রাধার সঙ্গে চক্ষু মিলাইয়া আমরাও মদনের ধনুক, গুণ অথবা সন্ধান কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। মদন এখন হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট।

বঙ্ক বিলোকন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগোল জনি সমুদ্র হিলোরা ॥
উঠলি চেহাই আলিঙ্গন বেরি।
রহলি লজ্জাএ স্থনি সেজ হেরি ॥

বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত করিয়া স্বপ্নলব্ধ মাধবকে যেই আলিঙ্গন করিতে গেলেন অমনি শূন্যশয্যা দেখিয়া রাধা আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন।

রাধা স্বপ্নাবস্থায় ভাবনা করিতেছেন তাঁহার প্রিয় যখন তাঁহার গৃহে আসিবেন তখন তাঁহাকে বরণ করিতে গিয়া যত কিছু মঙ্গলাচার তাঁহার দেহের উপরেই সম্পন্ন করিবেন। আপন আত্মার পর আপন দেহ ছাড়া তো মানুষের আপনার আর কিছু হইতে পারে না। তাই যখন পূর্বাহ্নেই তিনি আত্মদান করিয়া বসিয়া আছেন তখন তাঁহার দেহও বিদেহ হইয়া গিয়াছে। ইহারই পূর্বে আমরা দেখিয়াছি মদন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধার এই যে দেহসজ্জা ইহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যে কাম তাহা হইতে উপজিত হয় নাই। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিতে বিহ্বল হইয়া অবশ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে আনন্দ আছে ইহা তাহাই। আপন বলিতে তাঁহার আর কিছুই নাই—কৃষ্ণের সুখই তাঁহার সুখ। সুতরাং কৃষ্ণ যদি সুখী হন তবে তাঁহাকে সুখী দেখিয়াও তিনি মরিতে পারিবেন। কারণ এই দেহদান ও তদহেতু দেহের উপরেই বাসরশয্যা নির্মাণ ইহা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি হইতে জাত। তাই যখন রাধিকাকে বলিতে শুনি —

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যত হুঁ করব নিজ দেহে ॥

কনয়া কুম্ভ করি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হম গরুয় নিতম্ব।
আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিনী সুঝম্প॥
নিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিকে পশারব চাঁদক হাট॥

দেহের উপর বাসরশয্যা নির্মিত যখন হইল তখন মধুলোভী ভ্রমর মাধব নিশ্চয় তাঁহার অঙ্গনে আসিবেন। তিনি আসিলে রাধা কি করিবেন? না—

পলটী চলব হম ঈষত হসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হম যতন বহু করবে॥...
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ মোড়ি বিহুসি বোলব নহি নহি॥
সুহজহি সুপুরুখ ভোমরা।
মুখ কমল মধু পিয়ব হমরা॥
তৈখন হরব মোর গেয়ানে।

এর উত্তরে

বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয় ধেয়ানে।

এবারের স্বপ্নে কল্পনা নয়, রাধা একেবারে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—মাধব আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে মিলন হইয়াছে। তাই নিজের সৌভাগ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা বাষ্পাকুল।—

আজু রজনী হাম ভাগে গমাওল
পেখল পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশদিক ভেল নিরনন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোঅ অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।।

বহু বিনিদ্র রজনী অপেক্ষা করার পর আজ তিনি প্রিয়মুখ দর্শন করিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত চাতকের বারিবিন্দু-পানের মত প্রিয়দর্শনে আনন্দবারি পান করিতেছেন। তাঁহার জীবন ও যৌবন আজ তাই ধন্য। এতদিন যে দীর্ঘ প্রত্যাশা বুকে পুষিয়া চারিদিকে অস্থিরচিত্তে চাহিয়া থাকিতেন সেই অস্থিরতা শান্ত হইয়াছে— আর চারিদিকের সন্দেহ দ্বন্দ্বহীন হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাঁহার বাড়ীঘর, তাঁহার দেহমন তাঁহারই একান্ত আপনার বলিয়া মনে হইতেছে। বিরহের দিনে দুঃখের বর্ষায় দুষ্ট কোকিল এত জায়গা থাকিতে ইচ্ছা করিয়া শুধু তাঁহাকেই জ্বালাইতে আসিত, চাঁদ উজ্জ্বল কিরণ ছড়াইয়া তাঁহারই জ্যোৎস্নাস্নাত আঙ্গিনা দিয়া নিত্য অভিসারে বাহির হইত, সঙ্গে বহিত মলয় পবন। রাধিকার মিলনের এই পূর্ণানন্দের দিনে তাহারা সব গেল কোথায়? সমস্ত জগৎ আসিয়া তাঁহার মিলনানন্দ দেখিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াক, মদন যত পারে বাণ নিক্ষেপ করুক, আর সেই দুষ্ট কোকিলটা তাহার শত সহস্র সঙ্গী লইয়া অনবরতঃ পিকরব করিতে থাকুক, পবনদেব তাঁহার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া মন্দ মলয়ানিল বহাইতে থাকুন, আর সেই মৃদু পবনহিল্লোলে তাঁহার অন্তর অহরহঃ দোল দিক। বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের এই কবিতাটিতে প্রকৃতি ও মানবমন ওতোপ্রেতভাবে জড়িত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের সেই দৃশ্যটি,— যেখানে বসন্তসেনা তাঁহার প্রাণবল্লভ চারুদত্তের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, বাহির হইতে তাঁহার মা ও আত্মীয় স্বজনেরা রাজার শ্যালককে বরণ করিবার জন্য তাঁহাকে নানাভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু বসন্তসেনা সকল অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া বিরহের আগুনে দগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার চারুদত্ত আসিলেন। তাঁহার আনন্দের আতিশয্য আজ দেখে কে! হৃদয়াবেগের চরম প্রকাশক্ষণে নৃত্যকুশলা বসন্তসেনার

হৃদয় প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিল চটুল নৃত্যের চপলভঙ্গী। আনন্দ প্রকাশ আজ ভাষায় নহে। তাঁহার ভাষা তো নৃত্য! তাঁহার আনন্দ ব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্য সম্মুখে যাহাকে পাইলেন তাহারই বাহু ধরিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতেই নাথের আগমনবার্তা জানাইলেন। হৃদয়াবেগের চরমোৎকর্ষ প্রকাশে আজ মাতা ভগিনী দাসী একাকার হইয়া গেল। অবশেষে তাঁহার আনন্দ ভাগ করিয়া লইবার জন্য প্রকৃতি নামিয়া আসিল। পায়রা উড়িল, ঝরণার জলে পরস্পর চঞ্চুসংলগ্ন হংসমিথুন পাখা ঝাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হরিণ শাবকের ছুটাছুটি, পাখীর কূজন, প্রিয়জনের কলহাস। বসন্তসেনার হৃদয় দুয়ার আজ খুলিয়া গিয়াছে। তাই তিনি নৃত্যচঞ্চল। তাঁহার আনন্দে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে প্রকৃতিও বাকমুখর। রাধিকা হৃদয়ের আনন্দোন্মত্ততার সঙ্গে প্রকৃতিও অনুরূপ ঝঙ্কার তুলুক, বিদ্যাপতির এই পদে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

রাধার এত দিনের দুঃখ এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল—

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দুরে গেল॥

আজিকার আনন্দ শুধু অনুভূতিসাপেক্ষ, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভাষা তাই আনন্দের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় রাধিকা মাধবের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া স্মিত হাসিয়া মাধবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥

দেখ মাধব, মানুষ হাতে দর্পণ লইয়া যেমন নিজের মুখ দেখে আমি দর্পণ ভাবিয়া তোমাকে হাতে হাতে রাখি, আর তোমাতেই আমি দেখি আমার মুখ; মেয়েরা সুন্দর একটী ফুল দেখিলে অতি যত্নে যেমন সেটিকে আপন

মাথার খোঁপায় তুলিয়া রাখে, আমিও তেমনি তোমাকে আমার খোঁপার ফুল করিয়া রাখিয়াছি। চোখ না থাকিলে আমাদের চলে না; সেই চোখের একটি অলঙ্কারই আছে, সেটি কাজল। আমার চোখের জ্যোতি উজ্জ্বল করিতে আর চোখের সৌন্দর্য বিধান করিতে তোমাকে আমি কাজল করিয়া রাখি। পান খাইয়া মানুষ মুখ লাল করে, সেই পান মানুষের মুখের সৌন্দর্য বাড়াইয়া তোলে। আমার তো সৌন্দর্য নাই, আমি তোমার রূপেই রূপসী, তাই তোমাকে আমার মুখের পানরূপে দেখি। বুকের উপর মৃগচন্দন লেপিলে তার মনোমুগ্ধকর গন্ধে বুকের শোভা আপনি বাড়িয়া উঠে, তুমি আমার বুকের সেই কস্তুরি। গলায় হার পরিলে তবে তার আলোকে গলা হয় শোভিত, সুতরাং তুমি আমার সেই গলার হার। আর কি বলিব বল? তুমি আমার সর্বস্ব! আমার গৃহের মণিশ্রেষ্ঠ, গৃহকর্তা। আর কি বলিলে তাঁহাকে আপন হইতেও আপন করিয়া বলা যায়, রাধা ভাবিয়া না পাইয়া শেষে বলিলেন— বঁধু, আমি পাখী, আর তুমি সেই পাখীর পাখা। না, আমি মীন (মাছ) আর তুমি আমার জীবনাধার পানি। এবারে বুঝিলে তো? যদি না বুঝিয়া থাক, আচ্ছা শোন তবে, জীবের যেমন জীবন, তুমি আমার সেই জীবন। তুমি কাছে থাকিলে আমি জীবিত, তুমি দূরে গেলেই আমার মৃত্যু। প্রিয় বন্ধু মাধব! তোমাকে আমি এত ভালবাসি, আমার মাথার দিব্যি দিতেছি, তোমাকে বলিতেই হইবে 'তুহু' কৈসে মাধব, কহ তুহু' মোয়'। নির্দয় মাধব আর কি বলিবেন! এযাবৎ একটি কথাও তো বলেন নাই! তাই সহানুভূতিশীল কবি দুঃখের আঁখিজলে লেখনীকে সিক্ত করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠের মত বলিলেন, রাধা! তুমি বুঝিতে পার না, তোমরা উভয়েই উভয়ের নিকটে একইরূপে প্রতীয়মান।

এই পদটির সহিত সাধক কবি আমীর খসরুর নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলনীয়ঃ

আমি যদি হোতাম তুমি, তুমি হ'তে মোর প্রেমিক
আমার খোঁজে দিবস রাতি মরতে ঘুরে দিগ্বিদিক।
তোমায় ভুলে আমি যদি যেতাম ঘৃণা উপেক্ষায়
বলো দেখি সত্যি ক'রে—আমায় কিবা বলতে ঠিক? *

* ফজলুর রহমান কৃত অনুবাদ।

ব্যক্তিগত অনুভূতির, একাত্মতার ও অদ্বৈত ভাবদ্যোতক অনুপম সৃষ্টি এই পদটি। একদিকে আনন্দবন্যা, অন্যদিকে চোখের পানি। এই দুইএর মিলনে ভাষা আর চলিতে পারিল না। তাই মানুষের চরমোপলব্ধির ভাষা সুরহীন হইয়া বিদ্যাপতির লেখনীতে শুধু ছোট ছোট কথায় ধরা দিল। কিন্তু ইহার পর রাধার কোন্ অবস্থা দেখিতেছি? সখী জিজ্ঞাসা করিলেন, এত আনন্দানুভূতি তোমার কোথা হইতে আসিল? রাধা কোন উত্তর দিলেন না। ভাবসম্মিলনে পৌঁছিবার সময়ে মানবিকতার শেষ যে চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল তাহাও এতদূরে আসিতে আসিতে শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই ধরাশায়ী ভূমিলীন দেহ হইতে যে আত্মা বাহির হইয়া গিয়াছে তাহাই যেন দূর দিগন্ত হইতে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া রাধা নামের কোন মানবীর ভাষায় জগৎ প্লাবিত করিয়া তান ধরিয়াছে,—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল॥
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ল ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক॥ *

বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি আলোকোদ্ভাসিত মানবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া যখন আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে তখন সাধারণ মর্ত্যমানুষ চমকিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। 'সেই পরমাত্মার সঙ্গে পার্থিব আত্মার

* পাঠান্তরে কহ কবিবল্লভ।

অনাদি কালের বিরহমিলন এবং ঐ যে প্রেমময় পরমাত্মা (কৃষ্ণ)-ময় জগৎ যাহার প্রাণোন্মাদকর আকর্ষণে অবশ আত্মবিস্মরণ এবং তাহার পরেও অতৃপ্তি ভরা দীর্ঘশ্বাস ও গভীর হাহাকার, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট রোমান্টিকতার (romanticism) লক্ষণাক্রান্ত।' 'যে দুর্জ্ঞেয় উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়রস জগৎকে ও জীবনকে মনোহর করিয়া তোলে ইউরোপীয় romantic কাব্য কল্পনায় তাহারই অপূর্ব উৎসার দেখিতে পাওয়া যায়।' বিদ্যাপতির এই romanticism ইউরোপীয় লক্ষণাক্রান্ত নহে, তাহা ভারতীয় মিষ্টিক (mystic) অনুভূতির পর্যায়ভুক্ত। 'এই পদটিতে বৈষ্ণব প্রেম সাধনার মনোরম অতৃপ্তিজনিত পাওয়ারই আকুলতা আছে। প্রাণ যেন পাইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না— 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ তইও হিয় জুড়ল ন গেল।' ইহা খাঁটি mystic রসানুভূতির পরিচয় বহন করিতেছে।' *

একান্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এবং এমন তীব্র ও সুস্পষ্ট আত্মরতি চরিতার্থতার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়া দেহাতীত রূপরসধারার দিব্যমূর্তি এমন সুন্দরভাবে আর কোথাও ফুটিয়াছে কি না জানি না। বিদ্যাপতির এই গান দেহগত ভোগলালসার গান নয়। ইহা ভাবলোকের দেবলোকের গান। বিদ্যাপতি এই ভাব প্রকাশ করিতে যে রূপক ও উপমা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সর্বকালের সর্বমানবের কাছে এত পরিচিত যে, ইহা ব্যাখ্যা করিতে বা বুঝিয়া লইতে কোন বেগ পাইতে হয় না।

বিদ্যাপতি কাব্যের ক্রমবিকাশ এই ভাবসম্মিলনে পৌঁছিয়াই পরিণতি লাভ করিয়াছে। কবি স্বভাবভীরু হরিণ শিশুর ন্যায় যে বালিকার মানবাত্মাকে লইয়া তাঁহার কাব্যহারে প্রথম ফুল গাঁথিয়াছিলেন তাঁহাকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করিয়া, কত দুঃখসুখের লক্ষ ধারায় সিক্ত করিয়া, কত দুস্তর ও দুর্লঙ্ঘ্য পথ ডিঙাইয়া আনন্দের সাগর সঙ্গমে আনিয়া পৌঁছাইয়াছেন। কবি বিদ্যাপতির জীবনদর্শন এমনভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা মাধবের লীলা বর্ণনা করিয়াই আপনাদিগকে যশস্বী করিয়াছেন কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কথা ছাড়িয়া দিলে অন্য কোন কবি সেই বাঁধাধরা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র জীবনের বিবর্তন দেখাইতে পারেন নাই। সুখ

* মোহিতলাল মজুমদার : কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য (১ম খণ্ড), পৃ ৪-৮

দুঃখ বাধা বিপত্তি আছে বলিয়াই তো জীবন। যশোশিখরে আরোহণ করিতে গেলে তাহা একদিনে হয় না। সাধনার দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা, আত্মশক্তির সাহায্যে মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছিয়া থাকে। বিদ্যাপতি এই সত্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। জীবনব্যাপী সাধনার এমন একটি পথ তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন যে পথে যুগ যুগ ধরিয়া আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠ মানুষ বিচরণ করিয়া আসিয়াছে। তাই বিদ্যাপতির কাব্যে দেখি— যে শক্তি মানুষকে পদে পদে দিক ভুলায় তাহার সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে রত হইয়া তাহাকে পরাজিত করিবার পথে যে রূপরস চতুর্দিকে উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিল, মর্ত্যমানুষকে তাহার ফল ভোগ করিতে দিয়া যে শক্তি অনন্তকাল ধরিয়া অমৃতলোকের অনাস্বাদিতপূর্ব রস অমৃতপুত্রদের জন্য ছড়াইয়া গেল 'বিদায়কালে কবির কাব্যলক্ষ্মী অতি সন্তর্পণে নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিয়াছে।' এইজন্য কবি বিদ্যাপতিকে চিরন্তন মানবাত্মার কবি বলিয়াছি। এইজন্যই 'বিদ্যাপতি চির নবীন চির মধুর' প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। বিদ্যাপতির কাব্য এইখানেই শেষ হইয়াছে। ইহার পরে কবি যে সর্গের অবতারণা করিয়াছেন তাহা রাধিকার বা মানবাত্মার জন্য নহে। রাধিকার জবানীতে কবি শুধু ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন। সে প্রার্থনায় জীবন ও জগতের বাস্তব সত্য কিভাবে ধরা দিয়াছে, ধ্যান ও জ্ঞান, রূপ ও রস, বাস্তব ও কল্পনা, যুক্তি ও তর্ক, অর্থ ও পরমার্থ কবি বিদ্যাপতির আত্মাকে অবলম্বন করিয়া কিভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, অতঃপর তাহাই বলিব।

[পাঁচ]

বিদ্যাপতির প্রার্থনা

মানুষ কি সহজে প্রার্থনা করিতে চায়? আবার হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন হইলেই কি স্রষ্টার গুণগান করিতে সে তৎপর হয়? হয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নাহয় জীবনব্যাপী স্বীয় কীর্তিকলাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, অনুশোচনার তীব্র জ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া সে প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনার মধ্যেই মানুষের সত্য সন্দর্শন ঘটে।

বিদ্যাপতি এমন কোন অন্যায় করেন নাই। যদি কিছু করিয়া থাকেন তবে তাহা মাধবকে নিতান্ত সাধারণ মানববুদ্ধিতে মানবাকৃতি দিয়া মর্ত্যজীবনের

মাধুরী পান করাইবার জন্য শ্রীরাধিকার সঙ্গে একহারে গাঁথিয়াছেন। বাল্য ও যুব জীবনের সকল কেলি, সকল বিশ্বাসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া তাঁহার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন। বিদ্যাপতির পৌরোহিত্যে সেই ভাগ্যবান ভগবানও 'বিশ্বরূপের খেলাঘরে' যে আনন্দ পাইয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তিনিও বোধহয় তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন, কিন্তু গুণাতীতকে সগুণ করিয়া, লোকাতীতকে ভূলোকের মধ্যে আনিয়া, দেহাতীতকে দেহের বাঁধনে বাঁধিয়া, অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করিয়া, সাধারণ মানবরূপে সর্বজনবোধগম্য করিয়া তুলিয়া তিনি যে পাপ করিয়া গেলেন, সেই পাপের জন্যই মহাভারতের কবির অন্তিম প্রার্থনার মত তাঁহাকেও প্রার্থনা করিতে শুনি—

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥

এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায়॥

যাবত জনম হাম তুয় পদ না সেবল
যুবতী মতি সঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়ল
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥

ভণই বিদ্যাপতি নেহ মনে গণি
কহলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই
হেরইতে তুয় পয় লাজে॥

আজীবন পাপ করিয়া যত নাম কিনিলাম—যত ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজনেরা মিলিয়া তাহা খাইল। কিন্তু মরণের সময়ে দেখি, কেহই আর জিজ্ঞাসা করে না—'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।' হায়! শুধু কর্মফলই সঙ্গে যাইতেছে। হরি হে, তোমার পদরূপ নৌকাকে বন্দনা করিতেছি, তোমার পদ পরিত্যাগ করিয়া, এ পাপ সংসারসমুদ্র কেমন করিয়া পার হইব?

আজীবন আমি যদি তোমাকে এত ছোট না করিয়া, বড় করিয়া গুণগান করিতাম, যদি যুবতীর দিকে মন না দিতাম, অমৃত অর্থাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ না করিতাম, তবে হয়ত আমার একটা উপায় হইত। কিন্তু আজ দেখি আমার সম্পদ অর্থাৎ আমার ক্ষমতা, আমার কবিত্বই আমার বিপত্তির একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাপতি তাই বলিতেছেন—'ভগবান! আমার প্রতি নিশ্চয় তোমার স্নেহ আছে; আমার কাছে ব্যক্ত করিলে হয়ত আমি আহ্লাদে আটখানা হইব, এই ভাবিয়া তুমি তাহা মনে মনে রাখিয়াছ। তুমি গুপ্তই রাখো আর ব্যক্তই করো, আমি জানি সন্ধ্যাবেলায় কেহ যদি অন্নভিক্ষা চায় সচ্ছল গৃহস্থ তাহাকে বিমুখ করিতে লজ্জাবোধ করে। আমি সেইরূপ আমার জীবন-সন্ধ্যায় তোমার চরণপদ্ম দেখিবার কামনা করিলাম, দেখি তুমি আমাকে কেমন করিয়া নিরাশ করো।' ইহা আত্মবিশ্বাসের প্রার্থনা।

বিদ্যাপতির যে পদটি এইবার উদ্ধৃত করিতেছি তাহা প্রার্থনাযোগ্য পদ বটে।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহরি বিশোয়াসা।
আধ জনম হাম নিন্দে গোমাওল
জরাশিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা।।
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা।।
ভণই বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা।

সাগরতীরের উত্তপ্ত বেলাভূমিতে বারিবিন্দু যেমন পড়িবামাত্রই নিঃশেষ হইয়া যায়, হে ভগবান! তেমনি আমি তোমাকে ভুলিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবেষ্টিত সমাজ ও সংসারে ডুবিয়া গেলাম। হায়! এখন আমার এই জীবনসন্ধ্যায় কি হইবে! হে মাধব! আমার পরিণাম নৈরাশ্যজনক, কিন্তু আমি জানি, তুমি জগত্তারণ-কারী দীন দয়াময় হরি, অতএব তোমার প্রতিই আমার আশ্বাস। দেখো, আমাকে নিরাশ করিও না। অর্ধেক জীবন নির্ভাবনায় গায়ে বাতাস দিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। আর বহুদিন বাল্য ও জরাজনিত অজ্ঞতায় কাটিয়া গেল। বাকী অর্ধেক রমণী-রঙ্গরসে তাহাদের সঙ্গে হাসিখুসী ও কেলি-কোলাহলে এমন করিয়াই ডুবিলাম যে, তোমার কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। আজ তাই পাপ-জীবনের দুঃখ, জীবনসূর্যের অস্তগমন-ছায়ায় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে। জীবনে যাহাই করি না কেন, আত্মবিশ্বাস হারাই নাই। কারণ, একথাও জানি, 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা; তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত; সাগর লহরি সমানা।' যেমন সাগরতরঙ্গ সাগরেই উদ্ভূত হয় আবার অনন্ত সাগরেই মিলাইয়া যায় তেমনি প্রতিদিন শত সহস্র জীবনতরঙ্গ তোমা হইতেই উদিত হইয়া তোমাতেই অস্তমিত হইতেছে। কিন্তু তোমার না আছে আদি, না আছে শেষ!

নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর চিরন্তন সত্য কবির অনুভূতিতে উছলিয়া উঠিয়াছে। জগতের পরম পিতা নানা ধর্মগ্রন্থে যে কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন কবির ভাষায় সেই চিরপুরাতন নিত্য নূতন বেদনার অশ্রুধারায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই পংক্তি দুইটি আবেশবিহ্বল চিত্তে যখন আওড়াইতে থাকি, তখন মনে পড়ে পবিত্র কোরআনের সেই কথা কয়টি—'মিন্‌হা খালাক্‌নাকুম্, অ ফি'হা নুয়িদোকুম্, অ মিন্‌হা নুখ্‌রোজাকুম্ তা'রাতান্ ওখ্‌রা।' খোদা যে ধূলিকণা হইতে মানুষকে সৃষ্টি করেন, সেই ধূলিকণাকেই তাহার একমাত্র নিদান করিয়া সেইখানেই আবার যেভাবে সেই মানবদেহকে ফিরাইয়া লন তাহার মধ্যে আমরা সেই মহাসত্যেরই সন্ধান লাভ করিয়া থাকি 'আয় খোদাওন্দ্! তোমারই সৃষ্ট জীব আমরা, জীবনশেষে তোমাতেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব।'

জাগতিক মহাসত্যের অনুসন্ধান পবিত্র ধর্মগ্রন্থে যেমন পাই, তেমনি বেদ বেদান্তে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের কবির জবানীতে সেই সত্যই ধৃত হইয়া

সকল কালের সকল দেশের মানুষের কাছে অমৃতরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই যখন শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই—

সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ! তবাহংন মামকীনস্তম্
সামুদ্রিহি তরঙ্গঃ
ক্বচ ন সমুদ্রো নঃ তরঙ্গ।

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, নাথ! আমি জানি আমি তোমারই অধীন—আমি তোমা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ—তুমি আমার নিকট হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তরঙ্গই সমুদ্রের কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে। তখনই পশ্চিমের মহাকবি শেলীর ভাবসিন্ধু মন্থন করিয়া এমন সঙ্গীত প্রবাহে এই সত্য কিভাবে আসিয়া ধরা দিয়াছে তাহা পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হই—

The one remains the many change and pass,
Heaven's light forever shines earth's shadows fly;
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of eternity.
Until death tramples it to fragments.—Die,
If thou wouldst be with that thou dost seek!
Follow where all is fled! Rome's azure sky,
flowers, ruins, statues, music, words are weak
The glory they transfuse with fitting truth to speak.

শেষটুকুর কি আর অর্থ করিব! ইহা তো কান্নার ভাষা। রহিয়া রহিয়া অনুতাপদগ্ধ বিদ্যাপতির ক্রন্দনমুখর গলার স্বরই সেখানে কাঁপিয়া উঠিতেছে—'শেষ শমন ভয়ে তুয়া বিনু গতি নহি আরা।'—

ইহার পর বিদ্যাপতির কাব্য-পাঠশেষে বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ জনিত তাঁহার শেষ পদটি উদ্ধৃত করিতেছে ঃ—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দয় তুলসী তিল দেহ সোঁপলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুঁহুঁ করবি বিচার।

তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগবাহির নহি মঞি ছার।।
কিয়ে মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগত পুনু পুনু
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।।
ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।

কবি বিদ্যাপতির কাব্যবিচার শেষ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রকাব্যের মূলসুর—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।

বিদ্যাপতির কাব্যে 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা' নাই। ইহা অরূপরতন আশা করিয়া রূপসাগরে ডুব দেওয়ার মতো। হিন্দু যেমন আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সাকার সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া নিরাকার সাধনমার্গে উন্নীত হইবার দাবী রাখেন, বিদ্যাপতিও তেমনি বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া তাহার সাধনার দ্বারা ভাবলোকে বাধাহীন অভিসার করিয়াছেন। দেহের বাঁধনে দেহাতীতকে বাঁধিয়া সর্বশেষে তাহারই চরণতলে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় দেখি উভয় কবির জীবন ও কাব্যাদর্শে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, এমনকি তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে তুলনাও চলে না ; তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় কাব্যসাধনার প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া উভয় কবির বীণা যেন একইভাবে একই সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।*

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদগুলি নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী' (বসুমতী সংস্করণ ; দ্বিতীয় ভাগ) হইতে গৃহীত।

গ্রন্থ-পরিচয়

'ভাষা ও সাহিত্য' একটি প্রবন্ধ-সংকলন। প্রবন্ধগুলির লেখক ও সংকলক,—অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। ঢাকার ৪৫ সংখ্যক ইসলামপুরে অবস্থিত 'ইষ্ট্ বেঙ্গল্ পাব্লিশার্স্' কর্তৃক বইখানি পুরু কাগজের আট পেজী ফর্মায় পাইকা টাইপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৭২ ও মূল্য ছয় টাকা। সুদৃঢ় বাঁধাই, সুরুচিসম্পন্ন পরিসজ্জা (গেট্ আপ) ও সুখপাঠ্য মুদ্রণ দেখিয়া পুস্তকখানি হাতে লইলেই পড়িতে ইচ্ছা করে।

প্রকৃতপক্ষে, ইহা একখানি সংকলন-গ্রন্থের একত্রে মুদ্রিত দুই খণ্ড। প্রথম খণ্ডে লেখকের ভাষা-সম্বন্ধীয় আটটি প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় একুশটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডের যে-কোন প্রবন্ধ হইতে ন্যূনাধিক দ্বিগুণ দীর্ঘ বলিয়া, দুই খণ্ডের মধ্যে প্রবন্ধ-সংখ্যায় তারতম্য যত বেশী, পৃষ্ঠা-সংখ্যায় বৈষম্য তত অধিক নহে; কেননা— প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড হইতে মাত্র বিশ পৃষ্ঠায় খাটো। এতৎসত্ত্বেও, বিষয়-বৈচিত্র্যে ও চিন্তাশীলতায় প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড হইতে আমার কাছে অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছে। কেহ যদি দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলিকে প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ হইতে অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করেন, তবে বলিব, দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতায় এমন ধারণাও সম্ভব।

এইবার প্রবন্ধগুলির বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। ভাষা-সংক্রান্ত আটটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ হইল, 'ভাষা ও সমাজ-জীবন'। ইহা অন্য বই হইতে পুনর্মুদ্রিত; অবশিষ্ট সাতটি প্রবন্ধ নূতন। এই নূতন প্রবন্ধগুলি এই:— 'আমাদের সাহিত্যের ভাষা', 'পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যে

ভাষার অনুশীলন', 'বাংলা ভাষা ও তার পঠন-পাঠন', 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ', 'রোমান বনাম বাংলা হরফ', 'বাংলা সাহিত্যে পুরানো ধারার লেখক ও আরবী ফার্‌সী শব্দের ব্যবহার' এবং সীমান্তের ভাষা ও সাহিত্য'।

এই পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ 'ভাষা ও সমাজ-জীবন' লেখকের পূর্ব-প্রকাশিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃত' গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত। পুনর্মুদ্রণের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, —"আমার লেখা ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো পাঠকেরা যাতে এক জায়গায় পেতে পারেন, সে জন্য আমার পূর্বপ্রকাশিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'ভাষা ও সমাজ-জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।" পাঠকের সুবিধার জন্য তিনি যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি বিশেষ অবিবেচনার কাজও করিয়াছেন। পুনর্মুদ্রণের আগে ইহা বিশেষভাবে সংশোধিত, এমন কি স্থানে স্থানে পুনর্লিখিত হইলেই ভাল হইত। কেননা, প্রবন্ধটিতে কিছুটা কাঁচা হাতের ছাপ রহিয়াছে, সেইজন্য, পরবর্তী ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির সহিত সম-আসন পাইবার যোগ্যতা এই প্রবন্ধের নাই। লেখক যখন গুরুগম্ভীর ভাষাতাত্ত্বিক কথা বলিতে বলিতে নূতন কথার অবতারণার ভূমিকায় লেখেন, —"এবারে আমার শ্রোতা কিংবা পাঠকেরা আমাকে প্রশ্ন করবেন, এত ভূমিকা না ক'রে ভাষা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্যটা কি নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো চট্‌পট বলে ফেল্‌লেই তো হয় বাপু!"···ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ৭ দ্রষ্টব্য); কিংবা— "তরুণ বয়সে কোনো তরুণী সুন্দরীর মন পাবার এবং আরও কিছু বেশী সময় তার সঙ্গসুখ লাভ করার জন্যে নিতান্ত গরজের কথা, পরস্পরের মা বাবার কথা পাড়ে না, পড়াশুনোর ছুতো ক'রে বই পুস্তকের হদিস নেয় না, এমন নেক্‌খত্‌ আত্মভোলা ছেলে শতকরা ক'টা পাওয়া যায়।"··· ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১০ দ্রষ্টব্য); অথবা— "সমাজ-বদ্ধ মানুষকে দলবদ্ধ পশুর কিংবা automaton-এর সামিল করে ফেল্‌লাম দেখে ভাষা সম্বন্ধে এমন কথা শুনতে অনভ্যস্ত সাহিত্যিক বন্ধুরা স্বভাবতই আমার উপর ক্ষুব্ধ হবেন।"··· ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১১ দ্রষ্টব্য); তখন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের বাক্‌ভঙ্গী, না হয়, বয়স্যদের সঙ্গে রসালাপ, না হয়, বৈঠকী আলোচনায় হাল্‌কা রসিকতা প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। ভাষাতাত্ত্বিক গুরুগম্ভীর মননশীল প্রবন্ধে এই জাতীয় বস্তুর অবতারণা ব্যক্তিগতভাবে আমি উপভোগ করিতে

অসমর্থ,— অন্যের কথা বলিতে পারি না। লেখকের অন্য প্রবন্ধগুলিতে এই জাতীয় বস্তু নাই। বোধ হয়, তিনি এখন উপলব্ধি করেন যে, এই শ্রেণীর প্রবন্ধে এই জাতীয় ফোড়ন চলে না। এই জন্যই বলিতেছিলাম, প্রবন্ধটি সংশোধিত বা পুনর্লিখিত হইয়া এই পুস্তকের সামিল হইলে, ভাল হইত।

নূতন সাতটি প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, ভাষা-সম্পর্কিত বহু সমস্যার প্রতি লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত সমস্যা অনেকের মনে আবছায়া-আবছায়া অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়; ইহাদের সমাধান সম্বন্ধেও অনেকে অনেকভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলির প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি আমাদের ভাষা-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সমস্যাকে সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের ভাষা-সংক্রান্ত অস্পষ্ট ধারণাগুলি যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে,—সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ, আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভাষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বাস্তব আত্মসচেনতার অধিকারী নহেন, কিংবা অধিকারী হইয়াও অজ্ঞাত বা সুজ্ঞাত কারণে আত্মপ্রবঞ্চনা করেন বলিয়া অহেতুক স্পর্শকাতর (sensitive), এই প্রবন্ধগুলি মনোযোগ সহকারে পড়িলে, তাঁহাদের স্পর্শকাতরতায়ও নূতন স্পর্শের ছোঁয়াচ লাগিতে পারে। ইহাকেও আমি খুব ছোট ব্যাপার বলিয়া মনে করি না।

এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধেও লেখক কম চিন্তা করেন নাই। প্রবন্ধগুলিতে সে চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে, তিনি যে সমস্ত সমাধান আমাদের সম্মুখে পেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত সকলে এক মত হইবেন, এমন আশা করা যায় না। বোধ হয়, লেখক নিজেও সে আশা পোষণ করেন না; কারণ, তিনি আত্মসচেতন লেখক,—আবেগপ্রবণ লিপিকার নহেন। সমস্যামূলক প্রবন্ধে আবেগপ্রবণতার স্থান নাই এবং ভাবালুতা কোন সমস্যা-সমাধানের সহায়ক নহে। লেখকের সাতটি ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল, তিনি প্রবন্ধগুলির রচনা-কালে এই মৌলিক নীতি বিস্মৃত হন নাই। তাই, প্রবন্ধগুলিতে সমস্যাসমূহের একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও তদাশ্রিত যুক্তিপূর্ণ সমাধানের বিশেষ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি, ইহাই আমাকে অধিক মুগ্ধ করিয়াছে। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন; তাহা আমাদের মধ্যে সচরাচর সুলভ নহে বলিয়া বিশিষ্ট। প্রমাণস্বরূপ দুই

একটি উদাহরণ না দিলে, উক্তিটিকে 'ফাঁকা-বুলি' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাই, নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

(ক) আমাদের সাহিত্যে 'পুঁথির ভাষার' বা 'দোভাষী বাংলার' পুনঃ-প্রচলনের সমস্যাটি আজও একরূপ অমীমাংসিত। ইহা সময়ে সময়ে এমন আকার ধারণ করে যে, মনে হয়, কথা-কাটাকাটি সোজা লাঠালাঠিতে পরিণত হইবে। অতিরিক্ত বুদ্ধিমানেরা সমস্যাটিকে 'নাজুক', 'স্পর্শকাতর' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। ইহার পিছনে বুদ্ধিমত্তার চেয়ে একটা পলায়নী-মনোবৃত্তি যে অধিক সক্রিয়, আমরা সে-কথা প্রায়ই ভাবি না। লেখক এই 'নাজুক'-সমস্যাটিকেও এড়াইয়া যান নাই। ইহার একটা চমৎকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পর, তিনি তদ্‌ভিত্তিক যে-সমাধানটি দিতে চাহিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কথায় প্রকাশ করাই ভাল। তিনি বলেন,—

> "আমাদের পুঁথি ও লোক-সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে অগণিত মানুষের চিত্তরঞ্জন করে এসেছে। আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে গ্রামীণ সভ্যতা ও রুচির পরিবর্তন হচ্ছে। তাই পুঁথি ও লোক-সাহিত্য শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শহুরে সম্প্রদায়ের অবসর বিনোদন করতে কিংবা চিত্তের তৃপ্তি সাধন করতে পারছে না। সে জন্যে এ-সাহিত্য হয়েছে ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয়। এর পুনরুজ্জীবন এ-কালে আর সম্ভব নয়। কিন্তু পুঁথি-সাহিত্যের ধারার সঙ্গে তার কাহিনী, শব্দ-বিন্যাস-রীতি এবং শব্দের বয়ন-কুশলতা তথা Phraseology-র সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেগুলোর স্বীকরণ সাধন করে শালীন কাব্য-সাহিত্যে তার ব্যবহার করতে পারলে আমাদের এ-কালের সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হবে, তা নিঃসন্দেহ॥" (পৃষ্ঠা—৪৯)

(খ) "রোমান বনাম বাংলা হরফ" নামক প্রবন্ধে লেখক আমাদের যে সাম্প্রতিক সমস্যাটি আলোচনা করিয়াছেন, তাহা 'রোমান-হরফে' তথা 'ইংরেজী হরফে' বাংলা লেখার সমস্যা। আমাদের ভাষাগত বিশিষ্ট সমস্যাগুলির মধ্যে নানা কারণে ইহাও একটি। জন কয়েক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদের সমর্থনে সম্প্রতি সমস্যাটি জটিলতর আকার ধারণ করিয়াছে। 'ইহা বৈজ্ঞানিক' কিংবা 'ইহা বৈজ্ঞানিক নয়,'—এমন উক্তির সাহায্যে বিশ্ব রহস্যবিজয়ী-বিজ্ঞানের দোহাই পাড়িয়া বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারে-বিশ্বাসী অবৈজ্ঞানিক-শিক্ষিত-জনের কণ্ঠরোধ করিবার সহজতম উপায়টি প্রযুক্ত হইয়া সমস্যাটিকে জটিলতম করিয়া তোলা হইতেছে। কেহই ইহা বিশেষভাবে ভাবিয়াও দেখিতেছেন না যে, ইহা রাসায়নিক, পদার্থবিদ্যাবিদ, এমন কি, জনশিক্ষাবিদের ন্যায় বৈজ্ঞানিকদের

আওতাভুক্ত সমস্যা নহে ;—বরং ইহা ভাষাবৈজ্ঞানিকেরই বিষয়। এমন অবস্থায়, লেখক একজন বিশিষ্ট ভাষা-বিজ্ঞানী হিসাবে সমস্যাসৃষ্টিকারীদের নয়-নয়টি যুক্তিকে একে একে তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বিচার-বুদ্ধি ও মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে-কোন প্রাবন্ধিকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। পরীক্ষান্তে তিনি সমস্যাটির যে সমাধান দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সহজ বলিয়া উদ্ধৃতির যোগ্য,—

> "বাংলায় রোমান লিপির প্রচলন যতটুকু না সুবিধা সৃষ্টি করবে, তার চেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে অনেক গুণে বেশী। সুতরাং, রোমান লিপির প্রচলন ক'রে সমগ্র জাতি যে অসুবিধায় পড়বে, তার তুলনায় বর্তমান বাংলা লিপির সামান্য দোষ ত্রুটির কিছু সংস্কার ক'রে নেওয়া বহুগুণে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।"
> (পৃষ্ঠা—১০৮)

বলাবাহুল্য, কোন সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া, ইহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে না পারিলে, কোন জটিল সমস্যার এত সুন্দর ও সহজ সমাধান সম্ভবপর নহে। লেখকের সে অন্তর্দৃষ্টি ও নির্লিপ্ততাও লক্ষণীয়।

(গ) আমাদের সাহিত্যের ভাষা কি হইবে,—ইহাও আমাদের আর একটি জটিল সমস্যা। 'রাষ্ট্রের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে' এই সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যাটির সমাধান সহজে হইয়া উঠিতেছে না। সমস্যাটির উদ্ভবের ঐতিহাসিক পটভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া, ইহার বিস্তৃতি, পরিণতি ও ভবিষ্যৎ পর্যন্ত লেখক তাঁহার "আমাদের সাহিত্যের ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে সংক্ষেপে হইলেও সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় কোন বিশেষ ধরণের ভাবাবেগ নাই, কোন প্রকারের অশোভন উক্তি নাই, কোন বিশেষ রকমের আপ্তবাক্য বা অযৌক্তিক বাক্‌চাতুর্য নাই, অথচ আমাদের অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্যকে মানিয়া লইয়া সহজ উপায়ে তাহাকে কিভাবে শালীন ও সর্বস্বীকৃত আধুনিক প্রকৃতির সাহিত্যে উন্নীত করা যায়, তৎপ্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। জোরালো যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি যাহা বলিতে চহিয়াছেন, তাহা এই ঃ—

> "পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিকরা যদি তাঁদের জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হন এবং যে-জীবন তাঁরা চিত্রিত করবেন, সে-জীবনের সঙ্গে যদি তাঁদের গভীর পরিচয় থাকে, তার রূপায়ণে যদি কোন অভিসন্ধি বা প্রচারমূলক বাসনা না থাকে ; কবি-সাহিত্যিকের হৃদয়ের সহানুভূতির জারক-রসে সে-জীবন যদি রঞ্জিত হয়ে ওঠে,

তা হ'লে উক্ত জীবন সম্বন্ধে সে গাঢ় চেতনাই তাঁদের ভাষাকে সহজ গতি, লাবণ্য ও সুষমা দান করবে। ভাষার সুষমা ও শ্রুতিমধুর গুণ না থাক্‌লে ভাব যেমনই হোক না কেন, সাহিত্য যথার্থ মর্যাদা ও স্থিতি লাভ করবে না।" (পৃষ্ঠা—২৭-২৮)।

উদাহরণের বাহুল্যে আলোচনা দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। পুস্তকটির 'ভাষা-খণ্ডে' সন্নিবিষ্ট প্রত্যেকটি প্রবন্ধ তথ্যবহুল ও ভাষা-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত বলিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এতৎসত্ত্বেও, নিঃসঙ্কোচে বলিতে চাই যে, এই 'খণ্ডের' প্রবন্ধগুলির মধ্যে লেখকের 'বাংলা ভাষা ও তার পঠন-পাঠন" নামক প্রবন্ধটিই সর্বাধিক তথ্যবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্য আমাদের মধ্যে খুব বেশী লোকের জানা নাই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology), আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান (Modern Linguistics), বর্ণনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান (Descriptive Linguistics), সমাগতাত্ত্বিক ভাষা-বিজ্ঞান (Sociological Linguistics), বাগর্থ-বিজ্ঞান (Semantics) প্রভৃতি জটিল অত্যাধুনিক ভাষা-তত্ত্বের অন্তর্গত নানা অজ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্য লেখক যে-ভাবে সহজ ও সর্ববোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়া, পরিশেষে শুধু পঠন ও পাঠনের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ক্ষেত্রেও, একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আগাইয়া যাইতে বলিয়াছেন, তাহা কেবল ভাষা বিশেষজ্ঞ বা ভাষা-বিজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমার বিশ্বাস,—যে-সমস্ত সখের ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষা-সংস্কারক আমাদের মধ্যে আছেন, লেখকের এই প্রবন্ধটি নিবিষ্টভাবে পাঠ করিলে, তাঁহাদের ভাষা ও তৎসংস্কার-সম্বন্ধীয় ধারণা সুস্পষ্ট হইবে,—এমন কি, বিষয়টির জটিলতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের অজ্ঞতা-প্রসূত ধারণা বদলাইয়াও যাইতে পারে।

মোটের উপর 'ভাষা-খণ্ডের' প্রবন্ধগুলিতে একদিকে যেমন চিন্তা-উদ্দীপক কথার অভাব নাই, অন্যদিকে তেমন বৈজ্ঞানিক মনীষার পরিচয়ও প্রচুর। এই জাতীয় প্রবন্ধ পাকিস্তান পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পৎ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্যতা রাখে। এমন সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধের সহিত 'ভাষা ও সমাজ-জীবন' নামক প্রবন্ধটি সংশোধিত না হইয়া স্থান পাওয়া উচিত ছিল না।

এইবার 'সাহিত্য-খণ্ডে' গ্রথিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রবন্ধগুলির সংখ্যা ও বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এইগুলিতে লেখকের ভাবনা-চিন্তার পরিসর বহু বিস্তৃত হইলেও, বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতপ্রধান। 'ভাষা-খণ্ডের' প্রবন্ধগুলি যেন ভাষাখণ্ডের সরজমিনে জরীপ

(ground survey), আর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি যেন বিশাল সাহিত্য-রাজ্যের বৈমানিক জরীপ (aerial survey)। উভয়বিধ জরীপের আবশ্যতা আছে, উপযোগিতাও আছে যথেষ্ট। তবে, একটা আর একটার সমধর্মী নয়। সুতরাং, দুই খণ্ডকে তুল্যমূল্য দেওয়া যায় না। তাই, গোড়াতেই বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, 'সাহিত্য-খণ্ড' 'ভাষা-খণ্ড' হইতে মননশীলতার তুলনায় নিকৃষ্ট। মনে হয়, এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলি বিশেষ করিয়া ছাত্রদের জন্যই লিখিত। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তবে লেখকের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই। কেননা, ছাত্রেরা প্রবন্ধগুলি হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবে। নিম্নে এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলির একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি ঃ—

'পূর্ব-পাকিস্তানের তামদ্দুনিক সংগঠন' নামক প্রবন্ধটি গ্রন্থের 'সাহিত্য-খণ্ডের' প্রথম রচনা। মাত্র নয় পৃষ্ঠাসমন্বিত প্রবন্ধটি আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় একান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও, ইহাতে লেখকের চিন্তাশীলতা ও মৌলিক সমস্যা-উপলব্ধির পরিচয় আছে। ফলে, তিনি বলিতে পারিয়াছেন,—"প্রত্যেক জাতির জীবনই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি, অনুষ্ঠানিক রূপ এবং ঐতিহ্যের সাহায্যে। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি ইসলামই হবে জীবন-পথের দিশারী ; কিন্তু যাই রচিত হোক না কেন প্রথমে তাকে সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হ'তে হবে। শুধু আবেগাতিশয্যে ভরপুর এবং অতীতাশ্রয়ী মনোবৃত্তির রোমন্থন হ'লেই তা সাহিত্য হবে না।" (পৃষ্ঠা—১৩৭)

পুঁথি-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের ভাবনা-চিন্তা যে তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,— 'পুঁথি ও পুঁথির ভাষা', 'পুঁথি সাহিত্য ও কাসাসোল আম্বিয়া' এবং 'পুঁথি-সাহিত্য ও আলেফ লায়লা'। এই প্রবন্ধ তিনটিতে যাহা বড় হইয়া মানস-নয়নে প্রতিভাত হয়, তাহাকে লেখকের কথায় (পৃষ্ঠা-২৭, শেষ পংক্তি) প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়, প্রবন্ধত্রয় 'অভিসন্ধি বা প্রচারমূলক বাসনা'-সঞ্জাত। তাহা না হইলে, অতীত পুঁথি-সাহিত্যের বহুল প্রচারকে সম্বল করিয়া ইহার ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক কখনও বলিতে পারিতেন না,— "সাহিত্যের ভাষায় এত বড় গণতান্ত্রিকতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।" অথবা,— "পুঁথির ভাষার অসাধারণ ও আশাতীত সরলতার মধ্যেই পুঁথি-সাহিত্যের সজীবতা ও প্রবহমাণতা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।" অন্যত্র ৪৯ পৃষ্ঠায় লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে

এই উক্তিগুলিকে প্রচারধর্মী বলিয়া মনে হয় না কি? অন্য দুই প্রবন্ধে তিনি 'কসস্থ-'ল্-আম্বীয়া' ও 'আল্‌ফ্-লৈলা' নামক পুঁথিদ্বয়ের সমালোচনা নহে, আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা দুইটি পুস্তকের বিষয়-বস্তু সংক্ষেপে জানিয়া লইবার পক্ষে সহায়ক।

পুস্তক সমালোচনামূলক চারিটি প্রবন্ধের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' উপন্যাসটির আলোচনাই শ্রেষ্ঠ; মীর মোশর্‌রফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণের' আলোচনা অকিঞ্চিৎকর; দীনেশ সেনের 'ময়মনসিংহ গীতিকার'ই আলোচনায় দীনেশবাবুর দরদী মন ও পল্লী-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ দৃষ্টির একান্ত অভাব এবং 'আমাদের নাট্য সাহিত্য' নামক আলোচনা অত্যন্ত ভাসাভাসা।

জোর করিয়া টানিয়া আনিলে এই দলে আরও দুইটি প্রবন্ধকে স্থান দেওয়া যায়; তাহা 'বৈষ্ণব কাব্যে প্রেম' এবং 'বাংলা কাব্যে নৈরাশ্যবাদ'। প্রবন্ধ দুইটি হইতে উদ্ধৃতিগুলিকে বাদ দিলে, প্রাণে সাড়া জাগাইবার, অথবা চিন্তার উদ্রেক করিবার মতো আর বিশেষ কিছু থাকেনা।

লেখার দিক হইতে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করিতে গিয়া যে-কয়জন সাহিত্যিক সম্বন্ধে লেখক বিভিন্ন প্রবন্ধের মারফতে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিরোদ প্রসাদ, কায়কোবাদ, নজরুল ইসলাম ও জসীমুদ্দীন। ইঁহাদের সঙ্গে পাকিস্তানের জাতীয় কবি ইকবাল ও উর্দু-সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি হালীর নামও করা যাইতে পারে। পাকিস্তানের জাতীয় কবিরূপে লেখক সংক্ষেপে ইকবালের যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা ভালই; তবে 'ইকবালের মোমেন' ও 'ইকবালের বাণী' নিতান্তই মামুলী ও নগণ্য আলোচনা। 'উর্দু কবিতার জন্মকথা: কবি হালী' নামক প্রবন্ধটি পূর্ব-পাকিস্তানী পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় রচনা। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহারা সংক্ষেপে উর্দু-সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। এতদ্ব্যতীত, বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনায় কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ে নাই। মনে হয় এইগুলি শ্রেণীকক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রাবন্ধিক রূপ। তবে, ইহাতে যে ছাত্র-সমাজ উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলাবাহুল্য, যে-দেশে পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অভাব, সে দেশে এ জাতীয় আলোচনার মূল্যও কম নয়। বোধ হয়, এই প্রবন্ধগুলি রচনার উদ্দেশ্যও তাহাই।

মুহম্মদ এনামুল হক

লেখক-পরিচিতি

॥ মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আনিসুজ্জামান এম. এ. (ঢাকা)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ সতীশচন্দ্র রায়
'পদকল্পতরু'র পরলোকগত সম্পাদক এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের
বিশিষ্ট রসজ্ঞ সমালোচক ॥

॥ মুহম্মদ এনামুল হক, এম. এ., পি-এইচ. ডি (কলিকাতা)
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

এই সঙ্গে পড়ুন

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ও ১৩৬৫। প্রতি সংখ্যা দু টাকা।
বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৬। বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৭। প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা।

পুথি-পরিচিতি

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি-পরিচয়। সম্পাদক ঃ অধ্যাপক আহমদ শরীফ। সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার এই বইটিতে প্রায় ছশো পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম বিশ টাকা। এক সঙ্গে পাঁচ কপি নিলে শতকরা ৩০% কমিশন দেওয়া হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রচিত। অধুনিক যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। দাম ছ টাকা।

বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে বাংলা ভাষার বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাস। দাম দু টাকা।

আলাউল-বিরচিত 'তোহফা'

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত। দাম আড়াই টাকা।

মুহম্মদ খান-বিরচিত 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ'

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত। দাম দু টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার ও নিউ মার্কেট

নলেজ হোম
নিউ মার্কেট

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ষ্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY

of

NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI

by

MUHAMMAD ABDUL HAI

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে
বাংলা ভাষায় ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা যেখানে বিরল
বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার ইতিহাসে
এ বইয়ের প্রকাশ সেক্ষেত্রে এক স্মরণীয় পদক্ষেপরূপে
বিবেচিত হবে।
'ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে এ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত,
উদাহরণের প্রাচুর্যের দিক দিয়ে তেমনি সমৃদ্ধ।
ধ্বনিগত, ধ্বনিতত্ত্বগত ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের
ভিন্নতায় এবং প্রয়োজনবোধে ঘনিষ্ঠ সহযোগে,
Palatogram ও Kymogram এর ব্যবহারে সমৃদ্ধ।'

"...fresh and full of interest to all students of Linguistics."

— J. R. Firth,
Late Professor of Linguistics, University of London.

"...an outstanding contribution by an Indo-Pakistan scholar on one of the major languages of the sub-continent .."

Suniti Kumar Chatterji,
Professor Emeritus, University of Calcutta.

"...The science of Phonetics had its brilliant beginnings in ancient India, and in recent times its influence has merged with the development of western linguistics to the benefit of both streams of scholarship. It is therefore particularly gratifying when these current techniques are applied by Scholars from the Indo-Pakistan sub-continent to their modern languages.

Mr. Hai's book, Nasals and Nasalization in Bengali,..... is an excellent exemplification of such work."

—W. S. Allen,
Professor of Comparative Philology, University of Cambridge.

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
৯৪	পাদটীকা ১৩	১৭৮০	১৮১০
৯৫	পাদটীকা ৫	১৮৮৭	১৮৯৭
১৪০	১৫	রামবৃক্ষ শর্মা বেনীপুরী	রামকৃষ্ণ শর্মা বেণীপুরী
২৬০	৯	আনি	আনিয়া
২৬৭	১১	লড়ি	উড়ি
২৬৭	১৪	ধনী	পনী
২৬৮	২৩	তেমন	তখন
২৭৩	২১	কির৩	ফির৩
২৭৮	৯	জাবে	জানে
২৭৯	৩	ষঘন	সঘন
২৭৯	১৬	বিষিন	বিঘিন
২৮০	২১	সংক্রমকে	সংক্রমণে

'বিদ্যাপতির গ্রন্থপঞ্জী'তে সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' (পাঁচ খণ্ড) এবং 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' (কলিকাতা, ১৯২০) অন্তর্ভুক্ত হবে।